সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

পঞ্চম খণ্ডের সূচী

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫২

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৭৩—১৯৩২

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৩
মূল্য—·৬০ ন.প.

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১.—৩০।১২।১৯৬৩

জন্ম : বংশ-পরিচয়

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৭৯) তারিখে বর্দ্ধমান ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে প্রভাতকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম —জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ; আদি নিবাস—হুগলী জেলার গুরুপ।

ছাত্র-জীবন

প্রভাতকুমারের পিতা ই. আই. রেলে সামান্য বেতনে সিগনালারের কর্ম্ম করিতেন। এই কারণে তাঁহাকে বিভিন্ন ষ্টেশনে—কখন ঝাঝা, কখন জামালপুর, কখন বা দিলদারনগরে কাটাইতে হইয়াছে। প্রভাতকুমার তাঁহার মাসতুত-ভাই রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে জামালপুরে থাকিয়া স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করিতেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ঐ স্কুলের শিক্ষক। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫ বৎসর বয়সে, প্রভাতকুমার জামালপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষাদানকালে তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রভাতকুমার কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ক্যালেণ্ডার হইতে তাহার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

এনট্রান্স···জামালপুর এইচ্. সি. ই. স্কুল···২য় বিভাগ···ইং ১৮৮৮
এফ্. এ.···পাটনা কলেজ ···৩য় বিভাগ··· ১৮৯১
বি. এ. ···পাটনা কলেজ ··· ··· ১৮৯৫

বিবাহ

এফ্. এ. পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভাতকুমার হালিশহর-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ব্রজবালা দেবীকে

বিবাহ করেন। বিবাহ জামালপুরেই হয়, অন্নদাপ্রসাদ জামালপুরেই কর্ম্ম করিতেন। ১৩০৩ সালের চৈত্র-সংখ্যা (ইং ১৮৯৭) 'ভারতী'তে ব্রজবালা দেবী "ভূত না চোর?" নামে ভাষান্তর হইতে গৃহীত একটি গল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিবাহের ছয় বৎসর পরে (ইং ১৮৯৭) তিনি দুইটি শিশু সন্তান—অরুণকুমার ও প্রশান্তকুমারকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন।

কেরাণীগিরি

বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর, সরকারী ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রভাতকুমার অস্থায়িভাবে সিমলা-শৈলে ভারত-সরকারের একটি আপিসে কিছু দিন চাকুরী করেন। সিমলা দর্শন করিয়া তিনি ১৩০৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'প্রদীপে' (ইং ১৮৯৮) "সিমলা-শৈল" নামে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সিমলা হইতে ফিরিয়া প্রভাত-কুমার কলিকাতায় ডিরেক্টর-জেনারেল অব টেলিগ্রাফসের আপিসে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন (ইং ১৮৯৯)।

বিলাত-যাত্রা

কেরাণীগিরি প্রভাতকুমারকে বেশী দিন করিতে হইল না। অকস্মাৎ বিলাতযাত্রার এক অভাবনীয় সুযোগ তাঁহার মিলিয়া গেল।

পঠদ্দশা হইতেই প্রভাতকুমার 'ভারতী' পত্রিকায় লিখিতে সুরু করেন। ১৩০২ সাল (ইং ১৮৯৫) হইতে উক্ত পত্রিকায় তাঁহার রচনাবলী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তিনি 'ভারতী'র একজন বিশিষ্ট লেখক বলিয়া পরিগণিত হন। সরলা দেবী তখন

'ভারতী'র সম্পাদিকা। প্রভাতকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। টেলিগ্রাফ আপিসে কার্য্যকালে 'ভারতী'-সম্পাদিকার সহিত প্রভাতকুমারের আলাপ-পরিচয়ের সূচনা হয়। উভয়ের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইলে স্থির হয়, সরলা দেবীর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যয়ে প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিবেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলে যথারীতি বিবাহ হইবে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি প্রভাতকুমার কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ইহার অল্প দিন পূর্ব্বে (ইং ১৯০০) তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মাতা তখন সদ্য বৈধব্যশোকে কাতরা। প্রভাতকুমার অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন ; পাছে মাতা আপত্তি করিয়া বসেন, এই ভয়ে তিনি তাঁহার নিকটও বিলাতযাত্রার কথা পূর্ব্বাহ্নে ব্যক্ত করেন নাই।

তিন বৎসর পরে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে প্রভাত-কুমার ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু নূতন করিয়া সংসার পাতা তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁহার মাতা এই বিবাহে সম্মতি দেন নাই। এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাঁহার মর্ম্মমূলে এক দুরপনেয় ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল,—তিনি চিরতরে সংসার-ধর্ম্মের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টারি

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রভাতকুমার অল্প দিন দার্জিলিঙে ছিলেন। সেখানে প্র্যাক্‌টিসের সুবিধা হইবে না বুঝিয়া তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রংপুরে গমন করেন। তথায় চারি বৎসর প্র্যাক্‌টিস

করিবার পর গয়া তাঁহার কর্ম্মস্থল হয় (মে ১৯০৮), এখানে তিনি আট বৎসর ছিলেন।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদন

ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রভাতকুমারের মন বসিতেছিল না। সাহিত্যের কমল-বনে তিনি যে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী', 'প্রবাসী,' 'মানসী' ও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত তাঁহার ছোট গল্প ও উপন্যাস-গুলি পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে 'ষোড়শী', 'দেশী ও বিলাতী', 'গল্পাঞ্জলি' ও 'নবীন সন্ন্যাসী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তু—সকল দিক্ দিয়াই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল প্রভাতকুমারের ছোট গল্পগুলি তদানীন্তন বাংলা-সাহিত্যে রীতিমত সাড়া জাগাইয়াছিল, বিশেষতঃ বিলাতের বিষয়বস্তু লইয়া লেখা 'দেশী ও বিলাতী' পুস্তকের গল্পগুলির অভিনবত্ব পাঠক ও সামালোচক সকলেরই চমক লাগাইয়া দিয়াছিল। এমনি ভাবে সাহিত্য-চর্চা দ্বারা যেমন তাঁহার যশোবৃদ্ধি হইল, তেমনি অর্থাগমও হইতে লাগিল। অন্তরের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং আর্থিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার একান্ত আগ্রহ জন্মিল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল না, অচিরেই অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৯১৪) নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্র-নাথ রায় 'মানসী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। মহারাজার চেষ্টায় এই সময় হইতে 'মানসী'র সহিত প্রভাতকুমারের সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হয়।

ইহার দেড় বৎসর পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে সহযোগিরূপে গ্রহণ করিয়া জগদিন্দ্রনাথ 'মর্ম্মবাণী' নামে সাহিত্য-বিষয়ক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৩ শ্রাবণ ১৩২২ (ইং ১৯১৫) তারিখে। প্রভাতকুমার স্বনামে ও ছদ্ম নামে* নিয়মিতভাবে রচনা দিয়া 'মর্ম্মবাণী'কেও সাহায্য করিয়াছিলেন। ছয় মাস পরে 'মর্ম্মবাণী' উঠাইয়া দিয়া এবং 'মানসী'র কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাস (ইং ১৯১৬) হইতে 'মানসী ও মর্ম্ম-বাণী' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করা হয়। নাটোরাধিপতির অনুরোধে তাঁহার সহযোগিরূপে প্রভাতকুমার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদক হন। তিনি তখনও গয়ায় প্র্যাক্‌টিস করিতেছিলেন: প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা বাহির হইবার পাঁচ-সাত দিন পূর্ব্বে গয়া হইতে কলিকাতায় আসিতেন, তাহার পর কলিকাতায় স্থায়িভাবে অবস্থান করিবার সুযোগ মহারাজাই করিয়া দেন। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ১৩৩৬ সালের মাঘ-সংখ্যা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই ১৪ বৎসর কাল প্রভাত-কুমার সুষ্ঠুভাবে পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন।

আইন-কলেজে অধ্যাপনা

গয়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রভাতকুমার নাটোরাধিপতির চেষ্টা-যত্নে ১ আগষ্ট ১৯১৬ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

* "শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা" এই ছদ্মনামে প্রভাতকুমার "সুক্ষ্মলোম পরিণয়" নামক একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক "মর্ম্মবাণী"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কোন পুস্তক বা গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষদের গুণগ্রাহিতা

১৩৩৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভাতকুমারকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

মৃত্যু

৫ এপ্রিল ১৯৩২ (২২ চৈত্র ১৩৩৮, রাত্রি ২টা) তারিখে কলিকাতায় প্রভাতকুমারের মৃত্যু হয়।

প্রভাতকুমার স্বল্পভাষী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, নিরহঙ্কার ও সুমিষ্ট মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মগোপনপ্রয়াসী; সভা-সমিতির ঝিল্লীঝঙ্কার হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া আজীবন নীরবেই সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। অনাবিল সাহিত্য-রস পরিবেশন করিয়া পাঠক-সাধারণকে আনন্দদানই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা কখনও তাঁহাকে বিভ্রান্ত করে নাই। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, এবং এই দুইটি গুণের দ্বারা তিনি বন্ধুগোষ্ঠীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিক প্রভাতকুমার অপেক্ষা মানুষ প্রভাতকুমার যে ছোট ছিলেন না, সে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য খুব বেশী লোকের হয় নাই।

রচনাবলী

প্রভাতকুমার ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য-সেবা সুরু করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলির নিদর্শন পুরাতন 'ভারতী', 'দাসী' ও 'প্রদীপে'র পৃষ্ঠায় মিলিবে। তাঁহার

সর্ব্বপ্রথম রচনা বোধ হয় ১২৯৭ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা (ইং ১৮৯০) 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "চির-নব" নামে একটি কবিতা ; এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৭। কৌতূহলী পাঠকের জন্য কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১

নিতিই ভোরের বেলা
কুহরে পিককুল,
পবন খেলা করে
লইয়া ফোটা ফুল।

২

ক্রমশঃ ধরাখানি
সজাব হয়ে উঠে,
যে যার কায পানে
সকলে যায় ছুটে।

৩

লোহিত রঙ মাখা
যে দিকে নভঃ খানি,
সে দিকে চেয়ে থাকি,
উঠিবে দিনমণি।

৪

হেরিয়া সেই শোভা
মোহিত হ'য়ে থাকি'
উথলি উঠে হিয়া,
ভরিয়া যায় আঁখি।

৫

নিতিই সাঁঝের বেলা
পবন বহে ধীরে,
সরসী-জলে তোলে
শতটি লহরীরে।

৬

বিষাদে দিনমণি
ক্রমশঃ লাল লাল,
সরোজি কাঁদে বসি
রাঙিয়ে দুটি গাল।

৭

গাভীরা মাঠে থেকে
আবাসে আসে ফিরে।
কৃষক তার পাছে
লাঙল লয়ে শিরে।

৮

পাখীরা গাছে বসে
পূরবী গেয়ে গেয়ে,
ঘুমায়ে পড়ে ত্বরা
মাথাটি নীড়ে থুয়ে।

৯

সোণার চাঁদখানি
আকাশে হাসে আসি
সোহাগে ফুটে উঠে
বাগানে ফুল-রাশি।

১০

জোছনা, সরলতা
মাখিয়া মুখময়,
আমোদে ছেলে মেয়ে
"আয় রে চাঁদ" কয়।

১১

হেরিয়া সেই শোভা
মোহিত হ'য়ে থাকি,
উথলি উঠে হিয়া
ভরিয়া যায় আঁখি।

১২

গভীর নিশাকালে
কখনো জেগে উঠে,
হেরিতে চাঁদিমারে,
বাহিরে যাই ছুটে।

১৩

চাঁদের ক্ষীণ আলো
ধরণী গায়ে মাখা,
নিখিল চরাচর
ঘুমের কোলে রাখা।

১৪

কখনো দু' একটি
মেঘেরা ছুটে এসে
নাচিয়া চলে যায়
চাঁদের গায়ে ঘেঁসে।

১৫

হেরিয়া সেই শোভা
মোহিত হয়ে থাকি,
উথলি উঠে হিয়া,
ভরিয়া যায় আঁখি।

১৬

গভীর নিশাকালে,
প্রভাতে, দিবাভাগে,
নিতি যা দেখি, শুনি,
নিতি তা ভাল লাগে।

১৭

প্রকৃতি প্রতিদিন
গাহেন এক(ই) গান,
নিয়ত সেই গান,
তবুও ভরে প্রাণ।

১৮

প্রকৃতি, এই গান,
শিখিল কাছে যাঁর,
তাঁহার পায়ে কবি
প্রণমে বার বার।

ইহার পরবর্ত্তী চারি বৎসরে আমরা প্রভাতকুমারের কোন রচনার সন্ধান পাই না। কবিযশঃপ্রার্থী হইলেও তাঁহার মন ক্রমশঃ প্রবন্ধ ও গল্প রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তিনি স্মৃতিকথায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রথম বৎসরের 'প্রদীপ,' ১৩০৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি' গল্পটিই সর্ব্বপ্রথমে লিখিত ও প্রকাশিত ;* কিন্তু তখন আমি ছিলাম "কবি," সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়া শ্রীরাধামণি দেবী একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম।† এই কাল্পনিক নামটির একটু ইতিহাস আছে। তাহার পূর্ব্ববৎসর কুন্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল 'পূজার চিঠি'—স্ত্রী যেন প্রবাসী স্বামীকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিতেছে, এটা, ওটা জিনিষের সহিত এক বোতল কুন্তলীন আনিতেও অনুরোধ করিতেছে—এইরূপ পত্র রচনা করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামিতে আমি একখানি পত্র রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম ; উহা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য, ওই নামটির উপর কেমন মায়া হইয়া যায় ; গল্পের ছদ্মনাম-স্বরূপ উহাই ব্যবহার করি। কুন্তলীনেরা কেমন করিয়া জানিতে পারেন, পত্রখানি আমার লেখা। সেই অবধি উঁহারা পুরস্কার ঘোষণার সময় লিখিয়া দেন, কেহ আসল নাম গোপন করিয়া ছদ্মনাম ব্যবহার করিলে পুরস্কার পাইবেন না।......

রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। তিনি আমায় যখন গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম—'কবিতার মা বাপ নাই, যা খুসী লিখিয়া যাই—কবিতা

* ইহা ঠিক নহে, ১৩০৪ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রভাতকুমারের "কাজির বিচার" গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

† ইহা কাল্পনিক নাম নহে। প্রভাতকুমারের শ্যালক-পত্নীর নাম ছিল রাধামণি দেবী।

হয়। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন; সে পাণ্ডিত্য আমার কই?'

ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, 'গদ্য-রচনার জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর না বাঁধিয়া, সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক, একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি।' ইহার ফলে 'দাসী'তে চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাই, তাহাতে কোন নাম দিই নাই;* আর 'প্রদীপে'র জন্য ওই গল্প রচনা করি। কিন্তু গল্পের কথা রবীন্দ্রবাবুকে আমি জানাই নাই। সেই সংখ্যা 'প্রদীপ', 'ভারতী'তে সমালোচনা করিয়া রবিবাবু (তিনি তখন 'ভারতী'র সম্পাদক) আমার গল্পটির সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ভাদ্রের 'প্রদীপে' আর একটি গল্প ছাপা হইল, 'বেনামা চিঠি,'—তাহাও ওই রাধামণির বেনামাতে। রবিবাবু এবারও 'ভারতী'তে ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন। তখনও তিনি জানেন না যে, আমিই রাধামণি। দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচনা হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর 'প্রদীপে' নিজ মূর্ত্তি ধরিয়াই বাহির হইলাম। 'অঙ্গহানি' এবং 'জমানা' গল্প দুইটি আমার স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া বাহির হইল।

এক বৎসর সম্পাদকতা করিয়া রবিবাবু 'ভারতী' ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদন আরম্ভ করিলেন। সেই বৎসর ভারতীতে 'ভুল ভাঙ্গা' বাহির হইল।"—"মনীষা-মন্দিরে": কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১।

* মে ১৮৯৬ (বৈশাখ ১৩০৩) সংখ্যা 'দাসী' দ্রষ্টব্য। লেখার শেষে লেখকের নাম ছিল না, বার্ষিক সূচীতে ছিল। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে ১৩০২ সালের 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রভাতকুমারের "দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর" ও "নীলকুল-বাসুদেবের ব্রতকথা" প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রভাতকুমারের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **নব-কথা** (গল্প)। কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩০৬ (২০ ডিসেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ২৩৪।

'নব-কথা'র ভূমিকায় প্রকাশ :—"'বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার' লেখাটি আমার নহে। উহা আমার পূজনীয় পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে ইহা 'নব-কথা'র পরিশিষ্টরূপে সংলগ্ন হইল। এটিও 'ভারতী' হইতে পুনর্মুদ্রিত। কিন্তু সঙ্গদোষের জন্য পাঠকগণ এটিকেও কল্পনাপ্রসূত বলিয়া যেন ভ্রম না করেন। ন্যায়কমর্য্যাদার গুণে এই লেখাটি বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিবার উপযুক্ত। কলিকাতা ২৫ কার্ত্তিক ১৩০৬।"

'নব-কথা'র অন্তর্ভুক্ত একাদশটি গল্পের নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হইল :—

১। অঙ্গহীনা ('প্রদীপ', চৈত্র ১৩০৫); ২। হিমানী ('প্রদীপ', বৈশাখ ১৩০৬); ৩। ভূত না চোর? ('ভারতী,' চৈত্র ১৩০৩; "শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী"র নামে প্রকাশিত); ৪। বেনামী চিঠি ('প্রদীপ', ভাদ্র ১৩০৫—"রাধামণি দেবী"র ছদ্ম নামে); ৫। কুড়ানো মেয়ে ('ভারতী', আষাঢ় ১৩০৬); ৬। একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত ('দাসী', সেপ্টেম্বর ১৮৯৬); ৭। পত্নীহারা ('ভারতী,' শ্রাবণ ১৩০৬); ৮। ভুল-ভাঙা ('ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬); ৯। দেবী ('ভারতী', ভাদ্র ১৩০৬); ১০। ভিখারী সাহেব ('ভারতী', আশ্বিন ১৩০৬);

১১। বিষবৃক্ষের ফল ('ভারতী,' কার্ত্তিক ১৩০৬); ১২। বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার—পরিশিষ্ট ('ভারতী', কার্ত্তিক ১৩০৬)।

১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে পাঁচটি গল্প অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; এগুলি—কাজীর বিচার ('ভারতী', কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪); কাটামুণ্ড; শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি ('প্রদীপ', বৈশাখ ১৩০৫—"রাধামণি দেবী"র ছদ্ম নামে); শাহাজাদা ও ফকীর-কন্যার প্রণয়-কাহিনী; দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ('ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৩০২)।

এই সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশ :—"শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি" আমার সর্ব্বপ্রথম গল্প রচনা। "ভূত না চোর?" "কাটামুণ্ড" এবং "শাহাজাদা ও ফকীর-কন্যার প্রণয়-কাহিনী" এই তিনটি গল্প ভাষান্তর হইতে গৃহীত; অনুবাদ নহে—স্বেচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি। "দেবী" গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন—এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই। এখন করিলাম।"

২। **অভিশাপ** (ব্যঙ্গকাব্য)। ইং ১৯০০ (?)।

ইহা ১৩০৬ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত, এবং অব্যবহিত পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। ১৩০৮ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৩। **ষোড়শী** (গল্প)। রঙ্গপুর, আশ্বিন ১৩১৩ (২০ অক্টোবর ১৯০৬)। পৃ. ৩০১।

ইহাতে ১৬টি গল্প আছে; সেগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশকালের নির্দ্দেশ :—

১। বউ-চুরি ('ভারতী', বৈশাখ ১৩০৭); ২। সারদার কীর্ত্তি

('ভারতী', মাঘ ১৩০৬) ; ৩। প্রিয়তম ('ভারতী,' অগ্রহায়ণ ১৩০৬) ; ৪। বন্য-শিশু ('ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) ; ৫। কাশীবাসিনী ('ভারতী', বৈশাখ ১৩০৮) ; ৬। কলির মেয়ে ('ভারতী', আশ্বিন ১৩০৮) ; ৭। ধর্ম্মের কল ('ভারতী', আষাঢ় ১৩০৮) ; ৮। প্রণয় পরিণাম ('ভারতী', ভাদ্র ১৩০৮) ; ৯। ছদ্মনাম ('ভারতী', মাঘ ১৩০৮) ; ১০। বাস্তুসাপ ('ভারতী', বৈশাখ ১৩০৯) ; ১১। সচ্চরিত্র ('ভারতী', ফাল্গুন ১৩০৮) ; ১২। ভুল শিক্ষার বিপদ ('ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯) ; ১৩। অযোধ্যার উপহার ('ভারতী', বৈশাখ ১৩১০) ; ১৪। বলবান্ জামাতা ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩১৩) ; ১৫। খুড়া মহাশয় ('বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩১১) ; ১৬। গুরুজনের কথা ('প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩১১)

"বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদকর্ত্রী, শ্রীমতী এম্. এন্. নাইট্ মহাশয়া এই গ্রন্থের কতিপয় গল্প ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া বিলাতী মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।"—ভূমিকা। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস হইতে প্রকাশিত *Ten Tales* নামক পুস্তকে "বলবান্ জামাতা" গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ Muscular Son in-law" নামে স্থান পাইয়াছে

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় "বলবান্ জামাতা" গল্পটির নাট্য-রূপ 'গ্রহের ফের' (পৃ. ৪৭) নামে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ১৩১৮ সালের ৪ঠা কার্তিক তারিখে কোহিনূর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

৪। **রমাসুন্দরী** (সামাজিক উপন্যাস)। রঙ্গপুর, ১৩১৪ সাল (২৬ এপ্রিল ১৯০৮)। পৃ. ২৭১।

বৈশাখ ১৩০৯ হইতে আশ্বিন ১৩১০ পর্যন্ত 'ভারতী'তে ধারাবাহিক

ভাবে প্রকাশিত। ইহা ১৩০৯ সালের 'ভারতী'তে "সুন্দরী" নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৫। **শাহজাদা ও ফকীর-কন্যার প্রণয়-কাহিনী ; কাটামুণ্ড** (পৃ. ১৯) : **গুল বেগমের আশ্চর্য্য গল্প** (পৃ. ৬৭)। ১৩১৬ সাল (ইং ১৯০৯)।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাতকুমার ভাষান্তর হইতে গৃহীত এই তিনটি গল্প তিনখানি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ("মুসলমানী কেচ্ছা নং ১, নং ২, নং ৩") নামমাত্র মূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। পুস্তিকায় লেখকের নাম ছিল না। প্রথম দুইটি গল্প 'নব-কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩১৮) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; তৃতীয়টি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে ২য় ও ৩য় পুস্তিকা আছে।

৬। **দেশী ও বিলাতী** (গল্প)। গয়া, আশ্বিন ১৩১৬ (১৫ অক্টোবর ১৯০৯)। পৃ. ৩৪৮।

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দেশ :—

দেশী।—১। আমার উপন্যাস ('প্রবাসী', আশ্বিন ১৩১৩) ; ২। বিবাহের বিজ্ঞাপন ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩১২) ; ৩। আধুনিক সন্ন্যাসী ('প্রবাসী', মাঘ ১৩১১) ; ৪। এক দাগ ঔষধ ('ভারতী', পৌষ ১৩০৮, "পতন" নামে) ; ৫। স্বর্ণ-সিংহ ('প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) ; ৬। প্রতিজ্ঞা-পূরণ ('ভারতী', ভাদ্র ১৩১১) ; ৭। উকীলের বুদ্ধি ('প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩১৪) ; ৮। হাতে হাতে ফল ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৫) ; ৯। খালাস ('প্রাবাসী', ভাদ্র ১৩১৪) ; ১০। প্রত্যাবর্ত্তন ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩১৬)।

বিলাতী।—১। মুক্তি ('প্রবাসী', আষাঢ় ১৩১২) ২। ফুলের মূল্য

('প্রবাসী', ভাদ্র ১৩১২); ৩। পুনর্মূষিক ('প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩১২), ৪। প্রবাসিনী ('প্রবাসী,' আষাঢ় ১৩১৬)।

"শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "প্রত্যাবর্ত্তন" গল্প পাঠ করিয়া 'প্রবাসী'তে [জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬] যে সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুমতি লইয়া এই পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিলাম।"

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী "পুনর্মূষিক" গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ "The Prodigal's Return" নামে ও শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল "ফুলের মূল্য" গল্পটির অনুবাদ "A Shilling for Flowers" নামে *The Hindoosthan* পত্রের ২য়-৩য় খণ্ডের (ইং ১৯৪৫-৪৬) প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

Stories of Bengal Life--Translated from the Bengali of Prabhat Kumar Mukherji. By Miriam S. Knight and the Author. Calcutta 1912, Pp. 252+ 4 Glossary. [6th August, 1912]

Contents: 1. The Wiles of a Pleader, 2. His Release, 3. Swift Retribution, 4. The Lady from Benares, 5. Signs of the Times, 6. The Forest Child, 7 The Foundling, 8. The Fulfilment of a Vow, 9. The danger of being wrongly taught, 10. A Pseudonym.

১-৪ ও ৮ম সংখ্যক গল্প প্রভাতকুমার কর্ত্তৃক অনূদিত ও ১৯০৯-১০ সালের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রথম প্রকাশিত। ইহাতে 'নব-কথা'র অন্তর্ভুক্ত "কুড়ানো মেয়ে"; 'ষোড়শী'র "বন্য-শিশু," "কাশীবাসিনী," "কলির মেয়ে," "ছদ্মনাম" ও "ভুল শিক্ষার বিপদ" এবং 'দেশী ও

বিলাতী'র "প্রতিজ্ঞা-পূরণ," "উকীলের বুদ্ধি," "হাতে হাতে ফল" ও "খালাস"—এই ১০টি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ আছে।

৮। **নবীন সন্ন্যাসী** (উপন্যাস)। গয়া, ১ ভাদ্র ১৩১৯ (৬ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৪৪৬।

১৩১৭ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৮ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত।

'নবীন সন্ন্যাসী' সম্বন্ধে প্রভাতকুমার বলিয়াছেন :—"প্রবাসীর সমালোচক, নবীন সন্ন্যাসীর সমালোচনায় একটু ভুল করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান অভিযোগ এই যে, নবীন সন্ন্যাসীতে unity of actionএর অভাব আছে—লিখিয়াছিলেন, কোন চরিত্রই কেন্দ্রগ ভাব বা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ফুলের বীজকোষের পাশে পাপড়ির মত ফুটিয়া উঠে নাই। এখন, এই unity of action জিনিষটি নাটকেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ—উপন্যাসের নয়। তবে যে সকল উপন্যাস নাটক-লক্ষণাক্রান্ত, যেমন বঙ্কিম বাবুর—সেগুলিতে unity of action দেখা যায় বটে। কিন্তু আরও এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে—তাহা চিত্রজাতীয় বলা যাইতে পারে। Dickensএর উপন্যাসগুলিই এ জাতীয় উপন্যাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ; উহাতে প্লটও ঘোরালো হয় না—বীজকোষ পাপড়িরও কোনও হাঙ্গামা নাই। আমার নবীন সন্ন্যাসীও সেইরূপ চিত্রজাতীয় উপন্যাস। প্রবাসী নবীন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন—এক সময় কোন কোনও বিলাতী সমালোচক Dickens-এর বিরুদ্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছিলেন 'প্লট ঘোরালো নহে—Unity of action নাই।' তাই বলিয়া মনে করিবেন না, Dickensএর সহিত আমি নিজেকে তুলনা করিতেছি। একজাতীয়ত্ব দাবী করিতেছি মাত্র—যেমন সার গুরুদাস বাঁড়ুয্যে—আর আমাদের ঐ রস্থয়ে বামুন

আর কি।"—'মনীষা-মন্দিরে': কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১।

৯। **গল্পাঞ্জলি**। আশ্বিন ১৩২০ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ১৯৭।

ইহাতে ছয়টি গল্প আছে, সেগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দ্দেশ :—

১। বাল্যবন্ধু ('মানসী', অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩১৮);
২। বিলাত ফেরতের বিপদ ('বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩১৮);
৩। মাদুলী ('মানসী', আশ্বিন ১৩১৮);
৪। রসময়ীর রসিকতা ('মানসী', পৌষ ১৩১৬);
৫। মাতৃহীন ('মানসী', চৈত্র ১৩১৭);
৬। আদরিণী ('সাহিত্য', ভাদ্র ১৩২০)।

১০। **রত্ন-দ্বীপ** (উপন্যাস)। গয়া, আষাঢ় ১৩২২ (১৪ আগষ্ট ১৯১৫)। পৃ. ৩৪৯।

১৩১৯ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩২১ সালের মাঘ-সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মানসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য-কৃত ইহার নাট্যরূপ ১৩৪৭ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। নাটকখানি ২৪ ডিসেম্বর ১৯৪০ তারিখে রঙ্মহলে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

১১। **গল্পবীথি**। কলিকাতা, ১ আষাঢ় ১৩২৩ (২০ জুন ১৯১৬)। পৃ. ২৭০।

ইহাতে আটটি গল্প আছে; সেগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দ্দেশ :—

১। খোকার কাণ্ড ('মানসী', আশ্বিন ১৩২১); ২। বায়ু-পরিবর্ত্তন ('সাহিত্য', বৈশাখ ১৩২১); ৩। সম্পাদকের আত্মকাহিনী

('সাহিত্য', কার্ত্তিক ১৩২০) ; ৪। যজ্ঞভঙ্গ ('ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২১) ; ৫। লেডি ডাক্তার ('মানসী', আশ্বিন ১৩২০) ; ৬। নীলু-দা ('ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩২০) ; ৭। যুগল সাহিত্যিক ('ভারতবর্ষ', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২০) ; ৮। কুমুদের বন্ধু ('ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)।

১২। **জীবনের মূল্য** (উপন্যাস)। ফাল্গুন ১৩২৩ (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৪০।

১৩২২ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩২৩ সালের মাঘ-সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মানসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১৩। **পত্রপুষ্প** (গল্প)। ১৩২৪ সাল (১৮ আগষ্ট ১৯১৭)। পৃ ১৯৮।

ইহাতে যে গল্পগুলি আছে, তাহার নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দ্দেশ :—

১। নিষিদ্ধ ফল ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', ফাল্গুন ১৩২২) ; ২। সখের ডিটেকৃটিভ ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', শ্রাবণ ১৩২৩) ; ৩। কুকুর ছানা ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', আশ্বিন ১৩২৩) ; ৪। অদ্বৈতবাদ ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', ফাল্গুন ১৩২৩) ; ৫। সম্পাদকের কন্যাদায় ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', শ্রাবণ ১৩২৪) ; ৬। সত্যাদাস (সত্য ঘটনা—'মানসী ও মর্ম্মবাণী', বৈশাখ ১৩২৩)।

১৪। **সিন্দূর-কৌটা** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩২৬ (২০ মে ১৯১৯)। পৃ. ৪২০।

১৩২০ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩২৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১৫। **বারোয়ারি উপন্যাস**। বৈশাখ ১৩২৮ (ইং ১৯২১)। পৃ. ২৪৪।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত এই বারোয়ারি উপন্যাসের ৯—১১ পরিচ্ছেদ প্রভাতকুমারের লিখিত।

১৬। **গহনার বাক্স** ও অন্যান্য গল্প। শ্রাবণ ১৩২৮ (১৬ আগষ্ট ১৯২১)। পৃ. ১৮৮।

ইহাতে সন্নিবিষ্ট সাতটি গল্পের নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দ্দেশ :—

১। গহনার বাক্স ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', ফাল্গুন ১৩২৪);
২। আগ্নতত্ত্ব (মানসী ও মর্ম্মবাণী', কার্ত্তিক ১৩২৪);
৩। ডাক্তার মেয়ে ('ভারতবর্ষ', আষাঢ় ১৩২৫);
৪। মাষ্টার মহাশয় ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', আশ্বিন ১৩২৬);
৫। নয়নমণি ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', কার্ত্তিক ১৩২৬);
৬। বাজীকর ('মানসী ও মর্ম্মবাণী,' পৌষ ১৩২৪);
৭। কালিদাসের বিবাহ ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', আশ্বিন ১৩২৫)।

১৭। **মনের মানুষ** (উপন্যাস)। ১৩২৯ সাল (১০ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ৩০৪।

১৩২৭ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩২৯ সালের শ্রাবণ পর্য্যন্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১৮। **হতাশ প্রেমিক** ও অন্যান্য গল্প পৌষ ১৩৩০ (২২ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ. ২৫৩।

ইহাতে এই নয়টি গল্প আছে :—(১) হতাশ প্রেমিক ; (২) অলকা ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', আশ্বিন ১৩২৯) ; (৩) কুঙ্কুমকুমারীর গুপ্তকথা ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', অগ্রহায়ণ ১৩২৯) ; (৪) হীরালাল ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', শ্রাবণ ১৩৩০) ; প্রেম ও প্রহার ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', কার্ত্তিক ১৩৩০) ; (৬) ঔপন্যাসিক ('বঙ্গবাণী', কার্ত্তিক ১৩৩০);

(৭) বিনোদিনীর আত্মকথা ('মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩০) ; (৮) অদৃষ্ট পরীক্ষা ('মাসিক বসুমতী', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৯) ; (৯) জ্যোতিষী মহাশয় ('মাসিক বসুমতী', আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩০)।

১৯। **আরতি** (উপন্যাস)। ১৩৩১ সাল (১ অক্টোবর ১৯২৪)। পৃ. ১৭২।

২০। **সত্যবালা** (উপন্যাস)। ১৩৩১ সাল (১৫ এপ্রিল ১৯২৫)। পৃ. ২৩৪।

"এই পুস্তকের প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতী' পত্রিকায় [বৈশাখ, আষাঢ় ১৩১৩] "লামাকুমারী" নামক উপন্যাসের শিরোনামভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখন ঐ পর্যন্ত লিখিয়াই বন্ধ হইয়া যায়।"

এই উপন্যাসখানি ১৩২৯ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

২১। **বিলাসিনী** ও অন্যান্য গল্প। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সাল (২৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৮৬।

ইহাতে নয়টি গল্প আছে :—(১) বিলাসিনী ('সচিত্র শিশির,' বড়দিন-সংখ্যা, ১৩৩১) ; (২) চিরায়ুষ্মতী ('মানসী ও মর্ম্মবাণী,' আশ্বিন ১৩৩২) ; (৩) প্রজাপতির পরিহাস ('বার্ষিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩২); (৪) সতী ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', বৈশাখ ১৩৩২) ; (৫) পুলিনবাবুর পুত্রলাভ ('মানসী ও মর্ম্মবাণী,' আশ্বিন ১৩৩১) ; (৬) রেলে কলিসন ('শরতের ফুল' পূজা-বার্ষিকী, ভাদ্র ১৩৩২) ; (৭) গুণীর আদর ('সচিত্র শিশির,' ২৫ ফাল্গুন ও ২ চৈত্র ১৩৩০) ; (৮) রাণী অম্বালিকা ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', ফাল্গুন ১৩৩১) ; (৯) ভোজরাজের গল্প ('সচিত্র শিশির,'

৯ আশ্বিন ১৩৩১, "স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্বর্গবৈদ্যের উপদেশ" নামে প্রকাশিত)।

২২। **সুখের মিলন** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩৪ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ১৭২।

"আমার প্রণীত 'চোখে চোখে' নামক একখানি উপন্যাস, ইষ্টার্ণ ল হাউসে প্রকাশ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন—ইহাই সেই উপন্যাস, নামটুকু মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ফাঁদ রচনার কৌশলটি বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস লেখক হিউমের একটি গল্প হইতে আমি গ্রহণ করিয়াছি।"—ভূমিকা।

২৩। **যুবকের প্রেম** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৫ সাল (২৫ জুন ১৯২৮)। পৃ. ১৯৪।

ইহাতে এই সাতটি গল্প আছে:—১। যুবকের প্রেম ('মাসিক বসুমতী', ভাদ্র-কার্ত্তিক ১৩৩১); ২। হারাধন ('মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৩০—বৈশাখ ১৩৩১); ৩। উপন্যাস কলেজ ('ভারতবর্ষ', অগ্রহায়ণ ১৩৩৩); ৪। পোষ্টমাষ্টার ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', চৈত্র ১৩৩০); ৫। দাম্পত্য-প্রণয় ('মাসিক বসুমতী', জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র ১৩৩২); ৬। সুশীলা না পিপুলা ('বার্ষিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩৩); ৭। বিলাতী রোহিণী ('নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি' ১৩৩২)।

২৪। **সতীর পতি** (উপন্যাস)। ১৩৩৫ সাল (৮ অক্টোবর ১৯২৮)। পৃ. ৩৬০।

১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে ১৩৩৫ সালের ভাদ্র-সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২৫। **প্রতিমা** (উপন্যাস)। ১৩৩৫ সাল (৯ নবেম্বর ১৯২৮)। পৃ. ১৩২।

২৬। **নূতন বউ** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৫ সাল (২৫ মার্চ ১৯২৯)। পৃ. ২২৩।

ইহাতে ৯টি গল্প আছে, সেগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দেশ :

১। নূতন বউ ('বার্ষিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩৪); ২। ভুল ('নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি,' ১৩৩৩); ৩। যোগবল না সাইকিক ফোর্স ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', পৌষ ১৩৩৩); ৪। ডোরা ('মাসিক বসুমতী', বৈশাখ ১৩৩৫); ৫। ঢাকার বাঙ্গাল ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩); ৬। বেকসুর খালাস ('মাসিক বসুমতী', আশ্বিন, ১৩৩৫); ৭। বাপ্ কী বেটী ('কুন্তলীন পুরস্কার', ১৩৩৫); ৮। কানাইয়ের কীর্ত্তি ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', কার্ত্তিক ১৩৩৫); ৯। পত্রের চিঠি ('মানসী ও মর্ম্মবাণী', ফাল্গুন ১৩৩৫)।

২৭। **গরীব স্বামী** (উপন্যাস)। ? (২৫ এপ্রিল ১৯৩০)। পৃ. ২৮৭।

১৩৩৩ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩৩৬ সালের মাঘ-সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২৮। **নবদুর্গা** (উপন্যাস)। ? (৩১ জুলাই ১৯৩০)। পৃ. ২৪৫।

আশ্বিন ১৩৩৫ হইতে চৈত্র ১৩৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২৯। **জামাতা বাবাজী** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৮ সাল (৫ নবেম্বর ১৯৩১)। পৃ. ২২৮।

ইহাতে এই নয়টি গল্প আছে :—(১) জামাতা বাবাজী ('মাসিক বসুমতী', কার্ত্তিক ১৩৩৭); (২) দিব্য দৃষ্টি ('মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩৬); (৩) "প্রেমের ইন্দ্রজাল"; (৪) হারানো মেয়ে; (৫) সুশোভনা ('মাসিক বসুমতী', পৌষ ১৩৩৬); (৬) ঘড়ি ('মাসিক বসুমতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭); (৭) একালের ছেলে ('নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি', আশ্বিন ১৩৩৭);

(৮) সুধার বিবাহ ('মাসিক বসুমতী', বৈশাখ ১৩৩৪); (৯) বি. এ. পাস কয়েদী ('মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩৮)। পরিশিষ্ট—আইনের গল্প: (১) মাতঙ্গিনীর কাহিনী; (২) বেশ্যা খুন।

৩০ **বিদায় বাণী** (উপন্যাস)। ৬ পৌষ ১৩৪০ (২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৩)। পৃ. ২৬৮।

১৩৩৭ সালের আশ্বিন হইতে ১৩৩৮ সালের চৈত্র-সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। প্রভাতকুমার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

পুস্তকের ১৫২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রভাতকুমারের রচনা; বাকী অংশ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের।

প্রভাত-গ্রন্থাবলী, ১ম—৫ম ভাগ। জানুয়ারি ১৯২৩—সপ্টেম্বর ১৯২৫ (বসুমতী)।

সূচী:—নব-কথা, অভিশাপ, ষোড়শী, রমাসুন্দরী, দেশী ও বিলাতী, নবীন সন্ন্যাসী, গল্পাঞ্জলি, রত্ন-দ্বীপ, গল্পবীথি, জীবনের মূল্য, পত্রপুষ্প, সিন্দুর-কৌটা, গহনার বাক্স, মনের মানুষ, হতাশ প্রেমিক, আরতি, সত্যবালা, বিলাসিনী (কেবলমাত্র গুণীর আদর ও অম্বালিকা গল্প দুইটি), যুবকের প্রেম (কেবলমাত্র যুবকের প্রেম, হারাধন ও পোষ্টমাষ্টার গল্প তিনটি)। ইহা ছাড়া ১ম ও ৩য়-৫ম ভাগ গ্রন্থাবলীতে "বিলাত ভ্রমণ" নামে কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে; এগুলি 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চম ভাগ গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত দুইটি প্রবন্ধ—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্রা—১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের 'দাসী', হইতে গৃহীত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

প্রভাতকুমারের রচিত বহু কবিতা 'ভারতী', 'দাসী', 'প্রদীপ' ও 'মানসী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল; এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'অভিশাপ'ই

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত অনেক গল্প-রচনাও বিভিন্ন মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে; এই সকল রচনা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

নীলকুল-বাসুদেবের ব্রত কথা ... 'ভারতী', পৌষ ১৩০২
ছেলে মানুষ করা ... আশ্বিন ১৩০৩
সমালোচন খেয়াল ... আষাঢ় ১৩১৩
"বাবুর" আক্ষেপ ... অগ্রহায়ণ ১৩১৩
সিমলা-শৈল (সচিত্র) ... 'প্রদীপ', ফাল্গুন ১৩০৪
চিত্ত-বিকাশ (সমালোচনা) ... ফাল্গুন ১৩০৫
গাজিপুরে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় (সচিত্র আষাঢ় ১৩০৭
"সর্ব্ব বিষয়ে স্বদেশী" ... 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩১৩
ভূতনামানো ... চৈত্র ১৩১৪
কুমীর পোষা (সচিত্র, সংকলন) ... কার্ত্তিক ১৩১৭
বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনপঞ্জী ... 'মানসী', চৈত্র ১৩২১
স্বক্ষলোম পরিণয় (পঞ্চাঙ্ক নাটক) ... 'মর্ম্মবাণী', ১৩ শ্রাবণ ১৩২২
চন্দ্রের কলঙ্ক ... ২ ভাদ্র ১৩২২
পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প...'মানসী ও মর্ম্মবাণী', ভাদ্র ১৩২৫
কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব-সূচক একটি কিম্বদন্তী... পৌষ ১৩২৮
সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর 'সচিত্র শিশির', ৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০
চিত্তরঞ্জনের বাণী ...'মাসিক বসুমতী,' আষাঢ়, ১৩৩২
অমৃতলালের স্মৃতিতর্পণ ... শ্রাবণ ১৩৩৬
দুধ-মা (গল্প) ... চৈত্র ১৩৩৮
কাজির বিচার (ছেলেদের গল্প) ... 'রামধনু', মাঘ ১৩৩৪

১৩৩০ সালে প্রকাশিত, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ-প্রণীত 'হেমচন্দ্র' পুস্তকের ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্টে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে "প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথা" মুদ্রিত হইয়াছে।

ছোট গল্পের লক্ষণ

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-সংগ্রহ 'ঘরের কথা' প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমার পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ভূমিকার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; ইহা হইতে ছোট গল্পের লক্ষণাদি সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের অভিমত জানা যাইবে।—

"উপন্যাসের মত, ছোট গল্প জিনিষটাকেও আমরা পশ্চিম হইতে বঙ্গ-সাহিত্যে আমদানি করিয়াছি। ছোট গল্পের জন্ম সুদূর পশ্চিমে—আমেরিকায়। মার্কিনেরা বড় ব্যস্ত জাতি—তাহাদের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই—তাই বোধ হয় সে দেশে ছোট গল্পের জন্ম হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে ইউরোপে এবং তথা হইতে আনীত হইয়া এখন ইহা মহীয়সী বঙ্গবাণীর চরণে নূপুরস্বরূপ বিরাজিত, মৃদু মধুর শিঞ্জন-রবে বঙ্গীয় পাঠকের চিত্তবিনোদন করিতেছে।

পূর্ব্বকালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু তিনটি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন;—সঞ্জীববাবুও দুই একটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে। কিন্তু সেগুলি আকারে ছোটমাত্র, নচেৎ উপন্যাসেরই লক্ষণাক্রান্ত। বর্ত্তমান সময়ে ছোট গল্পের মধ্যে যে একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, তাহা সেগুলিতে ছিল না। ছোট গল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেবী বীণাপাণির নূপুরের উজ্জ্বলতম, মিষ্টতম ঘুঙ্গুর-গুলি তাঁহারই প্রদত্ত।

ছোট গল্পের জন্ম আমেরিকায় হইলেও তথাকার সাহিত্যে ইহা তেমন স্ফূর্তি লাভ করে নাই। প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প-লেখকের সংখ্যা আমেরিকায় অধিক নহে, বরঞ্চ ইংরাজী সাহিত্যে ইহার সমধিক বিকাশ দৃষ্ট হয় আর সম্পূর্ণ বিকাশ ফরাসী সাহিত্যে। ইংরাজী ছোট গল্প ঘটনাপ্রধান। ফরাসী ছোট গল্পে রসের প্রাধান্য পরিস্ফুট। বিষয়টা কিছুই নহে—ঘটনাটা তুচ্ছ বলিলেও হয়—কিন্তু পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের লহরী খেলিতে থাকে। একজন পলাতক সৈনিক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। রাত্রি হইয়াছে। সে একটা গিরিগুহায় আশ্রয় লইল। প্রভাতে উঠিয়া দেখিল,—সেই গুহায় এক বাঘিনী নিদ্রিত। বাঘিনী তাহাকে কিছু বলিল না। ক্রমে সেই বাঘিনীর সঙ্গে সৈনিক পুরুষের বন্ধুত্ব জন্মিল। মানবী যেমন স্বীয় প্রণয়ীর প্রতি প্রেমানুভব করে,—এই সৈনিকের প্রতি বাঘিনীরও সেইরূপ ভাবাবেশ অদ্ভুত কৌশলে লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। কিছু দিন যায়। একদিন সৈনিক, বাঘিনীর অনুপস্থিতিতে জঙ্গল হইতে পলাইতেছিল। অনেক দূর গিয়া দেখে, বাঘিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিতেছে। সৈনিকের কাছে আসিয়া সে তীব্র অনুযোগ ও গভীর অভিমানপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু নিপুণ লেখক এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে কথা কহার অধিক। বাঘিনীকে আদর করিতে করিতে সৈনিক আবার ফিরিয়া আসিল। বড় বিপদে পড়িল। আবার যদি পলাইতে যায়, এবার হয়ত তাহার উপেক্ষিতা প্রণয়িনী তাহার রক্তাস্বাদন করিবে। তাই একদিন সে বাঘিনীকে আদর করিতে করিতে, তাহার সহিত খেলা করিতে করিতে, তাহার বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। হায় মানব প্রণয়ী, তুমি এমনি অবিশ্বাসীই বটে! বাঘিনী মরিল। মরিবার সময় তাঁহার

চক্ষুর ভাব লেখক যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, পড়িলে পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হয়।*

ব্যাপারটা অদ্ভুত হইলেও ঘটনাটা কিছুই নয়। ইংরাজ সমালোচকেরা অনেক সময় অক্ষম ঔপন্যাসিকের গ্রন্থ সমালোচনা করিতে যেমন বলেন —'ইহাতে কিছুই ঘটিল না'—(nothing happens)—সেইরূপ উপরোক্ত গল্পে কিছুই ঘটিল না—একটা বাঘ মারা গেল মাত্র। কিন্তু এই কিছু-না-ঘটার ভিতর দিয়া লেখক যে Emotion-এর রঙ ফলাইয়া গেলেন, তাহা সাহিত্যের পরম সম্পদ্।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছোট গল্পের ভিতর দিয়া নানা রসের প্রবাহ বহাইয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্পগুলিও ঘটনাবিরল—রসপ্রধান। ধরুন তাঁহার "কাবুলিওয়ালা"। কি বা ঘটিল? কিছুই নহে। পিতা বসিয়া বসিয়া নভেল লিখিতেছেন—আর তাঁহার পাঁচ বৎসরের মেয়ে মিনির মুখে খৈ ফুটিতেছে। ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলি-ওয়ালা আসিয়া উপস্থিত। কাবুলিওয়ালা আসে যায়, ক্রমে মিনির সহিত তাহার ভারি ভাব হইয়া গেল। সে মিনিকে বিনামূল্যে বাদাম কিস্‌মিস্ খাওয়াইল। একটা দাঙ্গা করিয়াছিল (তাহাও নেপথ্যে—গল্পের ভিতর নাই), জেলে গেল। কত বৎসর পরে জেল হইতে ফিরিয়া আবার মিনিকে দেখিতে আসিল। কিন্তু পিতা দেখা করিতে দিলেন না। সে সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল—ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবু, এই আঙুর আর কিস্‌মিস্ বাদামগুলি খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাঁহাকে দিও।" বাবু মূল্য দিতে গেলেন, সে তাঁহার হাত চাপিয়া বলিল—"আমায় পয়সা দিও না। তোমার যেমন একটি

* Balzac's "Passion in the desert,"

লড়্‌কী আছে, দেশে আমারও একটি লড়্‌কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি ত সওদা করিতে আসি না।” এই বলিয়া সে আপনার ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বাবু দেখিলেন, কাগজের উপর একখানি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপর তাহারই চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। “কন্যার এই স্মরণ চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশু-হস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধা সঞ্চার করিয়া রাখে।”—ইহা দেখিয়া মিনির পিতার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিয়াছিল। আমাদের চক্ষুই যে শুষ্ক থাকে, এমন কথা বলিতে পারি না। তখন পিতা মিনিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে দিন তাহার বিবাহ। রাঙা চেলি পরা, কপালে চন্দন আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। মিনি চলিয়া গেলে, রহমৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। মনে হইল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের মতন তেমনটি আর পাইবেন না। “সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতর বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।—মিনির পিতা একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলেন, বলিলেন—“রহমৎ, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।—” এই টাকাটা দেওয়াতে মিনির পিতাকে উৎসব-সমারোহের দুই একটা অঙ্গ ছাটিয়া দিতে হইল।

যেমন মনে করিয়াছিলেন, তেমন করিয়া বিদ্যুতের আলো জ্বালাইতে পারিলেন না, গড়ের বাদ্যও আসিল না। মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে তাঁহার শুভ-উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।"

শুধু মিনির পিতৃগৃহ নহে—বঙ্গসাহিত্য এই পিতৃস্নেহের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর অনেকগুলি ছোট গল্প এইরূপ Emotion-এর স্বর্ণরেখায় উদ্‌ভাসিত। শিক্ষিত পাঠক সেগুলির সহিত পরিচিত। আড়ম্বর করিয়া সেগুলির পরিচয় দিতে যাওয়াই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

রবীন্দ্রবাবুর সকল গল্পগুলিই যে ঘটনাবিরল, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন", "প্রায়শ্চিত্ত", "ত্যাগ", "মুক্তির উপায়", "জীবিত ও মৃত", "মানভঞ্জন" প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারা যায়। তবে সে ঘটনার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে সেগুলিকে বিশেষ করিয়া ছোট গল্পেরই উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া এক একটি চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠে। ছোট গল্পে চরিত্র-বিকাশের স্থান নাই। বর্ণিত চরিত্র বিকশিত ভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, এবং ঘটনাটির সঙ্গে সে চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে পারিলেই লেখকের কার্য্য সম্পন্ন হইল। সুতরাং সে ঘটনাটি এমন হওয়া চাই, যাহাতে পর্দ্দায় পর্দ্দায় চরিত্রটির সঙ্গে মিলিয়া যায়, অথচ তাহার কোন অংশ নিরর্থক পড়িয়া না থাকে। উক্ত গল্পগুলি আলোচনা করিলে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যদি ছোট গল্পে এমন কোন ঘটনা ঘটে, যাহা বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিশিয়া যাইতেছে না, অথবা সে চরিত্রটি বুঝিবার পক্ষে সে ঘটনাটি অত্যাবশ্যক নয়, তাহা হইলে সে ছোট গল্প ভাল হইল

না। ঘটনায় ও চরিত্রে যদি জমাট না বাঁধিল, তাহা হইলে দুই-ই বিফল।......

আজকাল কোন কোন ছোট গল্পলেখক এমন বিষয় বা এমন সমাজের অবতারণা করেন, যে বিষয় বা সমাজের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় নাই। ফলে এই হয়, তাঁহারা এমন সকল ভুল করিয়া বসেন, যাহা নিতান্তই হাস্যকর। তাহাতে সাহিত্যরস নষ্ট হইয়া যায়। যিনি কখনও ব্রাহ্মসমাজ বা বিলাত-ফেরত সমাজের গণ্ডীর মধ্যে পদার্পণ করেন নাই—থিয়েটারের নাটক হইতেই উক্ত সমাজ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়াছেন :—তিনি হঠাৎ ব্রাহ্মসমাজ বা বিলাত-ফেরত সমাজের একটা গল্প লিখিয়া বসিলেন। যিনি কখনও মানচিত্রে ভিন্ন বিলাত দেখেন নাই, রেনল্ডের নভেল ভিন্ন অন্যত্র বিলাতী সমাজের সহিত যাঁহার পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নাই, তিনি বিলাতী সমাজের একটা গল্প লিখিয়া ফেলিলেন। অনেক সময় সে গল্প পড়িয়া আমরা হাসিব, কি কাঁদিব, স্থির করিতে পারি না।"...

গয়া, ২৭ ভাদ্র ১৩১৭।

প্রভাতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য

প্রভাতকুমারের গল্পগুলির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বলিয়া এ যুগের তরুণ সাহিত্য-রসিক সম্প্রদায় বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রভাত-কুমারের যোগ্য মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার গল্পগুলি সরস বর্ণনায় এবং সুরস ব্যঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া আছে বলিয়া প্রাণধর্মে চঞ্চল ও সজীব; সহৃদয় পাঠকের কাছে সেগুলির কখনও মার

নাই। বিলাত হইতে দেশ, প্রাচীন হইতে আধুনিক বিষয়ের বিস্তারেও প্রভাতকুমার আশ্চর্য্য প্রতিভা ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রসিক সহানুভূতিপরায়ণ চিত্তটির স্পর্শও আমরা নির্ম্মল হাসি ও অক্রোধ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া সর্ব্বত্র লাভ করি; জীবন ও জগৎকে দেখিবার ও দেখাইবার সহজ ভঙ্গিটি আমাদিগকে স্বতই মুগ্ধ করে। প্রভাত-কুমারের সাহিত্যের প্রধান পরিচয় তাঁহার গল্পগুলি, তাহা সমালোচকের বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি এ যুগের পাঠকের অবগতির জন্য আমরা প্রভাতকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুইখানি পত্র এখানে মুদ্রিত করিলাম।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

তোমার গল্পের বই দুটি [২য় সংস্করণের 'নব-কথা' ও 'ষোড়শী'] এখানে আসিয়া পাইয়াছি। মনে ভাবিলাম সব গল্পই ত পূর্ব্বে পড়া হইয়াছে—ইহা আর পড়িব কি? অন্যান্য সাধারণ লোকের মত অপূর্ব্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, হাতে কাজ ছিল না তাই নিতান্ত অলস ভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে সুরু করিলাম—দেখিতে দেখিতে মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোট গল্প লেখায় পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জ্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্য্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত—গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র

নাই—সেটা বিষম ভারি—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না। যাহা হউক তোমার প্রথম সংস্করণের পাঠকেরা দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভীড় করিয়া দাঁড়াইবে, নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শান্তিধাম, ইং ১৯১৩]

পরমকল্যাণাস্পদেষু,

আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবে তোমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আমার মনে পড়ে না—আমি জানকীর বাড়াতে (Mr. Ghosal) তোমাকে একদিন দেখিয়াছিলাম—তখন তোমার গোঁফের রেখা মাত্র ছিল। তোমার সেই সৌম্য মূর্ত্তিই আমার মনে অঙ্কিত রহিয়াছে। তোমার সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তুমি আমার নিকট সুপরিচিত। তোমার রচিত কোন গল্প মাসিক পত্রিকাদিতে বাহির হইলেই আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি। তোমার গল্প আমার খুবই ভাল লাগে। বড় বড় ফরাসী গল্প লেখকদের গল্প অপেক্ষা তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে। তোমার প্রতিভায় বঙ্গসাহিত্যের এক অংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার 'গল্পাঞ্জলি' উপহার পাইয়া যারপরনাই প্রীত হইলাম। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১৮৫৮—১৯২৪

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

সংক্ষিপ্ত জীবনী

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গমহিলাদের কেহ কেহ কাব্য রচনা করিয়া ছাপার হরফে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকামিনী দাসী-রচিত 'চিত্তবিলাসিনী' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৮ নবেম্বর) ইহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গুপ্ত-কবি স্বীয় পত্রে কুলকন্যাদের রচনা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ দিতেন। ৫ জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' অনঙ্গমোহিনী দাসীর পতিবিরহবিষয়ক একটি দীর্ঘ কবিতা দেখিতে পাই। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের 'সংবাদ প্রভাকরে' "ঠাকুরাণী দাসী" এই ছদ্ম নামে এক সম্ভ্রান্ত বিপ্র-বিধবা কবিতা লিখিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।* 'প্রভাকরে' প্রকাশিত তাঁহার একটি কবিতার চরণ এইরূপ :—

ছোট ছোট তরুবর, ধরে বেশ মনোহর
গলে পরি জোনাকির হার।

গুপ্ত-কবি কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা একাল পর্যান্ত কত কত প্রাচীন কবির প্ররচিত "সন্ধ্যাবর্ণন" পাঠ করিলাম, কিন্তু তরুণ তরু গলদেশে জোনাকির হার ধারণপূর্ব্বক সুচারু শোভা সঞ্চার করিতেছে,

* ঠাকুরাণী দাসীর রচনার নিদর্শন আমি 'পঞ্চপুষ্প' (আশ্বিন ১৩৩৮) ও 'দেশ' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) প্রকাশ করিয়াছি। অনঙ্গমোহিনী দাসীর রচনাটিও ৩য় বর্ষের 'দেশে' মুদ্রিত হইয়াছে।

এমত সুন্দর দৃষ্টান্ত তাহার কোনো কবিতাতেই দেখিতে পাই নাই।...

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতিরা সংপ্রতি বিদ্যালোচনা পূর্ব্বক রচনার সূচনা করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা অধিক আহ্লাদকর ব্যাপার আর কি আছে! ইঁহারা বিদ্যাবতী হইলেই দেশের সমস্ত দুর্দ্দশা, দুর্গতি এবং দুর্নাম দূর হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?"

"ঠাকুরাণী দাসী"র পরে আমরা যে সকল মহিলা-কবির পরিচয় পাই, তাঁহাদের মধ্যে 'অশ্রুকণা'-রচয়িত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অর্দ্ধশতাব্দীকাল তিনি একনিষ্ঠভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবদ্দশায়, ১৩১৭ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী দেবী-লিখিত "অশ্রুকণা-রচয়িত্রী" নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"সন ১২৬৫ সালে ৩রা ভাদ্র [১৮ আগষ্ট ১৮৫৮] কলিকাতা ভবানীপুরে মাতুলালয়ে গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা ৺হারাণচন্দ্র মিত্রের আদি নিবাস কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তরে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাণিহাটি গ্রামে।

মজিলপুর গ্রামে গিরীন্দ্রমোহিনীর শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। বাটীস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ে ইনি প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থপাঠে অতিবাহিত হইত। শিক্ষার প্রতি গিরীন্দ্র-মোহিনীর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। খেলাধূলার সময় খেলা করিতে তিনি বড় একটা ভালবাসিতেন না। বিদ্যালয়ে সর্ব্বদাই তিনি রৌপ্য-পদকাদি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। শৈশব হইতেই তাঁহার চিত্ত পরদুঃখকাতর, শান্তিপ্রিয়, তিনি যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

করিতেন, তখন তাঁহার সহপাঠিনী এক দরিদ্র বালিকা একদিন কান বিঁধাইয়া, কানে সুতা পরিয়া বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল। কানে সুতা পরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বালিকা বলিল, "আমরা গরিব মানুষ, সোনার মাকড়ি পাব কোথা, ভাই, তোমাদের মত!" কথাটা বলিবার সময় বালিকার চোখ ছল ছল করিয়াছিল, তাহাতে সহৃদয়া গিরীন্দ্রমোহিনী এমন বিচলিতা হইলেন যে, তদ্দণ্ডেই আপনার কর্ণ হইতে মুক্তার মাকড়ি খুলিয়া তিনি বালিকার কর্ণে পরাইয়া দেন! এমন করিয়া বিস্তর দরিদ্রা বালিকাকে তিনি নূতন বস্ত্র জামা প্রভৃতি দান করিতেন! এ বিষয়ে মাতার অনুজ্ঞার অপেক্ষাও রাখিতেন না। মাতা কন্যার অতিরিক্ত দানশীলতায় বিরক্ত হইলে, বালিকা কন্যা করুণ কণ্ঠে কহিতেন, "আহা, ওদের যে নাই মা!"

শৈশবে শিক্ষকের নিকট গিরীন্দ্রমোহিনী ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিঞ্চিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। সেই সময় ইংরাজী শিখিবার উদ্যোগ হয়। স্বামীর নিকট তিনি ইংরাজী পড়িতেন; কিন্তু কিছুকাল পড়িয়াই পড়া ছাড়িয়া দিলেন। স্বামী অনুযোগ করিলে গিরীন্দ্রমোহিনী বলিলেন, "গুরু মহাশয়ের নিকট না পড়িলে বিদ্যাশিক্ষা হয় না।" কবির দাম্পত্য-জীবনের এ রহস্যটুকু কেমন মিষ্ট ও উপভোগ্য।

শৈশবেই তাঁহার কাব্যানুরাগ প্রস্ফুট হইয়াছিল। কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বালিকা গিরীন্দ্রমোহিনী আধ আধ ভাষে বলিতেন,

"আমার নামটি বাবু চাঁদা।
পাখী মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাঁধা!"

গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা হারাণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ, সেই সময় একদিন

তিনি কন্যার নিকট একটি ইংরাজী কবিতা বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকা কন্যা ছন্দে সেই বিদেশী কবিতার মর্ম্ম গাঁথিয়া পিতাকে দেখাইলেন। এই কবিতাটি "তপোবন" নামে 'ভারত-কুসুমে' প্রকাশিত হইয়াছে। তার পর বালিকার কল্পনা বিকাশের সহায়তাকল্পে পিতা তাঁহাকে Paul and Virginia, Theodosius, Constancia প্রভৃতি পুস্তক ও গল্প বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তাহা হইতে, এবং মাতামহী সংগৃহীত 'মহানাটক', 'কোকিলদূত', 'যোজনগন্ধা', 'বাসবদত্তা', 'ইসফ্জেলেখা', 'কবিকঙ্কণ' প্রভৃতি পাঠ করিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য-প্রতিভা স্ফুরিত হইয়া উঠে।

দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী ৺নরেশচন্দ্র দত্ত বহুবাজার নিবাসী সম্ভ্রান্ত জমিদার ৺অক্রূর দত্ত মহাশয়ের প্রপৌত্র ৺দুর্গাচরণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র।

বিবাহের পর, বিদ্যাশিক্ষায় ব্যাঘাত জন্মিলেও কাব্যানুরাগ বিন্দু-পরিমাণেও শিথিল হয় নাই। শিক্ষা নানা পথে তাঁহার প্রতিভাকে চালিত করিয়াছে। সূচীর সূক্ষ্ম শিল্প এবং রন্ধনাদি কার্য্যে গিরীন্দ্র-মোহিনী সুনিপুণা। পরিণত বয়সে চিত্রকার্য্যেও তিনি সুপটু হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র বঙ্গদেশের নানা শিল্প-প্রদর্শনীতে সমাদর ও পদকাদি লাভে সমর্থ হইয়াছে, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' প্রকাশ সম্বন্ধে বেশ একটু ইতিহাস আছে। ইংরাজী ১৮৭০ [১৮৭২ ?] খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত গদ্যে পদ্যে লিখিত কয়েকখানি পত্র তাঁহার স্বামীর জনৈক বন্ধু "জনৈক হিন্দু মহিলার পত্র" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। পত্র প্রকাশিত হইলে, নববধূ গিরীন্দ্রমোহিনী অতিশয় লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া প্রবাসী স্বামীকে লিখিয়াছিলেন, "যদি আমার রচনা লোককে দেখাইতে

এত ইচ্ছা হইয়াছিল, তবে বলিলে আমি অন্য কবিতা না হয় দিতাম। পত্র কেন প্রচার করিলে?" ইহার ফলেই গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'কবিতাহার' প্রকাশিত হয়।...

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রকৃতিটি প্রকৃতই কবিজনোচিত। গর্ব্ব নাই, দ্বেষ নাই, আড়ম্বর নাই। শান্ত মৃদু কথাবার্ত্তায়, মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধ-বাসিনী কবি নিতান্তই যেন 'প্রকৃতিপালিতা'। আজও পর্য্যন্ত ইনি গম্ভীরপ্রকৃতি গৃহিণী (serious house-wife) নহেন। কিন্তু ভবসমুদ্রের কূলে তিনি আবার সমুদ্রেরই মত গম্ভীর।

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, 'ভারতী'-সম্পাদিকার সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সখ্য! এমন সখ্যভাব সাহিত্য-জগতে—বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে—বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সখ্যভাব আজীবন সমভাবে রহিয়াছে। 'ভারতী'-সম্পাদিকা তাঁহার রচিত 'স্নেহলতা' গিরীন্দ্রমোহিনীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, গিরীন্দ্রমোহিনীও সখীকে তদ্‌রচিত 'শিখা' প্রত্যুপহার দিয়াছেন।

ইঁহাদিগের পরস্পরের প্রীতি-সম্পর্কের নাম, "মিলন"। একদিন গিরীন্দ্রমোহিনী 'ভারতী'-সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আপনার মাথার চুলের কাঁটা ফেলিয়া যান, সেই ছলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 'ভারতী'-সম্পাদিকা এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে।
কই রে মিলন কোথা, সে কি হেথা আছে আর!
রাখিয়া গিয়াছে শুধু সরল পরশ তার।
ফুলটি সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রুজল গেছে দিয়ে।

সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা-তারা
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা
ফুলটি সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটা দুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

গিরীন্দ্রমোহিনী 'আভাষে' স্বীয় সখীকে লিখিতেছেন :—

মিলন মিলন কত বারই বলি,
কই রে মিলন কই ?
মিলন চাহিতে বিরহ-সায়রে,
ডোব-ডোব তরী সই !
ভাসা ভাসা নদী, আশাভরা তরী
বেয়ে চলি ধীরি ধীরি,
অনন্তের কূলে মধুর মিলনে,
যদি রে মিশিতে পারি !
লইয়া বিদায় সবে চলে যায়
দেখা না হইতে শেষ—
বুঝি, তাই ভয়ে মরি, যাই সরি সরি
করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে যদি বোঝা ফেলে যেও সোজা,
গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি যাব চলে একা,
ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবন দুঃখের জীবন। বাণীর কমল-বন, বুঝি, চিরকণ্টকাকীর্ণ। তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য কখনও ভাল ছিল না। প্রবাসে, স্বাস্থ্য-নিবাসেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। গিরিন্দ্রমোহিনী নরেশচন্দ্রের ছায়াস্বরূপিণী বলিলে,

অত্যুক্তি হয় না। পতিগতপ্রাণা হিন্দু সহধর্ম্মিণীর তিনি আদর্শস্থানীয়া। পতির জন্যই তাঁহার জীবন—নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, কিছু নাই, এমনভাবেই তিনি অনুপ্রাণিতা।

বালিকা বধূ দশ বৎসর বয়সে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন—কালের কঠিন বিধানে আজ সে স্বামী পাশে নাই—শরীরী হইয়া নাই, কিন্তু অশরীরী আত্মায় মিশাইয়া আছেন—এই ভাবই গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের মেরুদণ্ড। এইটুকু মনে রাখিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য পাঠ করিতে হইবে। নচেৎ কাব্য ও কবির প্রতি সুবিচার না হইতেও পারে।

ইংরাজী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (সন ১২৯০ সাল) নরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। স্বামীকে হারাইয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয় যে বিপুল শোকে ভরিয়া উঠিল, তাহারই "'অশ্রু-কণা' লাভ করিয়া বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য ধন্য হইল।"

১৩৩১ সালের ২৮এ শ্রাবণ (১৬ আগষ্ট ১৯২৪) তারিখে গিরীন্দ্রমোহিনীর দেহান্তর ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার শেষ রচনা—"হেমচন্দ্র অস্তাচলে" ১৩৩১ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।*

গ্রন্থপঞ্জী

গিরীন্দ্রমোহিনীর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি:—

১। **জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী।** (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২)। পৃ. ১৭।

* গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যুর পরে তাঁহার রচিত অনেক কবিতা ১৩৩৩ সালের 'বার্ষিক বসুমতী' ও ১৩৩৩-৩৪ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' এবং 'সচিত্র শিশিরে' (১৩৩১-৩৩) প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তিকাখানিতে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। ইহাতে গদ্যে-পদ্যে লেখা পাঁচখানি পত্র আছে; তন্মধ্যে প্রথম চারিখানি স্বামীকে লিখিত।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে গদ্যে-পদ্যে লেখা গিরীন্দ্র-মোহিনীর একখানি পত্র ১৩৩২ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রখানি 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' পুস্তকের ৫ম বা শেষ পত্র হওয়া বিচিত্র নহে।

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গিরিন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী'তে 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' স্থান পায় নাই। এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকার এক খণ্ড বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে আছে।

২। **কবিতাহার** (কাব্য)। ২৯ মাঘ, ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)।
পৃ. ৩৯।

পুস্তিকায় রচয়িত্রী নাম প্রকাশ করেন নাই; "জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত" বলিয়া ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। 'কবিতাহার' গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম প্রকাশিত কাব্য; তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ তিনি "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন :—

> পাঠক মহোদয়গণ! অদ্যাপি আমাদিগের ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গকামিনী আমরা কেহই বিদ্যাতে এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই যে সামান্য রচনা করিয়া আপনাদের সমীপবর্ত্তিনী হই। এই আশা করা কেবল ভ্রম মাত্র। তবে অজ্ঞতানিবন্ধন কতিপয় পদ্য পংক্তি প্রচারের কারণ এই যে ইতিপূর্ব্বে মদীয় স্বামীকে লিখিত পত্রাবলী তাঁহার কোন প্রিয় বন্ধু দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দু মহিলার পত্রাবলী নামে প্রচার করেন তদ্দৃষ্টে অনেকেই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অন্যান্য বিষয় রচনা করিতে কহেন। আমি কেবলমাত্র তাঁহাদের

আগ্রহাতিশয়ে সামান্য কতিপয় পদ্য রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে সাহসী হইতেছি।...

'কবিতাহার' ৫টি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি ঊষা-বর্ণন,* বঙ্গ-মহিলাগণের হীনাবস্থা, শরৎবর্ণন, সঙ্গিনীর বৈধব্য, লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) 'কবিতাহারে'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—"শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও, প্রশংসনীয় হইত। প্রৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষের লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।"

৩। **ভারত-কুসুম** (কাব্য)। ১ কার্ত্তিক ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। পৃ. ৮৮।

ইহাও "জনৈক হিন্দুমহিলা-প্রণীত" বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। পুস্তকখানির "মুখবন্ধ" লিখিয়াছেন—"সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী"-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ রায়। তিনিই ইহা সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়াছেন। 'ভারত-কুসুমে' ২৯টি কবিতা আছে।

৪। **অশ্রুকণা** (কাব্য)। ১২৯৪ সাল (ইং ১৮৮৭)।

১২৯৪ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'নব্যভারতে' সমালোচিত। ইহাই রচয়িত্রীর স্বনামে প্রচারিত প্রথম পুস্তক ; পূর্ব্বেকার পুস্তকগুলিতে তিনি "জনৈক হিন্দুমহিলা" নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

'অশ্রুকণা'র 'ভূমিকা'য় প্রকাশ :—"এক্ষণকার ও পূর্ব্বে লিখিত

* আমি যে 'কবিতাহার'খানি দেখিয়াছি, তাহাতে এই কবিতার ৪১ সংখ্যক কবিতা স্তবকের প্রথম পংক্তিটি রচয়িত্রী স্বহস্তে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন :—"শুইয়া শয্যায় কোথাও বা দেখ"।

কতকগুলি কবিতা একত্রিত করিয়া 'অশ্রুকণা' প্রকাশিত হইল। অধিকাংশ কবিতা শোকসম্বন্ধীয় বলিয়া পুস্তকের নাম 'অশ্রুকণা' রহিল। সংসার-সুখের অভিলাষীর শোকাশ্রু কি কাহারও ভাল লাগিবে? ...... এই পুস্তকের সম্পাদন-ভার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল লইয়াছেন। তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কবিতাগুলি নির্ব্বাচন ও স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।"

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১২৯৮ সাল) কয়েকটি নূতন কবিতা, এবং পরিশিষ্টে কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "অশ্রুকণার প্রকৃত সমালোচনা" হিসাবে অক্ষয়চন্দ্রের কবিতাটি ১২৯৪ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। রচয়িত্রীর জীবদ্দশায় 'অশ্রুকণা'র চারিটি সংস্করণ হইয়াছিল; চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশকাল—১৩১১ সাল।

৫। **আভাষ** (কাব্য)। ১২৯৭ সাল (৫ এপ্রিল ১৮৯০)। পৃ. ১৪১।

ইহাতে ১৫১টি কবিতা আছে। রচয়িত্রী "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন: "আভাষের কতকগুলি কবিতা আমার পূর্ব্বাবস্থার লিখিত;...আভাষের মধ্যে কয়েকটি কবিতা পূর্ব্বে অশ্রুকণায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সমালোচক দিগের মতে সেগুলি অশ্রুকণায় স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া তাহা আভাষের মধ্যে রাখিয়াছি। অশ্রুকণার দ্বিতীয় সংস্করণে তদুপযোগী কয়েকটী নূতন কবিতা সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।"

৬। **সন্ন্যাসিনী** বা মীরাবাই (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য)। ১ কার্ত্তিক ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ১০৩।

'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রাজস্থানের পুরাবৃত্ত অবলম্বনে লিখিত এই নাট্যকাব্যখানি প্রকাশ করেন।

৭। **শিখা** (কাব্য)। ১৩০৩ সাল (২৮ এপ্রিল ১৮৯৬)।
পৃ. ১৫৮।

ইহাও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রকাশ করেন। ইহাতে ৭৬টি কবিতা ও গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বহস্ত অঙ্কিত একখানি চিত্র আছে।

৮। **অর্ঘ্য** (কাব্য)। ১৩০৯ সাল (১০ সেপ্টেম্বর ১৯০২)।
পৃ. ৮২।

ইহাতে ৪৫টি কবিতা আছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই পুস্তক-খানিরও প্রকাশক।

৯। **স্বদেশিনী** (কাব্য)। ১৩১২ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬)।
পৃ. ২৭।

১৮টি কবিতার সমষ্টি। ভারতের স্বদেশ-ভক্ত নর-নারীর উদ্দেশে পুস্তিকাখানি উৎসর্গীকৃত।

১০। **সিন্ধু-গাথা** (কাব্য)। ১৩১৪ সাল (৬ মে ১৯০৭)।
পৃ. ৮২।

ইহাতে ৩৮টি কবিতা এবং "আমাদের কুটীর" নামে গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বহস্ত-অঙ্কিত একখানি চিত্র আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী। মহাপঞ্চমী ১৩৩৪। (ইং ১৯২৭)।
পৃ. ৬৯৮ (বসুমতী)।

সূচী:—আভাষ, অর্ঘ্য, অশ্রুকণা, শিখা, সিন্ধু-গাথা, স্বদেশিনী, কবিতাহার, ভারত-কুসুম, অলক, প্রবন্ধ-প্রতিভা, সন্ন্যাসিনী।

'অলক' বা 'প্রবন্ধ-প্রতিভা' কখনও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। এই নামে গ্রন্থাবলীতে গিরীন্দ্রমোহিনীর যে সকল গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পাইয়াছে, সেগুলি 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'নারায়ণ' প্রভৃতি সাময়িক-পত্র হইতে গৃহীত।

'জাহ্নবী'-পরিচালন

১৩১১ সালের আষাঢ় মাসে 'জাহ্নবী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। প্রথম বর্ষের পত্রিকা ১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ হইলেও, দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা আরম্ভ হয় ১৩১৩ সালের বৈশাখ হইতে। ১৩১৪ সালে, অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষ হইতে, 'জাহ্নবী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী; নলিনীরঞ্জন সহকারী সম্পাদক-রূপে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা প্রথম সংখ্যায় যাহা লেখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যাঁহাদের স্নেহানুরোধ অতিক্রম করা আমার অসাধ্য, তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে নানা কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূত জাহ্নবী-বক্ষে এত দিনে আমাকে এইরূপ আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। জানি না, পূততোয়া জাহ্নবী নব-বর্ষে এ অধমকে কি আশায় গ্রহণ করিতেছেন।

অয়ি নির্ম্মলে, এ দাসী তোমারই মত সাগরসঙ্গমলুব্ধা হইলেও তোমার ওই অপ্রতিহত গতি—ওই কূলপ্লাবিনী উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গলীলা আমাতে কোথায়? হে দ্রুতগে, তবে আমি তোমার সহিত কেমন করিয়া ছুটিব? অনন্ত কাল যে পথে ছুটিতেছে, রবি শশী তারা যে পথে ছুটিতেছে, গ্রহ, উপগ্রহ যে পথে ছুটিতেছে, সেই নির্দ্দিষ্ট কি অনির্দ্দিষ্ট পথে ক্ষুদ্র আমিও ছুটিতে চাই। গঙ্গে, তোমার বক্ষে কত শত আশা-ভরা তরণী নিত্য ভাসিয়া যাইতেছে; কেহ জ্ঞানের, কেহ মানের, কেহ ধনের, কেহ ধর্ম্মের, কেহ বা কেবল অধর্ম্মের বাণিজ্য লইয়া উন্মত্ত।

হায়! কোথায় তিনি, যিনি কেবল প্রেমের বাণিজ্যে তরী ভাসাইয়াছিলেন। সেই—"পহিলহি মাঘ গৌরবর নাগর"—দুঃখসাগরে

সকলকে নিক্ষেপ করিয়া যামিনী শেষে ত্রিযাম রজনীতে শয্যা ত্যাগ করিয়া যিনি জগতে প্রেমের বাণিজ্যে তোমার বক্ষে তরণী ভাসাইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন—

"নদীয়া করিয়া আন্ধিয়ারী"।

হায় মা! তেমন রত্ন আর কি পাওয়া যায় না? সেই পতিতে অঘৃণা, নিষ্ঠুরে করুণা, প্রেমে উন্মাদ, ভাবের সাগর, অনিন্দ্য সুন্দর, মূর্ত্তিমান্ মোহন মন্ত্রস্বরূপ ধর্ম্মবীর তোমার বিশাল তটভূমিতে এখন কি একেবারেই দুষ্প্রাপ্য?

পুণ্যসলিলে, দেখিস্ মা, শুভ পুণ্যাহ বৈশাখে—নববর্ষে তোমার বক্ষে আশা-ভরা তরীখানি লইয়া চলিলাম; যেন নিরাশ করিস না মা!

জাহ্নবীর উদ্দেশ্য কি বলিতে হইলে, মোটামুটি সাহিত্যালোচনাই বলিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনে এই নব চক্ষুরুন্মীলিত সুপ্রভাতে সমাজের শিক্ষা দীক্ষা যে নূতন পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর, তাহা নূতন করিয়া না বলিলেও চলে। এই গড়িয়া তুলিবার দিনে যে একপ্রাণতা, বন্ধন-দৃঢ়তার আবশ্যক, জাহ্নবী তাহারই প্রার্থিনী। মুখ্যতঃ নিস্পিষ্ট সমাজের আচার ব্যবহারের সংশোধন ও ধর্ম্মালোচনাই জাহ্নবীর জীবন-ব্রত।

এখন বাংলা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সময়ে সময়ে হৃদয়ে সত্যই নির্ম্মল আনন্দের উদয় হয়। আজ সাহস করিয়া কে বলিতে পারে, আমাদের মাতৃভাষা—বঙ্গভাষা দীনা? মাসিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক প্রভৃতি যোগ্যতম হস্তে পরিচালিত হইয়া জাতীয় জীবন ও জাতীয় ভাবের উন্নতি সাধন করিতেছে। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্যতম জাহ্নবীর যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে বা হয়, তবে তাহা জাহ্নবীর পূর্ব্বসম্পাদকের দ্বারাই হইয়াছে ও হইবে; আমি উপলক্ষ মাত্র।"

গিরীন্দ্রমোহিনী তিন বৎসর (১৩১৪-১৬) 'জাহ্নবী' সম্পাদন করিয়াছিলেন; তাহার পর আর উহা প্রকাশিত হয় নাই। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। বর্ত্তমান লেখকের সর্ব্বপ্রথম রচনা—"স্বপ্ন-প্রসঙ্গ" এই 'জাহ্নবী'র পৃষ্ঠাতেই (আষাঢ় ১৩১৬) মুদ্রিত হইয়াছিল।

গিরীন্দ্রমোহিনী ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় ও মানকুমারী বসুর অভ্যুদয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। পুরুষ-প্রধান সাহিত্যে ইঁহারা ভাষার এবং ভঙ্গির বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলা ভাষায় নারী হৃদয়ের গোপন বার্ত্তা প্রচার করিয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার ইঁহারাই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই চারি জনের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনীর স্থান আরও বিশিষ্ট; স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত খ্যাত পরিবারের কন্যা, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রচলিত ধারার সহিত উভয়েই কিছু কিছু পরিচিত ছিলেন। কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী নারী-মনের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার আবেগের কেন্দ্র প্রধানতঃ তাঁহার স্বামী। তাঁহার পরিবেশ মূলতঃ গৃহ-সংসার-পরিবেশ। সেই কারণেই তিনি যখন নিতান্ত কিশোর বয়সে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন—তখনই সাহিত্য-রসিক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বহু মহিলা-কবি-অধ্যুষিত বর্ত্তমান বাংলা দেশে সেদিনের সেই বিস্ময়-আলোড়নের পরিমাপ আমরা করিতে পারিব না। স্বামি-বিয়োগের পরে রচিত তাঁহার 'অশ্রুকণা' বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। স্বাভাবিকতার দিক্ দিয়া মানকুমারী বসুও গিরীন্দ্রমোহিনীর সমগোত্রজা। এই গুণেই গিরীন্দ্রমোহিনীর

কাব্য-কবিতা এখনও যাদুঘরের সামগ্রী হইয়া যায় নাই। আধুনিক পাঠক এগুলির মধ্যে সজীবতার পরিচয় পাইবেন। আমরা গিরীন্দ্র-মোহিনীর বিবিধ কাব্য হইতে কিছু নমুনা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

অশ্রুকণা

উপহার

যা ছিল আমার, দেছি'; মোর যা,—তোমারি সব!
সবি পুরাতন, সখা, আছে অশ্রু-কণা নব!

এ নয় সে অশ্রু-রেখা, মানান্তে নয়ন-কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না দেখা হ'লে ফুলবনে।

সে অশ্রু এ নয়, সখা, দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা হাসির কমল-থরে।

এ শোকাশ্রু! নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।
এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন!

কোথা আছ নাহি জানি, জানি না হৃদয় তব।
যা ছিল সকলি দেছি, লও এ শোকাশ্রু নব।

স্বপ্ন

কে তুমি করুণাময়ি, রজনী গভীর হ'লে,
নীরবেতে একাকিনী নেমে এস ধরাতলে?

দেখিয়া দুখীর দুখ সজল কমল-আঁখি,
স্নেহের আঁচলে অশ্রু মুছে দাও বুকে রাখি !
মহান্ জগৎ এই,—উদার প্রকৃতি-রাণী
দেখাইতে পারে না ক কিছুতে যে কাব্যখানি,
অতীতের রুদ্ধ-দ্বার ভাঙি কি কুহক-বলে,
গত-সুখ-রঙগুলি
ধীরে ধীরে ল'য়ে তুলি
টেনে যাও সেই রেখা—আঁধার হৃদয়-তলে !

ধ্রুব

জীবনের বিভাবরী দীর্ঘ-শ্বাসে শেষ করি
চেয়ে আছি হায় সেই প্রভাত-আশায় ;
আশা-তৃণগাছি ধরি, বিরহ-পাথার তরি
যেই উপকূল স্মরি ;—পাইব কি তায় ?
কোথায় পাইব ধ্রুব হায় !
এ দীর্ঘ জীবন-পথে একেলা কি হবে যেতে ?—
পথে কি হবে না দেখা, সঙ্গে কভু তার !
কে ব'লে দেবে গো মোরে, পাব কত দিন পরে ?
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার !
অনন্ত নেপথ্য-মাঝে, সে যেন কোথায় আছে !
মাঝে মাঝে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয় !
আকুল পরাণ, হায়, ঘরে না রহিতে চায় !
সদা যাই-যাই গায়, উদাস হিয়ায় ।
চাহিয়া চাহিয়া পথে, এমন বিষণ্ণ চিতে,
দারুণ চাতক-ব্রতে কত রব, হায় !

মধুরে বাজিছে বাঁশী হাসিছে কুসুম রাশি,
বিশদ জোছনা-নিশি, সবি শূন্য তায়!
রয়েছে কুসুম ঢালা গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ-জ্বালা,—শুকাইয়া যায়!
আশার শিশির-বারি সতত সিঞ্চন করি
বাঁচায়ে যে রাখিতেছি,—হবে কি বৃথায়?
সে কি মোর ফুল-হার দেবে না গলায়!
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!
কোথা আছ,—কোথা তুমি,—কত দূরে হায়!
জীবনের বিভাবরী ফুরাইয়া যায়!
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!

ভিক্ষা-গীতি

লইয়া আনন্দ-উষা, দেছ দুখ-বিভাবরী;
জানি না—জানি না, নাথ, কি হেতু এ মনে করি!
শুভ বা অশুভ হ'ক্,
সবে তব ছায়া র'ক্।
সতত তোমারে যেন হৃদয়-গগনে হেরি।
ও মুখ চাহিয়া তব,
যা দিবে সকলি সব—
ঝটিকা, করকাপাত, তোমারি চরণ ধরি।
তুমি যদি চাও, বিধি!
ভাঙিতে এ নারী-হৃদি,
ভাঙুক সে শতবার, যাতনায় নাহি ডরি!

না জানি কি সুধামাখা ওই তব পাদুখানি ;
যত দুখ পাই ভবে, তত করি টানাটানি।

লও, লও প্রণিপাত
এই ভিক্ষা দাও নাথ,—
যা দেবে আমারে দিও, দুখ বা যাতনা ভার !
ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।
বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হ'তে চ'লে গেছে,
স্নেহেতে ডাকিয়া তারে, লও নাথ, লও কাছে !
সেই ক্ষীণ দেহখানি, শীতল শান্তির ছায়,
বিরাম-শয়নে যেন আরামে ঘুমাতে পায় !
এ দুখ-আতপ-জ্বালা,
এ খেদ কণ্টক মালা
এ অশান্তি-নিত্য ছলা, এ অশ্রু, এ হাহাকার,
পশে না শ্রবণে যেন পরশে না হৃদি তার !

তুমি

তুমি কি গিয়াছ চ'লে ? না না, তা ত নয়।
য'দিন বাঁচিব আমি, ত'দিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো শুধু তোমা-ময়।
তুমি ছাড়া আমি কে বা—শূন্য—শূন্যময়।
তুমি কি গিয়াছ চ'লে তা ত নয়, নয় !
স্মৃতির মন্দিরে মম, প্রতিষ্ঠিত দেব সম
চির-বিরাজিত তুমি, অমর প্রাণেশ !
চির-জন্ম-স্মৃতি তুমি, সৌন্দর্য্য অশেষ !

মথুরা-ধামে

যা লো, যা লো, সখি, যা লো
বারেক মথুরা-ধামে!
লুকায়ে শুনিবি সেথা,
বাঁশী বাজে কার নামে!

এমনি যমুনা-জল,
কূলে কূলে ঢল ঢল,
বহিয়া কি যায় সেথা
নিধু-কুঞ্জ-বন পাছে?

সেথা কি কদম-মূলে
শিখিনী নাচিয়া বুলে?
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম-নামে মরে বাঁচে!

পরে কি না পীত-ধড়া,
খুলে কি ফেলেছে চূড়া?
গলে বন-ফুল-মালা
আছে কি শুকায়ে গেছে!

মান-ভঞ্জন

এক পাশেতে একাকিনী আপন-মনে ব'সে আছি,
ছোট ছোট মেয়েগুলি এগিয়ে এল কাছাকাছি।
আধ-আধ, বাধ কথায়, ছাই-পাঁশ-ছাই বকে কত!
সাধটা মনে, তাদের সনে, হব মিষ্টালাপে রত!

আজ্‌কে আমি মান করেছি, রইলুম হয়ে মৌনব্রত,
ভাবছি মনে দেখব এরা রকম-সকম জানে কত !
বারেক দুবার চেয়ে চেয়ে, ভাবটা বুঝি বুঝ্‌লে তারা,
হাসি-খুসি মুখখানা আজ কেমন-তর আঁধারপারা !
ভেবে চিন্তে অবশেষে, মনে করে আঁচাআঁচি,
ছোট ছোট হাতে ঘিরে, জুড়ে দিলে নাচানাচি !
এমন শক্ত জাল বুনেছে,—সাধ্য নাই যে খুলে বাঁচি।
মাঝখানেতে গাঁথা পড়ে, অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি !
কিন্তু তবু তেমনি ধারা, মুখখানা আজ বড়ই বাঁকা,
ছোট ছোট বুকের মাঝে ঠেক্‌ছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা !
গুড়ি-গুড়ি বুড়ো হয়ে সম্মুখেতে কেউ বা এল,
সজল চোখে শুক্‌নো মুখে কেউ বা কোলে ব'সে র'ল !
কচি আঙুল মুখে পুরে দিলেন একটি শেয়ানা মেয়ে,
ভাবটা যে তাঁর—না বুঝি নয়, আন্‌বেন হাসি আঁকৃষি দিয়ে !
মুখের উপর মুখটি দিয়ে আদরে কেউ জড়ায় গলা,—
মরি হেসে, জান্‌লে কিসে, সাধাসাধির পুরো পালা !

বিরহিণী

মরিতেও সাধ নাই, জীবনেও নাই সুখ,
কি জানি, কি ক'রে গেছে, বঁধুর মধুর মুখ !
পরাণে অনল জ্বলে, নিবাইতে নাহি চায়,
জ্বলিতেছে দিবানিশি, আরো দহে সাধ যায় !
মিলন মধুর ছিল, বিরহও মধু তার !
নহে, কোন্ সাধে এবে বহে জীবনের ভার ?

শ্মশান

নিভিয়াছে চিতানল ?—নেভে নি, নেভে নি !
যে শিখা জাহ্নবী-তীরে,
জ্বলিয়াছে ধীরে ধীরে,
দেখহ প্রতাপ তার হৃদয়েতে মোর ;—
পাইয়া ইন্ধন চির জ্বলিছে কি ঘোর !
এই চির-প্রজ্বলিতা
সুখের প্রদীপ্ত চিতা
জ্বলুক অনন্তকাল—না চাহি নির্ব্বাণ।
শুধু সহিবার বল,
আর চাহি অশ্রুজল,
রাখিতে জাগায়ে চির প্রেমের শ্মশান !

পথে কে চলেছে গাই'

অশ্রু-জলে ভরা আঁখি, তারে না দেখিতে পাই,
নীরব-নিশীথ-পথে কে দূরে যেতেছে গাই' ?
কত দিন—কত দিন—কত দিন পরে আজ,
হেরিতে মানব-মুখ হৃদয়ে হতেছে সাধ !
দাঁড়াও দাঁড়াও পান্থ, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও,
কি গান গাহিতেছিলে বারেক আবার গাও।
প্রতি নিশি শুনি গান, পথে চলে কত লোক,
গেয়ে যায় ক্ষুদ্র ব্যথা, ক্ষুদ্র সুখ, দুখ, শোক।
সমীরণে ভেসে আসে, সমীরণে ভেসে যায়,
কথাতেই অবসান, কথায় জনম কায়।

জানি না, জানি না কেন আজিকে তোমার গানে,
অতীতের স্মৃতিগুলি স্বপ্ন-সম আসে প্রাণে!
যতনার উৎস ছুটে,
আগ্নেয়-ভূধর ফেটে,
নীরবে দহিতেছিল প্রাণের গভীর-তল;
ও তব আকুল তান
আকুল করিছে প্রাণ,
গাও, গাও, গাও পান্থ, নয়নে আসিছে জল।—
আশায় উছসি ওঠে আকুল মরম-তল!
মধুর জোছনা-নিশি, ও তব মধুর গান,
অশরীরী সুখ-ছায়া প্রাণে করে নিরমাণ!
যে ফুল ফুটিবে দূর—কালের নন্দন-বনে,
কুঁড়িগুলি যেন তার কল্পনায় আসে মনে।

হেমা

সসীম ধরণী হ'তে বটে সে গিয়েছে চ'লে—
হেথা আর নাই!
অনন্ত রাজত্বে তব, কোথা পুন পেলে স্থান
জানিবারে চাই।
ক্ষুদ্র রেণুকণা হ'তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি—
কারো নাহি নাশ;
দুরবল হিয়া তবু চোখের আড়ালে নাথ,
আনে অবিশ্বাস!
তোমার মঙ্গল হস্ত, রেখেছে মঙ্গলে তারে—
তবু মরি শোকে;

সরল হৃদয়খানি, সুমিষ্ট হাসিটি তার—
জল আনে চোখে!
কোথা সে নবীন দেশে আবার নবীন-বেশে,
পেলে নব স্থান;
যদি কিছু জানা যায়, তবে বুঝি শান্তি পায়—
অবোধ পরাণ!
কত কথা মনে হয়, কতই যে পায় লয়,
সুধাব কাহারে;—
মৃত্যু দেয় নব বেশ?— তবে ত সকলি শেষ!
—কে চিনিবে কারে?
তাই যবে কাছাকাছি, ক্ষীণ-হস্ত দিয়ে আছি
সবলে ধরিয়া;—
তাই মরণের মাঝে দেখে সদা বিভীষিকা
দুরবল হিয়া!
জীবন-মৃত্যুর মাঝে কত সংশয়ের স্তূপ—
ছোট বড় বিরাট্ আকার;
যত লঙ্ঘিবারে চাই, তত ফেরে পড়ে যাই,
দুর্গম কান্তার!
দেখাও মৃত্যুর মাঝে প্রশান্ত মুরতি তব,
হে শিব-সুন্দর!
কোথা সে বিজ্ঞান-শিখা— দূর কর বিভীষিকা
শিক্ষক-প্রবর!
দেখাও মৃত্যুর মাঝে, প্রশান্ত মুরতি তব
হে শিব-সুন্দর!
মরণ হইয়া যাক জীবনের অন্তরঙ্গ
প্রিয় সহচর!

আভাষ

নির্ম্মমতা

বৈরাগ্যের নামে, কভু নির্ম্মমতা, এসো না নিকটে মোর।
ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিব, ছিঁড়িব মমতা-ডোর?
তোমার ক্ষমতা সব আছে জানা, গোটাকত শুষ্ক-কথা।
উলটী পালটী, তাহাই লইয়া ঘুরাইয়া দাও মাথা।
দিন রাত বুঝি শুকাব পরাণ, কেন বা কিসের তরে?
তোমার সান্ত্বনা, তোমার মন্ত্রণা, ল'য়ে তুমি থাক দূরে।
প্রেমের জগতে, তুমি হে বিরাগ, বৃথা ভ্রম মিছামিছি।
ফুল, পাতা, পাখী, প্রাণে মেশামিশি, সবে লয়ে সুখে আছি।
ধরা ভরা যশ, আছে, জানি তব, জগতেতে বহু মান।
অতি-ক্ষুদ্র নারী ক্ষুদ্র হৃদি তারি, হেথা কোথা তব স্থান।
কচি মুখে হাসি, বাসি সুধারাশি, ফাঁসী হয় হোক্ তাই।
হয়ে জ্ঞানবান্, মরুময় প্রাণ, কাজ নাই কাজ নাই!

পথিক

আঁকা বাঁকা গিরি-পথ উঁচু-নীচু অসমান,
চলেছে পথিক দুটি, গাহিয়া স্বপন-গান!
সপ্তমে উঠিছে সুর শিহরি পাষাণ কায়,
চকিত আকুল আঁখি উভে চারিদিকে চায়!
ধীরে ধীরে কেঁদে ধীরে শূন্যেতে মিলিছে তান।
আঁকা বাঁকা গিরিপথ, মাঝে শিলা ব্যবধান।
সম্মুখে ধুসর সন্ধ্যা, পিছনে জোছনা ভায়,—
আকুল ব্যাকুল হৃদি উভয়ে উভয়ে চায়।

ব'সে ব'সে

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!
আঁধার রজনী ঘোরা,
আকাশ চন্দ্রমা-হারা,
শিরোপরে মিটি মিটি
জ্বলিতেছে তারাগুলি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!

চারি দিক পানে চাই,
কূল না দেখিতে পাই,
ধীরি ধীরি মৃদু বেয়ে
আসিছে তরণীখানি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!

মধুর সঙ্গীত ভায়,
তরী বুঝি বয়ে যায়,
কে তুমি তরীর মাঝে
দেখি দেখি মুখখানি?
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!

এ কি—আঁধার এ উপকূলে
কেন গো নামিয়া এলে,
কিনিতে কি সুখ মূলে
দুঃখের বাণিজ্য বিনী?
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি

জানি না

জানি না ঘুচিবে মোর, কবে এ দীনতা ঘোর,
চেয়ে থাকা মানবের মুখে !
মিলন, বিচ্ছেদ, গান, কবে হবে অবসান—
মগ্ন হব শান্তিময় সুখে ।
স্থিরা ভোগবতী সম, হৃদয়-অর্ণব মম
কবে হবে তরঙ্গ-বিহীন—
নিবৃত্তির স্নিগ্ধ কোলে, র'ব সুখে অঙ্গ ঢেলে,
স্বপ্নহীন নিদ্রাতে বিলীন ।

সংসার

ফের, ফের, কোথা যাও, কার বাঁশীরবে ধাও,—
স্বর-মুগ্ধ কুরঙ্গিনী সমা ।
ঘোর ও গহন মাঝে, ব্যাধের মুরলী বাজে,
ডাকিছে মোহের চির-অমা ।
গায়ে গায়ে আত্মজন, শাখা বাহু প্রসারণ
করিয়া, ঢেকেছে ভানু-ভাতি ।
দিবস তমসে হারা, ভ্রান্ত পান্থ পথহারা !
কোথা নাথ সিত শশিরাতি ?

শিখা

বর্ষাসঙ্গীত

কেন ঘন ঘোর মেঘে
এমন পরাণ মাতে ?
কি লেখা লিখেছে কে গো
সজল জলদ পাতে !

শত বিরহীর হিয়া,
ওর মাঝে মিশাইয়া,
আপন গোপন ব্যথা
লুকায়ে দিয়েছে তাতে।—
বিন্দু বিন্দু ঝর ঝর,
ও কি তার অশ্রুধর ?
তড়িৎ চমক ও কি—
বাসনার বহ্নি ভাতে ?
আর্দ্র এ শীতল বায়,
কেবা জাগে কে ঘুমায়,
মধুর স্বপন কারো,
নিমীলিত আঁখিপাতে !
কি লেখা লিখেছে সে গো
সজল জলদ পাতে।
কি লেখা লিখেছে সে গো ;
ফুটে না উঠিছে ফুটি।
উদাসে হৃদয় শুধু ;
নীরে ভরে আঁখি দুটি।-

যেন, জগৎ জড়িত করে
নিবিড় বাহুর পাশে ;
শুধু, একাকী আকুল হিয়া
বিরহ-অকূলে ভাসে !

যমুনা-জাহ্নবী

১

যমুনা।—

কত আকুলতা, সই, মিশিবারে প্রাণে প্রাণে,
মিশেও মেশে না কায়া কোন্ সূক্ষ্ম ব্যবধানে ?
পাশাপাশি মেশামিশি দুইটি বিভিন্ন ধারা,
কত দিনে কোন্‌খানে হইবে আপনা-হারা ?
দুটি হিয়া মেশামেশি একই স্রোতের টানে,
মিশেও মেশে না কায়া, কোন্ সূক্ষ্ম ব্যবধানে ?
উভে চাহি উভ পানে সারাটি জীবন সারা,
কত দিনে কোন্‌খানে হবে দিদি একাকারা ?

২

জাহ্নবী।—

ফেনিল তরঙ্গ মোর উথলি উথলি চলে,
প্রশান্ত তোমার স্রোতে সুনীল আলোক জ্বলে ;
অসংখ্য তরঙ্গ-ভরা দুইটি পরাণ-স্রোত,
ঝক্ মক্ রবি-করে পুলকিত ওতপ্রোত ;
এমন সুখের গতি পাশাপাশি হাসাহাসি !
তবুও তবুও কোন্ আকুল বিলাপরাশি ?
প্রাণে প্রাণে প্রেম-স্রোত ব্যাকুল মিলাতে কায়া,
এমনি সে স্থূল বটে মরতে মানবী মায়া।
বহে' যাই এক স্রোতে উভয়ে একই টানে,
মিশাব সাগরে কায়া অনন্তের মাঝখানে।

৩

যমুনা।—

তোমার কথায় সখি আমি কি ভুলিতে পারি,
শিরে যে ধরিল তোরে, তুমি না হইলে তারি!
মরতে 'অলকনন্দা' স্বরগেতে 'মন্দাকিনী,'
পাতালেতে 'ভোগবতী,' ত্রিলোকগামিনী তুমি!
সুশুভ্র রজতবারি আপন উচ্ছ্বাসে ভাসে,
তোমায় বাঁধিতে আশা ক্ষীণ এই বাহুপাশে;—
মরমে বিলীন হবে মরমের সাধ সই,
তুমি ধরা দিবে সখি! এত প্রেম হৃদে কই?

৪

জাহ্নবী।—

প্রেমময়ি, যমুনে লো, আপনে বিশ্বাস-হারা!
চির-বাঁধা অই তীরে বিশ্বের প্রেমিক সারা;
আজো তার তনুরাগ, তোমার অঙ্গেতে জ্বলে,
'নীলাঙ্গিনী' হয়েছ লো, যারে ধরি হৃদিতলে।
বিশ্বের পীরিতিধারা সখি লো, করিয়া পান,
আপনা ভুলিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ব'লে অভিমান;—
তাই লো সজনি তোর, যাচিয়া এ আত্মদান!

চোর

কোথা হ'তে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর।

কোলের উপরে ব'সে
হৃদয় লইলি চুষে—
বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি সাহস তোর ;
কোথা হ'তে এলি ছুঁদে রে ক্ষুদে সিঁধেল চোর
কিছু থুতে সাধ নাই,
সকলি তুহার চাই ;
মুখের তাম্বূলটুকু,
সিঁথির সিন্দূরটুকু
গলায় হাঁসুলিহার—বাহুর কনক-ডোর ;—
চাই আকাশের চাঁদ কপালের টিপ তোর।
হায় রে সিঁধেল চোর,
আরো নিতে বাকি তোর !
নয়নের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা,
তৃষার পানীয় নিলি, নিলি স্নেহ-সুধা।—
নিলি যৌবনের চারু
কান্তি মনোহর ;
মরমে কাটিয়া সিঁধ
নিলি সর্ব্বস্তর।—
কোথা হ'তে এলি তুই রে ক্ষুদে তস্কর !
নেই ভয় নেই শ্রান্তি,
অম্লান কুসুমকান্তি,
গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি এ ঘর ও ঘর।—
বঙ্কিম অধরপুটে
দুধে দাঁত দুটি ফুটে ;—
পলকে পলকে ছুটে হাসির লহর !

ভূত ভবিষ্যৎ নিলি,—
নিলি বর্ত্তমান,
হরিলি সমগ্র ধরা
জগতের প্রাণ ;
আপনা হারায়ে শেষে হলি ভাবে ভোর,-
কোথা হ'তে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর!
এই কান্না এই হাসি,
রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি ;—
গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু-ডোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি ক্ষুদে ছুঁদে চোর!

অচেনা

এমনি বরষা দিনে, সেই গাথা পড়ে মনে,
ব'সে এক গৃহ-কোণে—দোঁহে নিরালায়।
কে জানে কেমন ক'রে, মিলেছিল একত্তরে,
আসিয়া সে পান্থ দুটি, দৈবাৎ সেথায়।
অবিরল জলধার, ঘনঘোর অন্ধকার,
রুদ্ধ বাতায়নদ্বার, চমকে বিজলী!
মুদিত বিষণ্ণ মনে, বসিয়া গৃহের কোণে,
কেহ কারে নাহি চেনে, নিরখে কেবলি।
ক্রমে ঝড় বহে বেগে, অশনি গর্জ্জন রেগে,
ত্রাসে গৃহভিত্তি কাঁপে, ক'রে থর থর!—
সমীরে সলিলে খেলা, বজ্রে পড়ে গাছ পালা,
উড়য়ে কুঁড়ের চালা, ভেঙ্গে পড়ে ঘর!

পরাণে পরাণ টানে, দুঁহু চায় দোঁহা পানে ;—
কাছাকাছি নাহি জানে হয়েছে কখন !—
—কখন পরশ লেগে, চেনা প্রেম উঠে জেগে,—
মিলায়েছে মুহূর্ত্তেকে, অচেনা দুজন !
হৃদয়ে চমকে ত্রাস, বদ্ধ দোঁহে দোঁহা পাশ ;
মুখেতে সরে না ভাষ,—অন্তর আকুল !
নয়নে নয়ন চায় কি জানি কি দেখি তায়
অধরে হাসিটি ভায় ভেঙ্গে যায় ভুল !

কি দিব তোমায়

কত দিন মনে মনে, ভাবিয়াছি নিরজনে,
—কি দিব তোমায় ?
খুঁজিনু সকল ঠাঁই, মনোমত নাহি পাই,
—ব্যর্থ সাধ মনেতে মিলায় !
ভাবিয়াছি বরষায়, আষাঢ়ের মেঘছায়,
—ধ'রে দিই সঙ্গীত বাঁধিয়া !
কিন্তু, সে শুধু বিরহতান, উদাস করিবে প্রাণ,
—সুখে দুঃখ দিবে ঘনাইয়া !
ভাবিয়াছি মধুমাসে, মধুর কুসুম-হাসে,
—বিরচিয়া মালা একখানি,
পরাই তোমার শিরে, চির মধু শোভা ঘিরে,
—রাখিবে মধুর মুখখানি।
কিন্তু বিরহের রাতে, দেখা নাই তার সাথে,
—বিরহীরে বসন্ত বিমুখ।

ছিল দিন কিছু আগে, আসিত সে অনুরাগে,
—চুমিতে সোহাগে ফুল্ল মুখ।
তবুও সতত হায় দিতে তোমা প্রাণ চায় ?
—দিব এক গীত উপহার !

শরৎ, বসন্ত-রাতে, নিদাঘ, কি বরষাতে,
—সে তান ধ্বনিবে বার বার,
নিরালা নদীর কূলে, বিজন তরুর মূলে,
—একা যবে রবে আনমনে—
এ মোর গানের স্বর, হ'য়ে যাবে অন্তপুর,
—রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তোমার পরাণে !

শুক্ল পূর্ণিমার রাতে, আপন প্রাসাদ-ছাতে,
—শুয়ে যবে রহিবে একাকী ;—
নারিকেল-পত্রগুলি, বাতাসেতে হেলি দুলি,
—জ্যোৎস্নায় করিবে চিকিমিকি ;—
দূর হ'তে পিক-বধূ প্রাণে বরষিবে মধু,
—থেমে থেমে বার বার ডাকি—
তখনি এ মোর গান, মৃদু কাঁপাইয়া প্রাণ,
জাগাইবে বাসনার আঁখি !

আষাঢ়ে নবীন ঘন, লেপিয়া অঞ্জন ঘন,
—নীল-নেত্রে যখন হানিয়ে—
বিদ্যুৎ কটাক্ষ লেখা, নিকষ কনক রেখা,
—বার বার দিবে চমকিয়ে ;—
গম্ভীর নির্ঘোষ গুরু শুনে হিয়া দুরু দুরু,
—একা ঘরে করিবে যখন,

তখন আমার গান, আহরি বিশ্বের প্রাণ,
—মিলাইবে ঈপ্সিত মিলন!
জীবন-সমুদ্রকূলে,— আধ জানা, আধ ভুলে,
—সপিনু আমার গীতখানি!
নাই থাক্ ছন্দোবন্ধ, হোক্ কণ্ঠস্বর মন্দ,
—তবু মোর প্রাণের রাগিণী!
অতীত, ভবিষ্য আর,— বর্ত্তমানে, গেঁথে হার
—সাধ যায় তোমা পরাইতে ;—
জড়ায়ে বিস্মৃতি মায়া, মাখি এ প্রাণের ছায়া,
—ধরিতে বিশ্বের চারি ভিতে!
যা কিছু দেখিবে যবে, মনে হবে নাহি হবে,
—ভাবিবে কে আছে এর মাঝে?—
ক্ষুদ্র ধূলি মাঝে হেন, প্রাণের সঙ্গীত কেন?
—এতে কি কাহার কিছু আছে?
পড়িতে পড়িতে মনে, ভুলে চাবে যার পানে,
তাহাকেই করিবে আরতি ;—
সেই বুঝি এই তবে, এ স্বর উহারি হবে—
শুনেছিনু কোথায় সম্প্রতি।
ক্রমে সারা ধরাময়, হ'য়ে যাবে পরিচয়,
—আমারি গানের মাঝ দিয়া,—
যবে সব অবশেষ, রবে না অতৃপ্তি লেশ,
—তখন আমারে নিও পিয়া!—
তখন তোমায় বঁধু, পিয়াব হৃদয়-মধু,
চাহিবে না আর কারো পানে।—
চরাচর লুপ্ত হ'য়ে, মোদের নিভৃতে শুয়ে,—
—তুমি আমি পূর্ণাঙ্গ মিলনে!

অর্ঘ্য

মন্ত্রহীনা

কি মন্ত্রে করিবে দীক্ষা হে গুরু আপনি ?
নাস্তিক বলে'ও দেব ক'র না ভ্রূকুটী ;
হেস না দাম্ভিকা বলে' চিরান্ধ রমণী ;
—প্রবেশিতে জ্ঞান-মার্গে শত বাধা ত্রুটি।
রাখ তব বীজমন্ত্র তুলিয়া অন্তরে,
তৃণ-চিহ্ন-হীন কোন বন্ধ্যা ভূমি তরে।
হে দেব ! হেথায় নাহিক স্থান। সর্ব্ব আচ্ছাদিত ;
তৃণ-গুল্ম-লতা-তরু কণ্টকে আবৃত।
আমারে দেছেন দীক্ষা আপনি শর্ব্বাণী।
নানা মন্ত্রে নানা তন্ত্রে সর্ব্ব-পন্থী আমি।
প্রাবৃটে কভু আমি ধ্যানমগ্না, ঘোর ঘনচ্ছায়ে
নিরখি সে শ্যামা, বামা মুক্তকেশী মায়ে।
চক্ মক্ তক্ তক্ দীপ্ত তলবার,
পিছনে এলান কেশ—প্রলয় আঁধার।
গুড় গুড় গুম গুম পদ-শব্দ শুনি
উল্লাসে নাচিয়া উঠে হৃদয়-শিখিনী !
কখন ফাল্গুন-দিনে যমুনার কূলে
হেরি রাধা-শ্যাম-বামে চম্পক-দুকূলে।
রুণি ঝুনি রুণি ঝুনি নূপুর-শিঞ্জিনী,
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে জাগে বংশীধ্বনি।
কভু সুশুভ্র চামর কাশ তুলি' পথে পথে
সারদার আগমন সূচিছে শরতে।

কনক-বরণ-ছটা দিগন্তে বিকাশ,
দশ দিকে বিকীরিত দীপ্ত চন্দ্র-হাস।

দক্ষিণে ইন্দিরার পদতলে পূর্ণ বসুন্ধরা
চম্পক-বরণ-দ্যুতি হরিত-অম্বরা।

বামে রক্ত-শতদল-দামে শ্রীপদ দু'খানি,
শুভ্র-কুবলয়-কান্তি চারু বীণাপাণি!
প্রসর ললাটপটে দীপ্ত জ্ঞান-জ্যোতি,
মোহ-ধ্বান্ত-বিনাশিনী দেবী সরস্বতী।
কবিতা-কমল-গন্ধে পূর্ণ দিক দশ,
লোলুপ মানস-ভৃঙ্গ বাঞ্ছিত পরশ।

কভু হেমন্তে নিরখি আমি বরাভয় দাত্রী
দারিদ্র্যনাশিনী দুর্গা দেবী জগদ্ধাত্রী,
ধৃত মাঙ্গলিক শঙ্খ ;—ধ্বনিত অম্বর
চারি দিকে প্রসারিত কল্যাণ সুকর।

শীতে সুশুভ্র তুষার মাঝে হিমাদ্রিশিখরে
বিমল-রজত-কান্তি হেরি যোগেশ্বরে।
রুক্ষ জটাজূটজাল পড়েছে প্রসারি,
ঝর ঝর প্রবাহিত মন্দাকিনীবারি।
ধুইয়া চরণ-যুগ্ম বহিছে নির্ম্মলা,
ভৈরব পিনাক ঘোষে ভীতা দিক্‌বালা।
নিদাঘেতে তীব্র দীপ্তি পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে
নেহারি মানস নেত্রে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে।
স্তম্ভিত নিস্তব্ধ দিবা কুলায়েতে পাখী ;
প্রকৃতি ধেয়ান-মগ্না, অবিচল শাখী।
পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত অদ্বৈত পূজক

আমি শৈব, আমি শাক্ত, আমি সে বৈষ্ণব ;—
—কি মন্ত্র আমারে দেব ! দেবে অভিনব !

আষাঢ়ে

এই কি আষাঢ় সেই প্রিয়দরশন,
বাতায়নে বসি' যার নয়নে নয়ন
নিক্ষেপিয়া দেখিতাম—কত কি কাহিনী !
অতীতের দ্বার-পাশে বসি বিরহিণী
গণিছে কুসুম ধরি' বিরহের দিন ;—
—প্রভাতের শশিলেখা যেমন মলিন।
অলক আগুলম্বী পড়িয়াছে ঝুলে,
সরাইছে বার বার চম্পক অঙ্গুলে।
প্রথম আষাঢ়দিনে বিরহী উন্মনা
সহিয়া বিচ্ছেদ-ক্লেশ বিহীন চেতনা।
যুক্তকরে সাধুনয়ে জলদের পাশে,
কত ভিক্ষা করে যেতে প্রিয়ার সকাশে।
গুরু গুরু গরজন, দামিনী-চমক,
ঘন আঁধিয়ার নিশি ; ভীষণ ভুজগ
তমস্বিনী অগ্নি-জিহ্বা মেলে বার বার ;
জগত করিছে গ্রাস করাল আঁধার।
পঙ্কিল কানন-বীথি ; শঙ্কিতচরণা,
মুখর মঞ্জীরে রামা করিয়া তাড়না
ফেলে দিয়ে যায় রোষে দ্রুত পাদচারে,
প্রেম কি পিছলে পদ ত্যজে অভিসারে ?

অনাহূতা গুণমুগ্ধা সলজ্জা মধুরা
প্রিয়-দরশন-লুব্ধা বারবধূ বরা,
চারু-প্রাবারক-গাত্রা বিবশা কম্পিতা,
গুরু গরজিতা নিশি মিলন-সূচিতা।

কবির প্রতি কবি-প্রিয়া

হে কবি,

একা এ নির্জ্জন ঘরে, এ বাদল ঝর ঝরে,
না জানি সে কি তোমারে দিতে সাধ যায়!
তোমার অতৃপ্তি ক্ষুধা মিটাতে সে কোন সুধা
আনিয়া আহরি প্রিয়! পিয়াব তোমায়!
ঘন ঘনচ্ছায়ে ঘোর, আকুল অন্তর মোর,
নব রূপে চাহে বঁধু সঁপিতে আপনা;
বিলসে বিদ্যুৎশিখা, ত্যজহ অলস লিখা,
দূর দূর কর কল্পনা!
ওই যে প্রান্তরভূমে আকাশ পড়েছে ঝুমে
মিশেও মেশে নি দুটি তৃষার্ত্ত অধর—
হে আমার প্রিয় পাখী, ওই লাজ বাধা মাখি,
মোরে কি নবীন করি করিব গোচর?—
কিবা, ঘনশ্যাম নীপকুঞ্জে নব শ্যাম তৃণপুঞ্জে
ডুবাইয়া শ্যামল অঞ্চল,
মাজিয়া এ শ্যাম কায় শাঙন দিবার প্রায়
ক'রে দিব তোমারে বিহ্বল!
কিবা, ওই বাতায়নে পশি' এই কৃষ্ণ কেশরাশি
খুলি তরঙ্গিয়া দিব তিমির নির্ঝর,—

তাহা হ'তে লয়ে' মসী, তুমি গো লিখিবে বসি,
বরষা-মঙ্গল-গীতি, ঘন ঘনতর !
নীরদ সোপানাবলী, অতিক্রমি' যাবে চলি,
অভিমানে গরবিনী সপত্নী কল্পনা !
আমি মোর রাজ্য মাঝে প্রবেশি নবীন সাজে,
রচিব নবীন উৎস নবীন জল্পনা !—
নিঃশেষে করিয়া পান ধরিবে নবীন গান
গুরু গুরু গম্ভীর মেদুর ;
চকিত জগৎবাসী চমকি চাহিবে আসি,
বিসারি অলস হাসি, বিলাস-বধুর !
রহি অন্ত অন্তরাল, দিব সঁপি রুদ্রতাল,
বাজিবে গো মৃদঙ্গ গভীর ;
হ'য়ে সে আরাবাক্রান্ত, টুটে যাবে বাহু-বন্ধ
দূরিবে অধর-দ্বন্দ্ব লাজে দম্পতীর !

চিত্রাঙ্কণে

... ...

অয়ি তন্বী শুচিস্মিতা, হে সুন্দরী অনিন্দিতা,
অয়ি মম আলেখ্য-লিখিতা !
অঙ্গে অঙ্গে স্নেহ-আঁখি, বর্ণ সাথে গেছে মাখি,
অয়ি মম স্বহস্ত-গঠিতা !
ঘসি মাজি সারাদিন, সদা শ্রান্তি ক্লান্তিহীন,
ঘুরে ফিরে দেখি বার বার।
কেমনে বুঝাব কায়, কি মমতা তারে হায়,
মানসী দুহিতা সে আমার !

জননি ! তোমারে স্মরি, ঝরে আজি অশ্রুবারি,
মুছে যায় আলেখ্য আমার ;
হ'লেও কুরূপা কালো, মায়ের নিকটে ভাল,
মা বিনে বুঝিবে কেবা আর !
এই যে সুন্দরী ধরা, সুনীল সাগরাম্বরা,
নবগ্রহ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ;
নরমুখ, বন্ধুজীব, শিখী, শশী, সরীসৃপ,
স্রষ্টা-চক্ষে সমান সকলি !

ধূলা

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কাণে কাণে !
সমীর-বাহিনী তন্বী, কে না তোমা জানে ?—
উড়ে উড়ে কর সদা কাহার উদ্দেশ !
কোথায় এ হেন স্থান নাহি যথা গতি ?
প্রকাশ্য নিবাস পথে ; যাও পায় পায়—
ঘৃণাভরে ফেলে ঝেড়ে কেবা না তোমায় !
নিরভিমানিনী অয়ি, তবু কর স্থিতি
লুকায়ে গৃহের কোণে ; অযত্ন-লালিতা !
দরিদ্র বালিকা মত ধনীর ভবনে ;
দীনেরো কুটীরে তুমি নহ সম্মানিতা !
লো মলিনা ! ওই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্য্যরাশি, বিশ্বানুলেপনা,
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ ! চিনেও চিনি না !

জগত-জননী-রূপা! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত শিশু ;—মহানন্দমনে
মাথে কায় নিয়ে তুলে অঞ্জলি অঞ্জলি ;—
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধূলি!
সর্ব্বাঙ্গে বুলায়ে কর দাও সাজাইয়া ;
নেহারি সন্ন্যাসী-নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া!
বাল্যসখী, চিনি তব মধুর মূরতি,—
করিয়াছি একদিন সাদরে আরতি!
আদ্যন্ত-রূপিণী তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব গর্ব্ব-লেশ!

সিন্ধু-গাথা

জলধি

এ ঘোর আবেগরাশি অর্পিয়া তোমার বুকে
নিশ্চিন্ত আছেন যিনি গভীর সুষুপ্তি-সুখে,—
তারে কি জাগাতে তবে এ গুরু-গর্জ্জন-গান?
চিরদিন চিররাত্রি নাহি তিল অবসান!
উদ্গারিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা,
আছাড়িয়া ক্ষোভে রোষে আস্ফালিয়া ভাঙ্গ বেলা ;
উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে এসে মাথা কুটে'
নিষ্ফল আক্রোশে ফুলি' শৈলপাদে পড়ে লুটে।
অচল অটল গিরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া,
গর্জ্জনে ক্রন্দনে শত গলে না ক বিন্দু হিয়া!
দুরন্ত বালিকা যেন হস্তপদ আছাড়িয়া
কভু কাঁদ, কভু হাস, কভু পড় লুটাইয়া!

অটল ভূধর স্থির,—স্থবির জনক সম
অকম্পিত ; দেখে চেয়ে মনোরম পরাক্রম।
প্রশান্ত মাতার সম ও তব উৎপাত-খেলা
অবিরাম অবিশ্রাম সাহিছে জননী-বেলা !
কিবা তুমি উন্মাদিনী ;—কে কৈল পাগল তোরে
প্রশান্ত গম্ভীর হিয়া কে দিল চঞ্চল ক'রে ?
সুনীল দিগন্ত ওই সাদরে বেষ্টিয়া হিয়া
দিয়াছে সুনীল হৃদে নীল হৃদি মিশাইয়া,
তবু তুমি উন্মাদিনী ! কি চাও—কাহারে পেতে ?
সুনীল অঞ্চলে তোর শিশু রবি উঠে প্রাতে—
প্রদানে কিরণ-রাশি ; পুলকে জগত ভোর ;
তাই মর মাথা কুটে'—ধরণী সপত্নী তোর !
ছুটে এস গ্রাসিবারে শত শত ফণা তুলি'।
সপত্নী-বিদ্বেষে শেষে উর্ম্মিলে ! উন্মত্ত হ'লি।
কিবা, আজো দেবাসুরে মন্থন করিছে তোরে ;
প্রোথিত মন্থন-দণ্ড নীলগিরি—নীল-নীরে ;—
তাই উত্থিত ঘর্ঘর ঘোর বিকীরিত ফেনোচ্ছল !
উন্মত্ত অধীর তাই প্রশান্ত সুনীল জল !
অমরে অমৃত দিলি,—নীলকণ্ঠে হলাহল ;
রত্নময়ী সুনীলে গো ! মানবে দিলি কি বল্ ?

আমাদের কুটীর

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।

ভোরের বেলা উঠলে রবি শত রঙের মেলা ;
ইন্দ্রধনু-বসনখানি পরেন রাণী-বেলা !
শুভ্র ফেনের আঁচলখানি গরবেতে ফুলে,
কূলে কূলে দুলে দুলে লুটায় পদমূলে !
আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
আঙিনার সম্মুখেতে বিস্তারিত বেলা
তরঙ্গিত বালুর স্তূপে কড়ি-ঝিনুক-মেলা ;
ছোট বড় গণ্ডশিলা পড়ে' জলের তীরে,—
করী যেন করভ সাথে নেমেছে নীল নীরে।
আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ঘন তালী-বনের মাঝে সরু পথের রেখা,
সুন্দরী-সীমন্তে যেন সিন্দূরের লেখা।
বাতাস সদা মাতাল যেন উঠে, পড়ে ছুটে,—
নারিকেলের কুঞ্জগুলি আকুল মাথা কুটে !
আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ধীবরের নৌকাগুলি কালো টিপের মত
ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরী খেল্‌ছে অবিরত ;
উপলে রচিত গুহা—ঢেউয়ের তীব্র বেগে,
তারি মাঝে বসে বসে স্বপ্ন দেখি জেগে।
আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।

ধূ-ধূ ধূ-ধূ বারিরাশি, হু-হু হু-হু গান ;—
তারি মাঝে হারিয়ে ফেলে মুগ্ধ সরল প্রাণ,

অন্য-মনে থাকি চেয়ে,—বালুর পরে বসে ;
মাথর উপর ফুটে তারা, সন্ধ্যা নেমে আসে।

অক্ষয়কুমার বড়াল

১৮৬০—১৯১৯

অক্ষয়কুমার বড়াল

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা চোরবাগানস্থ অধুনাবিলুপ্ত শ্রীনাথ রায়ের গলিতে এক সুবর্ণবণিক্-পরিবারে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—কালীচরণ বড়াল ; আদি নিবাস—চন্দননগর।

অক্ষয়কুমার হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু পাঠানুরাগ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল। পঠদ্দশায় তিনি কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর প্রতি অনুরক্ত হন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন, অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির সহিত তিনিও কাব্যরসাস্বাদ মানসে কবি বিহারিলালের নিকট যাতায়াত করিতেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অক্ষয়কুমারও বিহারিলালের কাব্য-শিষ্য ছিলেন

অল্প বয়স হইতেই অক্ষয়কুমার কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। ১২৮৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'পুনর্ম্মিলনে' নামে কবিতাটিই বোধ হয় তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পর-বৎসরে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ—'প্রদীপে' এই কবিতাটি স্থান লাভ করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের রচিত বহু কবিতা 'বীণা' (রাজকৃষ্ণ রায়-সম্পাদিত), 'কল্পনা', 'বিভা', 'কর্ণধার', 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'জাহ্নবী', 'বাণী', 'অর্চ্চনা', 'আর্য্যাবর্ত্ত' প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা—"স্বজাতি সম্ভাষণ" চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত "বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী"তে পঠিত ও 'সুবর্ণবণিক্ সমাচারে' (মাঘ ১৩২৫) প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমার বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চাকুরীতে প্রবেশ করেন। কিছুদিন দিল্লী এণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কের হিসাব-বিভাগে যোগ্যতার সহিত

কাজ করিবার পর তিনি নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইনসিউরেন্স কোম্পানীর আপিসে প্রধান কর্ম্মচারীর পদ লাভ করেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ৪ঠা আষাঢ় ১৩২৬ (১৯ জুন ১৯১৯) তারিখে কলিকাতায় তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।*

গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয়কুমারের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে। তিনি জীবনে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহার সবই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করেন নাই; এই সকল রচনা হইতে চয়ন করিয়া তিনি জীবদ্দশায় মাত্র পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একমাত্র 'ভুল' ছাড়া তাঁহার জীবদ্দশায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেক পুস্তকের নূতন সংস্করণে সংশোধন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন, এমন কি, কোন কোন কবিতার নূতন নামকরণও করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইল :—

রচিত :—

১। **প্রদীপ :** (গীতি-কবিতাবলী)। চৈত্র, ১২৯০ (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ৬৮।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে, পৃ. সংখ্যা ১১৩। গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—"প্রথম সংস্করণের সাত আটটি কবিতা রাখিলাম। তাহাও আমূল পরিশোধিত। এমন কি, নূতন কবিতাও বলা যায়। সুহৃদনুরোধে কনকাঞ্জলি ও ভুলের দুইটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। অবশিষ্টগুলি নূতন।"

---

* 'বঙ্গীয় মহাকোষ' ও 'বিশ্বকোষে' অক্ষয়কুমারের মৃত্যু-তারিখ ভুলক্রমে 'শ্রাবণ ১৩২৬' মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩১৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণটি (পৃ. ১১৫) আমূল সংশোধিত ও 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "প্রস্তুতি" সম্বলিত।

২। **কনকাঞ্জলি :** (গীতি-কাব্য)। আশ্বিন, ১২৯২ (২৩ জানুয়ারি ১৮৮৬)। পৃ. ৯০।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল—বৈশাখ ১৩০৪ ; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৩। "এই দ্বিতীয় সংস্করণের অর্দ্ধাধিক কবিতা নূতন এবং গ্রন্থিসম্বদ্ধ। অবশিষ্টাংশ কনকাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে ও ভুলে প্রচারিত হইয়াছিল।"

১৩২৪ সালে 'কনকাঞ্জলি'র তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ১০৭) প্রকাশিত হয়। ইহার "ভূমিকা" লিখিয়াছেন—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

৩। **ভুল :** (গীতি-কবিতাবলি)। ১২৯৪ সাল (ইং ১৮৮৭)। পৃ. ১২৯।

১২৯৪ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' সমালোচিত। ইহার "আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কবির ছিল ; তিনি "যন্ত্রস্থ" বলিয়া তৃতীয় সংস্করণের 'কনকাঞ্জলি'র (১৩২৪) শেষে বিজ্ঞাপনও দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা প্রকাশিত হয় নাই।

৪। **শঙ্খ :** (গীতি-কাব্য)। আশ্বিন, ১৩১৭ (ইং ১৯১০)। পৃ. ১২৭।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "অনুবন্ধ" সহ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৩৩) প্রকাশিত হয়—১৩২০ সালের আশ্বিন মাসে।

৫। **এষা :** (গীতি-কাব্য)। শ্রাবণ, ১৩১৯ (ইং ১৯১২)। পৃ. ১৬৭।

১৩১৩ সালের ১৯এ মাঘ অক্ষয়কুমারের পত্নীবিয়োগ হয়। পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশে তিনি যে কবিতাগুলি রচনা করেন, তাহাই এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল—ভাদ্র ১৩২০, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭৫। এই সংস্করণের "পরিচয়" লিখিয়া দিয়াছেন—বিপিনচন্দ্র পাল।

সম্পাদিত ঃ—

(ক) 'কবিতা' : রাজকৃষ্ণ রায়। ১২৯৪ সাল (২০ অক্টোবর ১৮৮৭)।

(খ) 'অশ্রুকণা' : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। ১২৯৪ সাল (১৮৮৭)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ—

ওমর খৈয়ামের অনুসরণে অক্ষয়কুমার একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অন্তর্গত ৮৯টি কবিতা স্তবক "পান্থ" নামে ১৩১১ ও ১৩১৮ সালের বৈশাখ-সংখ্যা এবং ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে তিনি শেষ জীবনে একখানি নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

অক্ষয়কুমার ও বাংলা-সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-সকল কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইয়াও তাঁহার বিরাট প্রতিভার মধ্যে বড়াল-কবি আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই—শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলায় কোন উল্লেখযোগ্য কবি নাই, তাঁহারা সেই যুগের কবিতার সম্যক্ আলোচনা না করিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী

হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। 'প্রদীপে'র ৩য় সংস্করণের ভূমিকায় 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিতেছেন :—"সে দিন একজন নিপুণ সমালোচক—স্বয়ং সুকবি—বলিয়াছেন, বড়াল জাত-কবি। সে কথা সত্য, তিনি জাত-কবি, এবং এই কারণেই প্রথম যৌবনেও সেই জাত-কবির স্বধর্ম্ম 'সহজ বুদ্ধি'টুকুর আলোয় আপনার হৃদয়-বেলাভূমির উপলরাশি হইতে চিন্তা-মণিগুলি বাছিয়া লইয়াছিলেন।" যিনি প্রকৃত কবি, সাময়িকভাবে লোকসমাজে তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন, তাঁহার কাব্য কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবেই। প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অক্ষয়কুমারকে যে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে, সেই স্বাতন্ত্র্য কাব্যামোদী পাঠকের নিকট তাঁহাকে চির-আদৃত করিবে। অক্ষয়কুমারের প্রতিভা স্নিগ্ধ, তাহা প্রখর এবং দীপ্ত নহে। এমন নিপুণ শব্দ-শিল্পী কবিদের মধ্যে অল্পই পাওয়া যায়। রসজ্ঞ সমালোচক সমাজপতি 'প্রদীপ' সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন, বড়াল-কবির সকল কাব্য সম্বন্ধেই সেই কথা খাটে। তাঁহার "খণ্ড-কবিতায় ভাবকে পূর্ণাবয়বে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস নাই। তাহা যতটুকু প্রকাশ করে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আভাসে ফুটিয়া উঠে।···কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতম। অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ কবিতা এই ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।" অক্ষয়কুমার 'এষা'র কবিরূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। শোকাত্মক-কাব্যমধ্যে 'এষা' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতার মাধুর্য্য পাঠক কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা তাঁহার কয়েকটি গীতি-কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।—

প্রদীপ ঃ

গীতি-কবিতা

ক্ষুদ্র-বনফুল-বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে ;
ক্ষুদ্র-ঊর্ম্মি-মূলে বুলে প্রলয়-প্লাবন ;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে
চির-উষা জেগে আছে ;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন ।

ক্ষুদ্র-বৃষ্টিকণা-বলে
সপ্ত পারাবার চলে ;
ক্ষুদ্র বালুকায় গড়ে নিত্য মহাদেশ ·
ক্ষুদ্র বিহগের সুরে
ষড়-ঋতু-চক্র ঘুরে ;
ক্ষুদ্র বালিকার চুম্বে স্বরগ-আবেশ ।

ক্ষুদ্র মণি-কণিকায়
খনির মহিমা ভায় ,
ক্ষুদ্র মুকুতার গায় সাগর-মাধুরী ;
পল-অনুপল 'পরে
মহাকাল ক্রীড়া করে ;
অণু-পরমাণু-স্তরে ব্রহ্মার চাতুরী ।

হৃদয়টা ভেঙ্গে টুটে'
এক বিন্দু অশ্রু ফুটে ;
ক্ষুদ্র এক নাভি-শ্বাসে সারা প্রাণ ভরা ;
ক্ষুদ্র-কুশ-কাশ-মূলে
অতল-অনল জ্বলে ;
ক্ষুদ্র নীহারিকা-কোলে শত শত ধরা।

তপন—বিশ্বের রাগ,
বুকে কলঙ্কের দাগ ;
সদা নিষ্কলঙ্ক-রূপা চকিতা হ্লাদিনী।
নর-কণ্ঠে বিষ ঝরে,
অমৃত শিশুর স্বরে ;
নিটোল শিশির-কণা, বন্ধুরা মেদিনী।

মানব-বন্দনা

সেই আদি-যুগে যবে শিশু অসহায়,
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর-আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি',
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?

সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্ব-জন !

... ...

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির ;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ক ফল,
পত্রপুটে নীর ?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে—বিচিত্র সুরে, বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার !

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'
করিনু ভক্ষণ ?

কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুর্দ্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব-দেবী-নাম ?

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ উচ্চারি ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?
কে দিল ঔষধ রোগে, ক্ষতে প্রলেপন,
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে ?
... ...
প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি,
যুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ! বিদ্যুত মোহন,
বজ্রমুষ্টিধর !

চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা !
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তস্থর্য্য-শিখা !
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে !
দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে !

নমি, হে সার্থক-কাম ! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব !
মর দেহে নহ মর, অমর-অধিক
ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য তব !
ল'য়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে !
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায় !
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,
আপন স্রষ্টায় ।

... ...

নমি তোমা, নরদেব ! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি !

সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে ;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়ে-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় ;
ভ্রূ-ভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে ক্রম-ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয় !

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধু-মূলে জল-বিন্দু, বিশ্ব-মূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ !
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার !
অদ্রি-তলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার !
কত রাজা, কত রাজ্য গড়িছ নীরবে,
হে পূজ্য, হে প্রিয় !
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয় !

শ্রাবণে

সারা দিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসে' জানালার পাশে, সারা দিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ !
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া ;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি' ;
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাসঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িঙ্গ কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে' শ্যাম ঘাসে।

দীঘীটি গিয়াছে ভরে' সিঁড়ীটী গিয়াছে ডুবে',
কাণায় কাণায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে—বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ কমল।

তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।

পাড়ে পাড়ে চকা চকী বসে' আছে দুটি দুটি ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
কচিৎ গ্রামের বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁখে,
তরু-তল দিয়া ধীরে আসে।
কচিৎ অশ্বথ-তলে ভিজিছে একটি গাভী ;
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
কচিৎ মেঘের কোলে, মুমূর্ষুর হাসি সম,
চমকিছে বিজলীর হাসি।

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছে জল টল্-মল্ থল্-থল্,
বুকে বায়ু থর-থর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে' আছে অন্ধকার
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়।
কুটীরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার সহ
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্য পানে, কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন !
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ; দেহ আছে, মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন !
এই উঠি, এই বসি ; কেন উঠি, কেন বসি !
এই শুই, এই গান গাই ।
কি গান—কাহার গান ! কি সুর—কি ভাব তার !
ছিল কভু, আজ মনে নাই !

কনকাঞ্জলি

উৎসর্গ

৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি ।

এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি',
কুহরিল ধীরে ধীরে ;

ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি' স্বপ্ন-বাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে'।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,—
কি অতল হৃদি, কি অপার স্নেহ!
হা ধরণী, তুই কি অপরিমেয়,
কি কঠোর, কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি'
রহে জাগি' নিশিদিন?

মৃত তোর ভক্ত, কাঁদ, মা জাহ্নবী,
মৃত তোর শিশু, কাঁদ, গো অটবী,
হে বঙ্গ-সুন্দরী, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর।
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার!

কাঁদ, তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান,—
কত মুক্তা-ছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে!
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান্
ওই যায় লোকান্তরে!

যাও, তবে যাও। বুঝিয়াছি স্থির,—
মানব-হৃদয় কতই গভীর;

বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ !
দিলে বাণীপদে লুটাইয়া শির,
দলি' পদে পর-মত ।

বুঝায়েছ তুমি,—কত তুচ্ছ যশ ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির-সুধা রস ;
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী !
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী !

বুঝায়েছ তুমি,—কোথা সুখ মিলে-
আপনার হৃদে আপনি মরিলে ;
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্ম-পর ।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পদে লুটে চরাচর ।

বুঝায়েছ তুমি,—ছন্দের বিভবে ;
কি আত্ম-বিস্তার কবিত্ব-সৌরভে ;
সুখদুঃখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি' !

ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চির-স্বপ্নে জাগি' !

তাই হোক, হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে—
রাজহংস সম, চির কলস্বনে,
পক্ষ দুটি প্রসারিয়া ;
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
চির স্নেহরস পিয়া !

তাই হোক, হোক। চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক !
জগতে থাকুক জগতের দুখ,
জগতের বিসংবাদ ;
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ।

তাই হোক, হোক। ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে !
দেখুক প্রেমিক,—সুগভীর যামে,
স্বপনে জগৎ ঢাকি'
নামিছে অমরী, ওই সুর ধরি',
আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

তাই হোক, হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল!
দুখ-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
কবি-জনমের হাহা!
লও—লও, গুরু, মরণ-সম্বল—
জীবনে খুঁজিলে যাহা!

স্বপ্ন-রাণী

ঘুমন্ত চাঁদের বুক হ'তে,
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত-হিয়া
আসি, প্রিয়, তোমায় দেখিতে!

ধীরে পড়ে বায়ুর নিঃশ্বাস,
মৃদু কাঁপে ফুলের সুবাস:
ছোট ছোট তারাগুলি ঘুমে পড়ে ঢুলি' ঢুলি',
কাঁপে চোখে সরমের হাস।
নদী-পারে ডাকে পাখী আধ-ঘুমে থাকি' থাকি',
কুল্-কুল্ নদী বহে' যায়;
তীরে তীরে তরু-কোলে কুসুমিতা লতা দোলে,
জগৎ ঘুমায়।
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায়!

যখন গো হৃদয় ঘুমায়—
বাসনা ঘটনা যত, সমীরে সুরভি মত,
নীরবে হৃটিতে মিশে যায় ;
ভাসা-ভাসা কথা শত, নদীতে ঢে'য়ের মত,
হেথাহোথা ভাসিয়া বেড়ায় ;
কে আপন, কেবা পর, কাহারে করিবে ভর—
হৃদয় বুঝিতে নাহি চায় !
স্বপনের মত হ'য়ে, হাতে প্রেম-মালা ল'য়ে
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় !

আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় ।
যাই—যাই, নাহি বল, চোখে ভরে' আসে জল,
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে সন্দেহে লজ্জায় ।
আর বার মনে হয়,— কেন লজ্জা, কেন ভয় ?
নয়নে লিখিয়া দেই অলক্ষ্য চুম্বনে,—
যে প্রেম ফুটে না কভু নারীর বচনে !

শত নাগিনীর পাকে

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ' বাহু দিয়া
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর !
এ রুদ্ধ-পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া !

হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী—টুটিয়া লুটিয়া
ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ;
বসন্তে—বনান্তে যথা দুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি' নহে তৃপ্ত হিয়া।

এ দেহ—পাষাণ-ভার কর গো অন্তর !
হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভাগীরথী,
ক্ষুদ্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি' নিরন্তর
হতেছে বিকৃত ক্রমে, অপবিত্র অতি।
আলোকে পুলকে ঝরি', তুলি' কলস্বর
করুক তোমারে চির স্নিগ্ধ-শুদ্ধমতি !

এখনো রজনী আছে

এখনো সুদীর্ঘ ছায়া ঢাকি' তরুমূল ;
এখনো সুদূর বাঁশী আলাপে মধুর ;
এখনো ঝরিছে জ্যোৎস্না মলিন বিধুর ;
এখনো বহিছে ঝরা করি' কুলু-কুল।
এখনো টুটিছে ফুল, ফুটিছে মুকুল ;
এখনো দেখিছে গিরি রবি কত দূর ;
এখনো সুমন্দ বায়ু সুগন্ধ-আতুর—
কেন তুমি, বনযূথী, সরমে আকুল !

সুপ্ত অলি-বদ্ধ-পদ্মকলিকা-নয়নে
রও, চির চেয়ে রও, লো, মধু-যামিনী !

অতনু-কম্পিত তনু,—অতৃপ্ত স্বপনে
বাঁধ' চির-আলিঙ্গনে, কুসুম-কামিনী !
এখনো দেবতা আঁখি জাগিয়া আকাশে ;
এখনো দেবতা-শ্বাস ভাসিছে বাতাসে।

হৃদয় সমুদ্র সম

হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি' উচ্ছ্বসি'
আছাড়ি' পড়িছে আসি' তব রূপ-কূলে !
হৃদয়—পাষাণ-দ্বার দাও—দাও খুলে' !
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি' ?
অনুদিন অনুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি'
বৃথায় পশিতে চাই ওই মর্ম্ম-মূলে !
লক্ষ্যহীন-নেত্রে, নারী, সাজি' নানা ফুলে,
মরণ-লুণ্ঠন হের,—স্থির গর্ব্বে বসি' !

কি মমত্ব-হীন তুমি, রমণী-হৃদয় !
এত বর্ষে, এই স্পর্শে, এ চির-ক্রন্দনে,
এত ভাষ্যে, এই দাম্ভে, এ দৃঢ়-বন্ধনে,—
দানব সদয় হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিলয়।
বিফল উদ্যম, শ্রম, বিক্রম, বিনয়—
নিত্য পরাজিত আমি তোমার চরণে।

কবিতা-বিদায়

যাবে কি একান্ত তবে? যাবে তুমি, প্রিয়া!
সকলি কি ফুরাল চকিতে!
জীবনের সব সাধ, সব প্রেম দিয়া,
তবু আমি নারিনু রাখিতে?
চাহি নি জগৎ-পানে, তোমারে চাহিয়া
আজীবন দেখেছি স্বপন;
আজ—জগতের দ্বারে, কার কাছে গিয়া
কি মাগিব? সবই যে নূতন!

তোমার নয়ন হ'তে ফিরালে নয়ন,
এ জীবন শূন্য মনে হয়!
কোথা উষা, কোথা আলো! কেবল দহন;
কোথা শোভা-বিকাশ-বিস্ময়!
কোথা শশি-তারা-ভরা নিথর আকাশ,
চিরস্থির পূর্ণিমার রাত!
জীবনে মরণে সেই গভীর বিশ্বাস,
অলক্ষ্যে অপ্সরা যাতায়াত!

নিস্ফল সাধনা, আজ—অদৃষ্টে আশ্রয়;
গেছে স্বর্গ সরি' বহু দূরে;
নাহি দেহে বসন্তের আকাঙ্ক্ষা দুর্জ্জয়—
রূপে রসে, গন্ধ-স্পর্শ সুরে।

সে মত্ত হৃদয় নাই—সৌন্দর্য্যে উচ্ছল,
　　সর্ব্ব বিশ্বে আছাড়িয়া পড়ি !
সজীব নির্জ্জীব নাই—কল্পনা-বিহ্বল,
　　সর্ব্বভূতে আপনা বিতরি !

সে পূত মাহেন্দ্র-ক্ষণে যে দাঁড়াত আসি'—
　　হোক চিত্রে মূর্ত্তিতে সঙ্গীতে,
দিয়া নিজ আশা ভাষা, প্রেম রাশি রাশি,
　　মজিতাম তাহারি ভঙ্গিতে !
দিতাম নয়নে তার আমার চেতনা,
　　হৃৎ-রক্তে রঞ্জিয়া কপোল,—
লতিকার নব পর্ণে পুষ্প সম্ভাবনা,
　　সৌন্দর্য্যের বিচিত্র হিল্লোল !

তুমি শব্দে ভাবে ছন্দে কেন এসেছিলে,
　　নতমুখী নবীনা ললনা ?
দেখি নি—ভাবি নি কিছু আমি যে অখিলে,
　　বুঝি নাই নারীর ছলনা !
ত্রস্তে ব্যস্তে প্রেমমালা পরাইনু গলে,
　　আশার কিরীট দিনু শিরে ;
ইহ-পরকাল-মম দিয়া পদতলে—
　　আজ আমি কোথা যাব ফিরে' ?

সে যৌবন-কল্পনায় নিজ প্রাণ দিয়া
জড়ে কেন দেই নি চেতনা ?
দৃষ্টিহীন নেত্রে—চির রহিত চাহিয়া
আমার সে প্রথম কামনা !
কেন অঙ্গে অঙ্গে তার দেই নি ছড়ায়ে
আমার সে হৃদয়-স্পন্দন ?
আপনার বাহুপাকে আপনা জড়ায়ে
দেখি নাই প্রেমের স্বপন ?

আজন্ম তপস্যা-ফলে লভি উপহাস—
তবু কেন বিরহ-বেদন ?
মাদকতা-অবসাদে মাদক-পিয়াস,
ভ্রম-ভঙ্গে ভ্রম-অন্বেষণ !
কোথা তুমি, মহাশ্বেতা, অচ্ছোদের তীরে
ল'য়ে তব অক্ষয় যৌবন !
কেন আর, কাদম্বরী, মৃত চন্দ্রাপীড়ে
প্রেম-ভরে করিছ চুম্বন !

যাও তবে, প্রাণাধিকা, মুছিনু নয়ন,
রুদ্ধ অশ্রু চিররুদ্ধ থাক।
কেন বিদায়ের ছল, নিঃশ্বাস সঘন,
সান্ত্বনার অর্থহীন বাক্ !

বৃথায় আশ্বাস-দান—হ'য়ো না নিষ্ঠুর,
আমি অতি কৃপাপাত্র—দীন ;
তোমার বিজয়-গর্ব্বে আমি শত-চুর—
শ্রেয় প্রেয় উভয়-বিহীন !

যাও তবে ! মৃত্যু পরে যদি দেখা হয়,—
ভুবর্লোকে—কাশ্যপ-আশ্রমে ;
—ক্ষৌমবাস-অন্তরালে কম্পিত হৃদয়,
অভিমানে, লজ্জায়, সম্ভ্রমে !—
অযশ-ভবিষ্য-পুত্র কৌতুকে জিজ্ঞাসে,—
'দু' জনার কি সম্বন্ধ-বাদ ?'
নারীর সরল-প্রেমে, সহজ-বিশ্বাসে
কহিও, ক্ষমিও অপরাধ।

শঙ্খ

হৃদয়-শঙ্খ

তুচ্ছ শঙ্খসম এ হৃদয়
পড়িয়া সংসার-তীরে একা-
প্রতি চক্রে আবর্ত্তে রেখায়
কত জনমের স্মৃতি লেখা !

আসে যায়—কেহ নাহি চায়,
সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি ;

কে শুনিবে হৃদয়ে আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি !

হে রমণী, লও—তুলে' লও,
তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
একবার ওই গীতি-গানে
বেজে' উঠি সুমঙ্গল রবে !

হে রথী, হে মহারথী, লও,
একবার ফুৎকার' সরোষে—
বল-দৃপ্ত, পরস্ব-লোলুপ
মরে' যাক্ এ বজ্র-নির্ঘোষে !

হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার' একবার—
আহুতি-প্রণতি-স্তুতি আগে
বহে' আনি আশীর্ব্বাদ-ভার !

প্রতিভার উদ্বোধন

বিধাতার নিষ্কাম হৃদয়ে
চমকিল প্রথম কামনা ;
চমকিল নব আশা-ভয়ে
আনন্দের পরমাণু কণা !

অসহ্য এ নব জাগরণ—
আকুল ব্যাকুল চিত্তাকাশ !
স্পন্দন—কম্পন—আলোড়ন—
এ কি আশা, না এ অবিশ্বাস ?

কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ;
গড়িছে—ভাঙ্গিছে বার বার—
এ কি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির—

বার বার মুছেন নয়ান,
ক্রমে ছায়া—ক্রমশঃ আভাস ;
নাহি জ্ঞান, নহেন অজ্ঞান—
সহসা জগৎ পরকাশ !

পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস,
এ কি দুঃখ—না এ সুখ অতি !
বাস্তব—না কল্পনা-বিকাশ ?
কামনা-বাসনা মূর্ত্তিমতী !

বিস্ময়-বিহ্বল মহাকবি
চাহিয়া আছেন অনিমিখে—
সম্মুখে ফুটিছে নব রবি,
তারকা ফুটিছে দশ দিকে !

মহাশূন্য পরিপূর্ণ আজি
সুকোমল তরল কিরণে !
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি
দূরে—দূরে বিচিত্র-বরণে !

গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ছুটে
ওঙ্কার-ঝঙ্কার অনাহত !
পঞ্চ ভূত উঠে ফুটে' ফুটে'
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত !

ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায়
চলে কাল ললিত-চরণে !
অন্ধশক্তি পূর্ণ সুষমায়,
চেতনার প্রথম চুম্বনে !

নীল বাসে ঢাকি' শ্যামদেহ
শশিকক্ষে ভ্রমে ধরা ধীরে ;
কত শোভা, কত প্রেম-স্নেহ,
জলে স্থলে প্রাসাদে কুটীরে

চাহে ঊষা—চকিত নয়ন,
ফুলবাসে বায়ু সুবাসিত ;
উঠে ধীরে বিহগ-কুজন—
সৃষ্টি 'পরে স্রষ্টা বিভাসিত !

সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া,
অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা—
এস তবে, এস বাহিরিয়া
চিত্ত হ'তে, চিন্ময়ী চেতনা !

এস, নিত্য-স্বরগ-স্বপন,
রূপ-রস-শব্দ অসীমায়—
মর-জন্ম করিয়া লুণ্ঠন
অমর সৌন্দর্য্য-মহিমায় !

ল'য়ে এস—সে আদি-কল্পনা,
সুখে দুঃখে মরণে নির্ভয়,
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
সেই প্রেম—অনাদি অক্ষয় !

দেবী,
তোমার মধুর হাসে,
তুচ্ছ ম্লান ছিন্নবাসে
চকিতে জাগিয়া উঠে নিদ্রিতা অমরী !
আলু-থালু কেশরাশ,
মুখে হাসি, চোখে ত্রাস,
লাজে টানে বক্ষোবাস আজীবন ধরি'।

সেই চাঁদ আধ চায়
সেই ফুল ঝরে গায়,
আলোকে আঁধারে সেই দুয়ে জড়াজড়ি !

তোমার কোমল স্পর্শে
পাষাণ মুঞ্জরে হর্ষে—
সহস্র নয়ন'পরে দাঁড়ায় উর্ব্বশী !
কিবা মুখ অভিরাম,
কিবা কম্বুকণ্ঠ-ঠাম !
মূরছিয়া পড়ে কাম উরস পরশি'।
কোথা ঊষা অচঞ্চল,
নির্জ্জন মন্দার-তল,
কোথা মন্দাকিনী-জল—তরল আরসী !

তোমার করুণ শ্বাসে
কাঁদে প্রাণ কি উচ্ছ্বাসে !
জগৎ মুদিয়া আসে শুনে' সে বাঁশরী !
সুর পায় কিবা সুর—
আশা-ভাষা শত-চূর !
মুগ্ধ-প্রাণ দেবাসুর সুধা পান করি' !
ধরা ফুলে ফুলময়,
যমুনা উজানে বয়,
রমণী ত্বরিতে ধায় ভরিতে গাগরী।

তোমার নয়ন-রাগে
কি নব-বসন্ত জাগে !

মুঞ্জরিয়া উঠে দেহ, গুঞ্জরিয়া মন !
ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ মতি
লভে কি তড়িৎ-গতি—
যেন মূলা পরাকৃতি বেড়ে ত্রিভুবন !
আপনে আপনি লিখে'
চেয়ে থাকে অনিমিখে,
জগতে চেতনা দিয়ে নিজে অচেতন !

দেবী,
তোমারি চরণ-মূলে
আছি আমি বিশ্ব ভুলে' !
আমারে না হেরে' রাধা কাঁদে উভরায় !
শকুন্তলা নিত্য আসি'
হেরে মম রূপরাশি !
রত্নাবলী লতা-ফাঁসী গলে দিতে যায় !
মহাশ্বেতা আমা তরে
চির ব্রহ্মচর্য্য করে !
সাবিত্রী আমারে ধরে' যমেরে তাড়ায় !

তোমারি বিরহে কাঁদি'
মেঘে আমি কত সাধি,
খুঁজি কত পদ্মবন, ডাকি দেবগণে !
চাঁদে ফিরে' ফিরে' চাই,
মলয়ে আঘ্রাণ পাই,
বাহুভ্রমে ছুটে' যাই লতা-আলিঙ্গনে !

শক্রধনু হেরি' ক্রোধে
ধরি ধনু দৈত্যবোধে ;
অর্দ্ধ-বস্ত্র শনি-গ্রস্ত ভ্রমি বনে বনে।

মূর্চ্ছান্তে চমকি' চাই,
বায়ু বলে নাই—নাই,
পতি-নিন্দা-শোকে সতী ত্যজেছে ভূতল !
স্কন্ধে ল'য়ে মৃতদেহ ,
বুকে ল'য়ে প্রেম-স্নেহ—
ত্রিভুবনে নাহি গেহ—ছুটিছে পাগল !
কালের কুটীল দিঠে
পড়ে অঙ্গ পীঠে পীঠে—
পতি-প্রেমে দেবী তুমি, পীঠে তীর্থস্থল !

বিরচি' জগৎ-মাঝ
মমতার 'মমতাজ'—
বুক-ভরা নিরাশায় স্বপন-রচনা !
অশ্রু দিয়া, শ্বাস দিয়া,
মনঃপ্রাণ নিঙ্গাড়িয়া,
তোমারি প্রীত্যর্থ, প্রিয়া, তোমারি কল্পনা !
সে তপস্তা ঘেরি' ঘেরি'
ঘুরে তব স্মৃতি-চেড়ী,
মরণ মধুর করি'—জীবন ছলনা !

বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার !
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থির-নেত্রে চাহি';
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা !

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল

নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি'!
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্ত্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা!
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা!
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি!
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণ-ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি!

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল!

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা!
মদির মধুক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষশিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা!

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি' ;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘুৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি,—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী !

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

এস—চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !

রবীন্দ্রনাথ

[১২৯৭]

দূরে—মেঘ-শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা সম প্রভাত-কিরণ।
তরুলতা নতমাথা—ডাকে পুষ্পবাসে,
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে করে আবাহন।

শিথিল পাণ্ডুর শশী মেঘখণ্ড পাশে,
পলাইছে নিশীথিনী ধূসর-বরণ।
ঝরণা ঝরিছে দূরে, বায়ু মৃদু শ্বাসে,
পাটল তটিনী-বক্ষে আলোক-কম্পন।

ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য-কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর!
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটীর—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম!
অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি—কবি!

অপরাহ্নে

শুনি নাই কার কথা, বুঝি নাই কার ব্যথা—
এত কাব্যে, এত গাথা-গানে!
দেখি নাই কার মুখ—এত সুখ, এত দুখ,
এত আশা, এত অভিমানে!

এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল।
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল।

অযতনে ব্যর্থ হয় সবি
ধরিয়া তুলিটি সুধু দুটী রেখা টেনে' গেলে—
শূন্য হৃদি, হ'য়ে যেত ছবি !
কি কথা বলিতে হবে একবার বলে' গেলে-
লক্ষ্য-হারা, হ'য়ে যেত কবি !

কোথা তুমি ফুটিয়াছ ফুল
এ শুষ্ক তরুর !
কোথা তুমি বহিছ তটিনী,
এ তপ্ত মরুর !
যূথীর শীতল মৃদু বাস,
বায়ু সুধু আনিছে হেথায়
কার মুখ চুমি' !
কে আছে—কোথায় আছ তুমি !

বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যুষে,
ডাকে সে কি বৃথায়—বৃথায় !
ফুটে না কি প্রভাত-আলোক,
সে ডাক্ কি শূন্যে ভেসে যায় !
জীবনের এই আধখানা,
দরশ-পরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই ?
এ কি সুধু ভাবহীন ভাষা !

এ কি সুধু ভাবহীন ভাষা—
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত-পিপাসা !

এই যে আঁখির কাছে কত অশ্রু ফুটে আছে,
কি আশা নিশ্বাস পিছে অবিরত যুঝে—
এই বুক-ভরা ব্যথা কেহ নাহি বুঝে ?

এই যে নীরব প্রীতি—শারদ জ্যোৎস্নার স্মৃতি,
আপন হৃদয়-ভারে ব্যথিত আপনি—
বাজিছে বাঁশরী দূরে করুণ পূরবী সুরে,
এই আছে, এই নাই—উছলিছে ধ্বনি—
এই যে আকুল শ্বাসে—জগৎ মুদিয়া আসে,
অথচ জানি না নিজে কি দুঃখে বিহ্বল—
কিছু নয়—কিছু নয় তবে এ সকল ?

এই যে নদীর কূলে পলে পলে ঘুরি ভুলে',
আগ্রহে তরুর তলে চাহি কার তরে—
গাঁথিয়া ফুলের মালা খেলে না কি কোন বালা,
চাহে না পথিক পানে সন্ধ্যায় কাতরে !

ওই কুটীরের দ্বারে, এ ভাঙ্গা বেড়ার পারে
কেহ কি বসিয়া নাই মোর অপেক্ষায় ?
চমকি' উঠিলে বায়ু চমকিয়া চায় !
আসে যায় কত লোক, কাহারো সজল চোখ
পড়িবে না মোর চোখে, হবে না মিলন—
এ জীবন-হেঁয়ালির চরণ-পূরণ !

ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, স্তব্ধ বনভূমি ;
সোণালী মেঘের গায়ে, সুরভি-শীতল বায়ে,
শিথিল তটিনী-ভঙ্গে লুকালে কি তুমি !
পিক-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল ক্ষেত্রে,
মুদ্রিত কমল-পত্রে রয়েছ কি ঘুমি' !
আকুল হৃদয় কাঁদে, কোথা তুমি—তুমি !

ছাড়া-ছাড়া হ'য়ে কেন বেড়াইছ ভাসি' ?
ভাঙ্গিয়া স্বপন-কারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি !
নাহি কথা, নাহি ব্যথা—কি গভীর নীরবতা !
হৃদয়ে হৃদয় পড়ে উচ্ছ্বাসি'—উচ্ছ্বাসি' !

নিশীথে

আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ী, সৌরভে আকুল বায়,
দুলে' দুলে' স্রোতস্বিনী কূলে কূলে বহে' যায়।
চোখে আসে ঘুম-ঘোর, মন কি ভাবিতে চায়—
আধেক গেঁথেছি মালা, আর নাহি গাঁথা যায় !
সমীরণে ভেসে' আসে সুদূর অপ্সরা-গান—
অলস স্বপন সম ছায়িতেছে মনঃপ্রাণ !
এই জীবনের পারে, এই স্বপনের শেষে,
কে যেন আমার আছে জীবন কল্পনা-বেশে !

উড়ে কেশ বায়ু-ভরে, ছল-ছল দু' নয়ান,
বুকে উছলিছে প্রেম, মুখে কত অভিমান !

২

কোথা তুমি—কোথা তুমি—জন্ম-জন্মান্তর মায়া—
স্মৃতিময়ী, প্রীতিময়ী, গীতিময়ী সেই কায়া !
নন্দনে—মন্দার-কুঞ্জে মন্দাকিনী-তীরে বসি',
অন্যমনে দেখিছ কি নীল নভে পূর্ণশশী !
করে মৃণালের ডোর, কোলে পারিজাত-রাশি,
বাতাসে বিরহ-গীতি ক্ষণে ক্ষণে আসে ভাসি' !
ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রু, পড়ে শ্বাস গুরু-ভার—
চাহিছ কাতর-দৃষ্টে ধরা পানে বার বার !
কারে কি বলিতে ছিল—অভিশাপে ছিলে ভুলি',
জ্যোৎস্নায় সৌরভে গানে—দূর-স্মৃতি উঠে দুলি' !

৩

পৃথিবীর শত দুঃখে হৃদয় শতধা চুর,
কেঁদে' কেঁদে' ক্লান্ত হ'য়ে দেখিছে স্বপন দূর—
মেঘেদের আঁকা-বাঁকা পথ যেন দিয়ে দিয়ে,
অবশেষে পৌঁছিয়াছে মন্দাকিনী-তীরে গিয়ে !
দূর হ'তে দেখিতেছে করুণ দৃষ্টিটী তব—
পলকে পলকে ফুটে কত শোভা নব নব !
জ্ঞান আর নাহি জ্ঞান, শত বাহু বাড়াইয়া—
আকুলি' ব্যাকুলি' হৃদি তোমারে ডাকিছে, প্রিয়া !
তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব—আলোকে আঁধারে মেলা,
ছায়া নিয়ে—মায়া নিয়ে এ জীবন-প্রেমখেলা !

দাঁড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যুর নিবিড় ধুমে!
জগতের বাধা-বিঘ্ন জগতে পড়িয়া থাক্,
নীরবে সৌন্দর্য্য-মাঝে কবিত্ব ডুবিয়া যাক্!
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই!
তারকায় তারকায় হা-হা করে' তোমা তরে
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ-পরে!
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু—যন্ত্রণার অবসান?
ধর এ জীবনাহুতি—বিরহের শেষ গান!

এষা

মৃত্যু

মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ?
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্ম-দান?
জীবন-জড়ান সত্য—সকলি কি মিথ্যা আজ?
গৃহ ছাড়ি' গৃহ-লক্ষ্মী শুইয়া শ্মশান-মাঝ!

সহসা নিদ্রার মাঝে এ কি জাগরণ মম!
এই ছিলে—আর নাই, চলে' গেছ স্বপ্ন সম!
প্রতিপল-পরিচিতা! তোমারে বিচ্ছিন্ন করি'
কেমনে এ শূন্য-মনে এ শূন্য-জীবন ধরি!

কি ছিলে আমার তুমি,—প্রেয়সী না ক্রীতদাসী ?
দুটী হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি !
একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরূক !

জাগে শোকে অভিমান,—কেন এত ভালবেসে
আভাসে বল নি তুমি, এত দুখ দিবে শেষে !
তুমি অভিশপ্তা দেবী—কেন বল নাই আগে,—
সুধু স্বরগের ছায়া দেখাইছ অনুরাগে ?

একে একে প্রতি দিন, প্রতি কথা মনে পড়ে,
আবার যে হয় ভ্রম,—তুমি বসে' আছ ঘরে !
পরিজন-মুখপানে কাতর-নয়নে চাই,
আকুলিয়া উঠে প্রাণ, নাই তুমি, নাই—নাই !

আকাশের পানে চাই,—কোন দেব আসি' যদি
দেন মৃত-সঞ্জীবনী, দেন কোন মন্ত্রৌষধি !
কি আদরে বুকে করে' ঘরে ফিরে' ল'য়ে যাই !
আকুলিয়া উঠে প্রাণ, সে তপস্যা নাই—নাই !

ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা, উঠে শূন্যে ধূমভার ;
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—সুধু মোহ, কে কাহার !
অশ্রুহীন দগ্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া,
বুকে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া ।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
পশ্চাতে আলোক-ছায়া, স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিভেদ !
সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন !
ভ্রমিতেছি শোক-বৃদ্ধ দীন হীন উদাসীন ।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, নিবিতেছে চিতানল ;
জলদ করুণ-প্রাণ ঢালিতেছে শান্তিজল ।
বিধবা বিস্ময়-দৃষ্টি, সধবা প্রণাম করে ;
শ্বসিয়া—শ্বসিয়া বায়ু কাঁদিতেছে বনান্তরে ।

বিদায়—বিদায় তবে ! দিবা হ'ল অবসান ;
জানি না মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান !
যেথা থাক—সুখে থাক ! ঝরে তপ্ত অশ্রুভার ;
অদূরে জাহ্নবী বহে, ধরা অতি অন্ধকার ।

শোক

উঠিছে ডুবিছে তারাগণ,
জন্মিছে মরিছে কত মেঘ,
আসিছে শ্বসিছে সমীরণ—
প্রাণহীন কিবা নিরুদ্বেগ !

তেজোহীন রবি দিন দিন,
মসীঘন শশীর গহ্বর,
বার্দ্ধক্যে প্রকৃতি শোভাহীন,
ধরা—শুষ্ক পতিত প্রান্তর !

মৃত প্রিয়া। মৃত্যু সর্ব্বভুক্,
মৃত্যুর নাহিক কালাকাল :
গেছে সুখ, নাহি ডরি দুখ,
জীবন ত শুধু ইন্দ্রজাল !

'শূন্য—ওই শূন্য ছিন্ন করি,'
ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসি ধাতায়,—
'শূন্য হস্তে আছ শূন্য ধরি,'
সত্য সুখ দুঃখ কেন তায় ?

'সেই প্রেম—সে কি গো কুহক ?
এখনো নয়নে মনে ভাসে !
এই স্মৃতি—জীবন-শোষক,
এও কি শূন্যতা হ'তে আসে ?'

২

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক !
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার !

এখনো শ্বসিছে বায়ু মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময় !
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা !

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা ?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা !
মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন !

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে' গেছে অনাদরে !
কাতর-নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি,
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি !

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা ব'সে অভিমানে !
আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যথা দিতে জানে !
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর—
শীতের কুয়াসা ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার !

সান্ত্বনা

সতী,
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি !
তুমি যাহে দেছ পদ—
সে যে ফুল্ল কোকনদ !
সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ-মূরতি ।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কন্যারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি ?

তুমি চোখে মুখে হেসে,
উড়ায়ে আঁচলে কেশে,
চ'লে গেলে নিজ দেশে অতি হৃষ্ট-মতি!
মানিলে না কোন মানা,
আমি কেন ভাবি নানা?
চায় না দেখিতে বাপে কোন্ স্নেহবতী?

কোন্ দিকে, কোন্ পথে—
চড়িয়া পুষ্পক-রথে
কখন চলিয়া গেলে তুমি দ্রুত-গতি!
চিতাধূম-অন্ধকারে,
বিষম শোকাশ্রু-ভারে,
তখন দেখি নি চেয়ে—ছিনু ছন্ন-মতি।

আজ—দেখি, মুছি' অশ্রুভারে,
তোমারে বরিয়া দ্বারে
ল'য়ে যান্ আগুসারে দেবী অরুন্ধতী!
দেববালা বেছে বেছে,
চরণে বিছায়ে দেছে,
মল্লিকা যূথিকা বেলা শেফালি মালতী।

আঁচলে নয়ন মুছে'
মাতৃলোক কত পুছে—
কত-না তারকা-দীপে করিছে আরতি!

অপ্সরী কিন্নরী কত
চামর-ব্যজনে রত,
অমর অমরী কত করে স্তুতি-নতি !

কমলা-করুণা-ভরে
স্বর্ণ-ঝাঁপি দেন করে,
আদরে নয়ন দুটী মুছান ভারতী !
সম্ভ্রমে পরান শচী
পারিজাত-মালা রচি',
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু পরান পার্ব্বতী !

শুভ সমারোহ হেন,
তবু যেন—তবু যেন—
তোমার সপ্রেম-দৃষ্টি খুঁজিছে জগতী !
আমি—রোগে দুখে শোকে,
গোধূলির ক্ষীণালোকে,
কর-যোড়ে করিতেছি মরণে মিনতি !

(২)

আর কেন বাঁধি তোরে—শিকল দিলাম খুলি'
কত বর্ষ অনভ্যাসে উড়িতে গিয়াছে ভুলি' ।
ঝাপটি' পড়িল ভূমে, ভয়ে কাঁপে পাখা দুটী ;
পুত্র-কন্যা-দেয় তাড়া—করে ঘরে

ল'য়ে গেনু গৃহ-শিরে অতি সন্তর্পণে ধরি',
সর্ব্বাঙ্গে বুলানু কর কত-না আদর করি',
ক্রমে সুস্থ, তুলি' গ্রীবা চাহিল আকাশ-পানে—
মুখরিত উপবন কূজনে গুঞ্জনে গানে।

স্ফুরিল কাকলী মুখে, সহসা উড়িল টিয়া—
উড়িছে—হরিৎ-পক্ষে স্বর্ণ-রৌদ্র আলোড়িয়া।
কি আলোক—পরিপূর্ণ! কি বায়ু—পাগল-করা!
প্রকৃতি মায়ের মত হাস্যমুখী মনোহরা!

ধায়—ছাড়ি' গ্রাম, নদী; দূর মাঠে যায় দেখা,—
দিগন্তে অরণ্য-শীর্ষ—শ্যামল-বঙ্কিম-রেখা।
ল'য়ে শত শূন্য নীড় ডাকে ধরা অবিরত—
নীল স্থির নভস্তলে ভাসে ক্ষুদ্র মরকত।

চকিতে সরিল মেঘ—কোথা কিছু নাই আর!
চকিতে ভাতিল মেঘে অমরার সিংহদ্বার!
ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনের কলধ্বনি—
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে' যেন তার হারা-মণি!

এই মৃত্যু—এই মুক্তি! হে দেব, হে বিশ্বস্বামী!
আমিও ত বদ্ধ-জীব, আমিও ত মুক্তিকামী!
আমিও কি ফেলি' দেহ—বিস্ময়ে আতঙ্ক-হীন—
অসীম সৌন্দর্য্যে তব হইব আনন্দে লীন?

(৩)

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ !
ত্যজিয়াছ মর্ত্ত্যভূমি,
তবু আছ—আছ তুমি !
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।
এত রূপ গুণ ভক্তি,
এত প্রীতি আনুরক্তি—
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ !

নয়—এ মরণ নয়, দু' দিন বিরহ !
আলোকে সু-বর্ণ ফুটে,
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে ;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম—যত্ন অনাগ্রহ।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—
সেই জপ তপঃ ধ্যান,
সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ।

প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে, সতী,
উচ্চ হ'তে উচ্চতরে !
নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি !

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !
তোমারে হেরি নি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব্ব-জীবে সর্ব্ব-কালে দাও পদে স্থান ।
তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো-অন্ধকার-বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক তোমারি প্রদান ।

ভাঙ্গিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময় !
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় ।
শোকে ধূধূ হৃদি-মরু,
আছে তার কল্পতরু !
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় !

তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ, তোমারি ধরণী ;
তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতিজনা,
শোকে দুঃখে ভ্রমে কেন পরমাদ গণি !
ব্যাপি' সর্ব্ব-কাল-স্থান
তব প্রভা দীপ্যমান,
ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি !

দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন—
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে না যায় বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে না দেয়—তুমি কত যে আপন!

অনাদি অনন্ত তুমি—অসীম অপার।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার!
নিজ সুখ-দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভাল-মন্দ করিতে বিচার!

মজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখানি;
রোগে-শোকে ভাবি ডরে
জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি!
জানি,—মনঃ প্রাণ দেহ
নহে আপনার কেহ—
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী!

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময় !
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয় !
জীবন—মরণ-পানে
বহে যাক সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয় !

ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ !
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া !
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ !
এখনো সে যুক্ত-করে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ, শুভ-আশীর্ব্বাদ ।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫৭

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৪৩—১৮৯১

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

জন্ম

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ অক্টোবর (১৬ কার্ত্তিক ১২৫০) তারিখে নদীয়া জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমান যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অধীন) বাগআঁচড়া গ্রামে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তারকনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিক্ষা ঃ বিবাহ

ছয় বৎসর বয়সে গ্রামস্থ পাঠশালায় তারকনাথের হাতেখড়ি হয়। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি মাতৃহীন হন, কিন্তু মাতার অভাব তাঁহার জেঠাইমা-ই পূরণ করিয়াছিলেন। তারকনাথ পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া দশ বৎসর বয়সে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র অম্বিকাচরণের ভবানীপুরের বাসায় থাকিয়া স্থানীয় লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির স্কুলে প্রবিষ্ট হন।

ছাত্রাবস্থায় ১৪ বৎসর বয়সে তারকনাথের বিবাহ হইয়াছিল। পাত্রী—নিস্তারিণী দেবী, ২৪-পরগণার চোঁড়া-নিবাসী রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে এক দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের কন্যা।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তারকনাথ লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া চৌদ্দ টাকা জুনিয়র বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন।*

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তারকনাথ পিতার ইচ্ছানুক্রমে ডাক্তারি শিখিবার

---

* General Report on Public Instruction.. for 1863-64. Appendix C.

জন্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। মেডিক্যাল কলেজে তখন দুইটি বিভাগ ছিল : একটি বাংলা-বিভাগ, অপরটি ইংরেজী-বিভাগ। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ইংরেজী-বিভাগে প্রবেশাধিকার পাইত। তারকনাথ বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন বলিয়া বিনা-বেতনে পড়িবার অধিকার পাইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছেন,—

"আমি ও তারকবাবু যৌবনে কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতাম। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতাম, তারকবাবু মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেন। তারকবাবুকে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্য পুস্তক পড়িতে অতি অল্প সময়ই দেখিতাম। তিনি অধিকাংশ সময়েই হয় ডিকেন্সের কোন উপন্যাস, না হয় মেকলে কিম্বা গিবনের ইতিহাস পড়িতেছেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। এজন্য আমরা অনেক সময় বিদ্রূপ করিতাম, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে রাসবিহারী (স্যর রাসবিহারী ঘোষ) তারকবাবুকে বলিতেন, তুমি ডাক্তার হবে, তোমার ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ার দরকার কি? তারকবাবু বলিতেন, সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা ভাল। এই কথা শুনিয়া রাসবিহারী ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি বামুনের ছেলে তোমাদের কাজ হচ্চে তিনটি—উনুনে ফুঁ, কানে ফুঁ, ত শাঁকে ফু।"*

পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তারকনাথ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এল্. এম্. এস. উপাধি লাভ করেন।

সরকারী চাকুরী

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তারকনাথ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে অতিরিক্ত অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন-রূপে সরকারী কর্ম্মে

* শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী : "তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়"—'সাহিত্য,' শ্রাবণ ১৩২৯।

যোগদান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল তিনি এই কর্ম্ম খ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ পদে কোথায় কত দিন কাজ করিয়াছিলেন, সরকারী বিবরণের সাহায্যে তাহার হিসাব দিতেছি :—

স্থান	পদ	নিয়োগকাল
কলিকাতা	ইন্‌স্পেকৃটর-জেনারেল অব সিবিল হস্‌পিটালের নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত (Supernumerary) অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন (৩য় শ্রেণী) ···	৬ই জুলাই ১৮৬৯
দার্জ্জিলিং	দার্জ্জিলিং-কেন্দ্রের ডেপুটি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ভ্যাক্‌সিনেশ্যন্ (অস্থায়ী) ···	১৯ জুলাই ১৮৭১
	ডেপুটি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ভ্যাক্‌সিনেশ্যন্ ···	৩০ অক্টোবর ১৮৭২
জলপাইগুড়ি	অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন (৩য় শ্রেণী) ডিসপেনসরি ···	১৪ আগষ্ট ১৮৭৭
যশোহর	ঐ (৩য় শ্রেণী) দাতব্য ঔষধালয় ···	২৮ মে ১৮৭৮
ঐ	ঐ (২য় শ্রেণী) ···	১৩ নবেম্বর ১৮৭৯
শাহাবাদের বক্‌সার	ঐ ঐ বক্‌সার সেনট্রাল জেলের চিকিৎসক ···	১৪ জানুয়ারি ১৮৮২
ঐ	ঐ (১ম শ্রেণী) ঐ ···	১৬ মে ১৮৮৭ ।*

* History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal. July 1891.

'স্বর্ণলতা' রচনা

তারকনাথ যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় (ইং ১৮৬৫)। 'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স। বাস্তবপ্রিয় তারকনাথ রোমান্স পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিম বাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? এ ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। বিষ্ণুশর্ম্মা তো একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটি ছিল বলিয়াই লঘুপতনক ন্যায়-শাস্ত্রের বিচার করিতেছে এবং চিত্রগ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিম বাবু আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বের এক যবনতনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন।"—'স্বর্ণলতা,' ২য় পরিচ্ছেদ।

বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া বাঙালী সমাজের চিত্র অঙ্কনের সঙ্কল্প এই সময়ে তারকনাথের মনে উদিত হয়। এই সঙ্কল্প তিনি অদূর ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

ভ্যাক্সিনেশ্যন্‌-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে তারকনাথের কার্য্য ছিল—উত্তর-বঙ্গের জেলাগুলি পর্য্যটন করিয়া অধীন কর্ম্মচারিবর্গের কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করা। এই উপলক্ষে তাঁহাকে নানা শ্রেণীর লোকের সহিত দেখাশুনা ও মেলামেশা করিতে হইয়াছে; তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উদ্যম 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস প্রধানতঃ এই অভিজ্ঞতারই ফল। কি অবস্থায় 'স্বর্ণলতা' রচিত হয়, সে সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

> "সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিতে হইত এবং এই সময়ই স্বর্ণলতা রচিত হয়। পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী যোটে না, সুতরাং গোরুর গাড়ীই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিয়দ্দূরে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ সদ্য-নির্ম্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তার বাবু গোরুর গাড়ীর তলায় শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া স্বর্ণলতা লিখিতেছেন। স্বর্ণলতার অধিকাংশ এইরূপে গোরুর গাড়ীর তলায় রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল।"—'দাসী', আগষ্ট ১৮৯৬।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই 'স্বর্ণলতা' রচনা শেষ হয়। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই যে বাস্তব ভিত্তির উপর গঠিত, তারকনাথের ডায়েরি বা দৈনন্দিন-লিপিতেও তাহার উল্লেখ আছে; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

Finished my tale in the evening at about 8 p. m. It was melancholy pleasure to see it completed as I was to part company with my friends for ever. Monday, 7th July, 1873.

Some characters of my novel are from the real life...My friend Suresh and Paresh two figures under the name of Ramesh and Debesh. 11th July 1873.*

তারকনাথ ও 'জ্ঞানাঙ্কুর'

'স্বর্ণলতা'র প্রথম খণ্ড শ্রীকৃষ্ণ দাস-সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রের প্রথম বর্ষে (আশ্বিন ১২৭৯—ভাদ্র ১২৮০, ইং ১৮৭২-৭৩) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; রচনায় লেখকের নাম ছিল না। 'জ্ঞানাঙ্কুর' রাজশাহী বোয়ালিয়া হইতে প্রকাশিত হইত; তথায় শ্রীকৃষ্ণ দাসের সোনা-রূপার দোকান ছিল। তারকনাথের প্রস্তাবেই তিনি পত্রিকাখানি প্রচার করিয়াছিলেন। প্রথম বর্ষের 'জ্ঞানাঙ্কুর' দ্বৈভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) ছিল; ইহার প্রথম দুই সংখ্যা স্থানীয় মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। তারকনাথের নিয়মিত সাহায্য ও সুপরামর্শে 'জ্ঞানাঙ্কুর' অচিরে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। এই 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা—'বনফুল,' 'প্রলাপ' ও প্রথম গদ্য-রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল (৪র্থ বর্ষ, ১২৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য)। তারকনাথের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র জন্যই তাঁহার 'কল্পতরু' রচনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ ছিলেন তারকনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু, উভয়ে একই বৎসরে এনট্রান্স পাস করেন। ১৮৭১-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রনাথ দিনাজপুরে ওকালতি করিতেন। কার্য্যব্যপদেশে দিনাজপুর যাইতে হইলে তারকনাথ অগ্রে বন্ধুকে দর্শন দিতেন। ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন দার্জ্জিলিঙ বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব বাক্‌সিনেশন আমার প্রিয় সুহৃদ্ 'স্বর্ণলতা' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা যশস্বী ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্য উপলক্ষে

* "তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়"—'সাহিত্য,' ফাল্গুন ১৩২৯।

যখন দিনাজপুরে আইসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইত। 'স্বর্ণলতা'র এক কি দুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাজসাহীর বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তারকনাথ আমাকে আপন রচনা দেখাইলেন, এবং 'জ্ঞানাঙ্কুরে' লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধের ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমি 'কল্পতরু' লিখি।...'কল্পতরু' রাজসাহী গেল, শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন; তাহার পর তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইল,—পুস্তক 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত না হইলে তারকনাথ চটিবেন, হয়ত আমিও চটিব; প্রকাশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর নিজের অপ্রিয় কার্য্য হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইলেন। এজন্য আমিও তাগাদা আরম্ভ করিলাম; প্রায় ৫।৬ মাস কি তদধিক কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, 'কল্পতরু' উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা "ব্রহ্মের" নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অভয় দিলাম, 'কল্পতরু' ফিরিয়া পাইলাম।"—'বঙ্গ-ভাষার লেখক,' পৃ. ৭৫৪-৫৫।

'স্বর্ণলতা'র কল্যাণে 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'স্বর্ণলতা'ই 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত তারকনাথের একমাত্র রচনা নহে; তাঁহার গল্প-প্রবন্ধাদি আরও অনেক রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তারকনাথ কাব্যানুরাগীও ছিলেন; ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এক সময়ে তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা তাঁহাকে আনন্দ দান করিত। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সরকারী কার্য্যে কলিকাতা হইতে বন্ধুবান্ধবহীন সুদূর প্রবাসে আসিয়া প্রথমটা তিনি নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ মনে

করিতেন। "প্রিয়জন-বিরহে তারকনাথ আলেকজাণ্ডার সেল্‌কার্কের বিজনোক্তির অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কবিতা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তারকনাথ লিখিতেছেন :—

কোথা বিজনতা তব সে মোহন বেশ—
যে বেশ ধারণ করি, কবি-চিত্ত লও হরি
এবে কেন কিছু তার নাহি দেখি লেশ ?"*

একবার তিনি বন্ধুগৃহে এক গানের মজলিসে বিদ্যাসুন্দরের "নাতনি তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচি নে" সুরে সদ্য-সদ্য একটি গান রচনা করিয়া উকীল-প্রধান শ্রোতাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। গানটি এইরূপ :—

মক্কেল তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচি নে।
পথপানে চেয়ে থাকি তবু তুই আসিস্ নে ॥
ভাবি বুঝি অন্য বাড়ী গেলি তুই আমায় ছাড়ি
আমার বুঝি উনুনে হাঁড়ি জীবনে আর চড়ে না ॥†

কল্পলতা সম্পাদন

সরকারী কার্য্যে যশোহরে অবস্থানকালে তারকনাথ নিজে 'কল্পলতা' নামে একখানি-মাসিক-পত্রিকা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ভবানীপুর হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইত। 'কল্পলতা'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস। আমরা এই মাসিক-পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখি নাই ; তবে ইহা যে তৃতীয় বৎসরেও (ইং ১৮৮৩) পদার্পণ করিয়া-

* ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা,' পৃ. ৫৮।

† শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী : "তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়"—'সাহিত্য,' ফাল্গুন ১৩২৯।

ছিল, বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত তালিকায় তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। 'কল্পলতা'য় তারকনাথের 'হরিষে বিষাদ' উপন্যাসখানি প্রথমে ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

'স্বর্ণলতা'র সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তারকনাথ আরও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির একটি কালানু-ক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনীমধ্যে সাল-তারিখযুক্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **স্বর্ণলতা** (সামাজিক উপন্যাস)। ১২৮১ সাল (২৮ এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃ. ২৭৫।

"এ গ্রন্থের কিয়দংশ প্রথম খণ্ড" (সরলার মৃত্যু পর্য্যন্ত) প্রথম বর্ষের 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে (আশ্বিন ১২৭৯—ভাদ্র ১২৮০) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পরিবর্ত্তিত আকারে পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। পুস্তকে লেখকের নাম ছিল না। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

স্বর্ণলতা। Ficta voluptatis causa sint proxima veris. HORACE. "Fictions *to please* should wear the face of Truth." "কথাপি তোষয়েদ্বিজ্ঞং যত্নসৌ তথ্যবস্তুবেৎ।" ইতি হরিবংশম্। শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। আর্য্য যন্ত্রে শ্রীসেখ আতাব আলি দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮১ সাল।

'ক্যালকাটা রিভিউ' ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—স্বর্ণলতাই বাংলায় একমাত্র খাঁটি উপন্যাস; বঙ্কিমের বইগুলি উপন্যাস নহে,—কাব্য। সমালোচনাটি এইরূপ :—

"This is the only true novel we have read in

Bengali, Babu Bankim Chandra's works being poems, not novels ; and we are therefore glad that it has passed through its third edition. Of its merits, we cannot speak too highly. In describing Bengali domestic life, in delineating real character, in sketching ordinary scenes, the author of *Swarnalata*, Babu Tarak Nath Ganguli, is without a rival among Bengali writers of fiction. He is a close observer of men and manners, and he has a faculty, which seems to be exclusively his, for working up ordinary materials into a highly effective picture. As specimens of character-painting, his *Pramada*, his *Sarala*, his *Gadadhar*, his *Nilkamal*, his *Syama*, and his *Sasankasekhara* are the best of their kind in Bengali literature. Babu Tarak Nath seems also capable of highly successful efforts at ideal representation. His *Sarala* is almost an ideal character, and his story of *Gopal* and *Swarnalata* possesses a strong ideal cast. As a painter of real ordinary life, both in its comic and in its serious and tragic side, Babu Tarak Nath is unrivalled among Bengali authors ; and we are therefore all the more desirous to read other works from his pen. We trust he will not sit quiet, but go on enriching his country's literature, and showing the strong and the weak points in the social and domestic system of Bengal in pictures as true and bright and effective as those that are collected in such abundance in the work under notice.—*The Calcutta Review*, No. CXLIX, 1882.

'স্বর্ণলতা' পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গ্রন্থকার আখ্যাপত্রে নাম প্রকাশ করেন নাই। ১২৯০ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণের পুস্তকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সমীপেষু।

প্রিয়তমেষু—

নামের ভার নাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, তবু তোমার 'স্বর্ণলতা' চতুর্থবার মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এখনকার অবস্থায় ইহা সামান্য শ্লাঘার কথা নয়। তাহার উপর ইংরেজী ধরণের প্রণয়-লীলা, চোর ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এ সকল প্রসঙ্গের ছায়াপাত বর্জ্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী তাহার অসাধারণ কোনও গুণ আছে ইহা কে না স্বীকার করিবে? বাস্তবিক স্বর্ণলতা **"স্বর্ণলতাই"** বটে।

মনে করিও না যে তোমার কাছে তোমার গ্রন্থের গুণগান করিবার জন্যই এ পত্র লিখিতেছি। যে জন্য এ পত্র লিখিতেছি, বলি—'স্বর্ণলতার' যশে তুমি যশস্বী হইয়াছ, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় দিবার জন্য এখন যে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে এ যশের ঘোষণা দেখিতে পাই, অথচ তুমি কে তাহা অনেকেই জানেন না। না জানাটা বড় অন্যায় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ ইহাতে পাপিষ্ঠের প্রলোভন; এই সে দিন বগুড়াতে এক ব্যক্তি 'স্বর্ণলতা'র যশোলাভে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে গ্রন্থকার পরিচয় দিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা আমার অসহ্য। দ্বিতীয়তঃ আমার আত্মীয় লোকের মধ্যেও কোনও কোনও ব্যক্তি আমাকে 'স্বর্ণলতা' লেখক

মনে করিয়া থাকেন। এ পরিচয়ে আমি গর্ব্বিত হইতে পারি বটে, কিন্তু যাহাতে আমার অধিকার নাই, তোমার সে গৌরব চুরি করিয়া আমি বড় হইব কেন? যাঁহাদের এ প্রকার ভ্রম আছে, তাঁহাদের ভ্রম দূর করা উচিত। তাই বলিতেছি যে তুমি আপন সম্পত্তি আপনার করিয়া লও।

আমি জানি, তুমি আমার কথা রাখিবে। জানি বলিয়া অনুরোধ করিতেছি যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রন্থে নাম যোজনা করিতে তোমার মনে যদি কোনও দ্বিধা হয়, বিজ্ঞাপন স্বরূপে আমার এই পত্রখানি গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিবে। ইতি (১২৯৫ পৌষ-অগ্রহায়ণ)

বর্দ্ধমান, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সাল। } প্রণয়গর্ব্বিত, শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় 'স্বর্ণলতা'র সাতটি সংস্করণ হইয়াছিল। ৭ম সংস্করণের প্রকাশকাল—১২ অক্টোবর ১৮৮৯।

১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস্ জে. বি. নাইট *Journal of the National Indian Association*-এ 'স্বর্ণলতা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দক্ষিণারঞ্জন রায়-কৃত ইহার ইংরেজী অনুবাদও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

২। **ললিত সৌদামিনী** (গল্প)। ১২৮৮ সাল (১৬ এপ্রিল ১৮৮২)। পৃ. ৪৪।

ইহা প্রথমে ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' প্রকাশিত হয়।

৩। **হরিষে বিষাদ** অথবা নায়ক-নায়িকাশূন্য উপন্যাস। ১২৯৪ সাল (২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ৩৩৮।

ইহার "পরিশিষ্টে" প্রকাশ:—"আমি সত্যস্বরূপ বলিতেছি যে

এ গ্রন্থে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার দুই চারিটী ঘটনা ভিন্ন সমস্তই সত্য; তবে এক জনের নামে আরোপিত হইয়াছে অর্থাৎ ভেড়ার মুণ্ড ঘোড়ায় দেওয়া হইয়াছে। যদি এ গ্রন্থের নাম পূর্ব্ব হইতে 'হরিষে বিষাদ' না রাখিতাম তাহা হইলে 'ভেড়ার মুণ্ড ঘোড়া'য় এই নাম রাখিতাম তাহার আর সন্দেহ নাই।"

৪। **তিনটি গল্প**। ললিত সৌদামিনী, সুখ ও দুঃখ এবং নিধিরাম। ১২৯৫ সাল (২৭ অক্টোবর ১৮৮৮)। পৃ. ৯৪।

৫। **অদৃষ্ট** (সামাজিক উপন্যাস)। ১২৯৯ সাল (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯২)। পৃ. ৩১৫।

ইহার দ্বাবিংশ অধ্যায় প্রথমে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ১ম বর্ষের 'মালঞ্চ' ১২৯৬ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মালঞ্চে'র প্রচার রহিত হইলে সমগ্র উপন্যাসখানি ১২৯৮ (১৫ জ্যৈষ্ঠ)—১২৯৯ (১৫ আষাঢ়) তারিখের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে' ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয়। 'অনুসন্ধানে'র পৃষ্ঠায় উপন্যাসখানি শেষ হইবার পূর্ব্বেই তারকনাথের মৃত্যু হয়। ৩০ কার্ত্তিক ১২৯৮ তারিখের 'অনুসন্ধানে' সম্পাদক লেখেন :—"...হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আমরা ভাবিয়াছিলাম 'অদৃষ্ট'ও বুঝি বা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। কিন্তু এখন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 'অদৃষ্টে'র শেষাংশ প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলাম। তারক বাবুর স্বহস্ত-লিখিত "কাপি" হইতেই ভূধর বাবু উহা আমাদিগকে প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিতেছেন।"

প্রমদাচরণ সেন-প্রবর্ত্তিত 'সখা'য় (মার্চ্চ ১৮৯১-সেপ্টেম্বর ১৮৯১) বিধিলিপি নামে একখানি উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তারকনাথের মৃত্যুতে ইহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তারকনাথের একখানি পত্র—'ভারতবর্ষ,' কার্ত্তিক ১৩২৪ দ্র°।

রঙ্গালয়ে স্বর্ণলতা

তারকনাথের জীবিতকালে কলিকাতার সাধারণ-রঙ্গালয়ে 'স্বর্ণলতা'র নাট্য-রূপ 'সরলা' প্রদর্শিত হয়। 'স্বর্ণলতা'র প্রথমাংশ অবলম্বন করিয়া রসরাজ অমৃতলাল বসু এই নাট্য-রূপ রচনা করেন। ষ্টার থিয়েটার কর্ত্তৃক 'সরলা'র প্রথম অভিনয় হয়—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রথমাভিনয় দেখিয়া সেকালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধান' ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ তারিখের পত্রে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, অভিনয় কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 'অনুসন্ধান' লেখেন :—

"ষ্টার থিয়েটারে 'সরলা'।—শুভক্ষণে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নাটকালোচনায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এত দিনে আমাদের আশা ফলবতী হইবার সূত্রপাত হইল। ষ্টার কোম্পানীও সময় বুঝিয়া—লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটক-চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়কেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না, সুপ্রসিদ্ধ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত "সরলা"-চরিত্র নাটকাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম এখন কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল। যে অভিনয় দর্শনে আত্মহারা হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও মন তন্ময়ত্বভাবে বিভোর হয়, যাহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ক্রোধ, বীভৎস প্রভৃতি রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই ত অভিনয়, সেই ত নাট্যচিত্র। উপস্থিত 'সরলা' নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা সে আশার সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিয়াছি। ইহার কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে সুখ্যাতি করিব ? সেই হিংস্র-বিষপূর্ণা

কালভুজঙ্গিনী প্রমদার,—না সেই কোমলহৃদয়া, কুটিল-সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা পতিপ্রাণা সাধ্বী দেবী-রূপা সরলার? আবার অন্য দিকে হাস্যরসের সপ্ত-সমুদ্র সেই নীলকমল, না সেই অক্ষয় গ্রন্থের অক্ষয় সৃজিতা আদর্শ-নারী শ্যামা দাসীর? এক দিকে ভ্রাতৃবৎসল বিধুভূষণ ও অন্য দিকে দানবী স্ত্রীর মন্ত্রে মুগ্ধ কাপুরুষ শশীভূষণ! ফলতঃ ভালর কোলে মন্দ ও মন্দের কোলে ভাল না থাকিলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয় না। ঘটনা-স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়কে উদ্বেল করিতে না পারিলে নাটক হয় না; আর তাহা অভিনয় করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থে তাহা প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আমরা এই অভিনয় দেখিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। আবার সময়ে সময়ে হাসিতে হাসিতেও পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সেই 'ডিডি—ডিডি ঐ চল্লে' গদাধরের উক্তি এখনও আমাদের কর্ণে যেন লাগিয়া রহিয়াছে। আর—সেই সরলার মর্ম্মভেদী শেষ দৃশ্য; সেই দৃশ্য অনেক দিন স্মৃতি-পটে বিরাজ করিবে। শিশু গোপালের "মা আমার খিদে পাই নি, তুই কাঁদিস্ নে" সেই মর্ম্মস্পর্শী উক্তি বড়ই স্বাভাবিক। ফলতঃ অভিনয়ে আমরা নিন্দার বড় কিছুই দেখিতে পাই নাই; যদি বা কিছু হইয়া থাকে, তাহা সে অপার গুণরাশির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এ অভিনয়ে, সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অভিনয়ে আমরা কায়মনবাক্যে কোম্পানীর মঙ্গল প্রার্থনা করি। আরও আমরা প্রার্থনা করি, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" যে বঙ্গবাসীর মূলমন্ত্র সেই অধঃপতিত বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে যেন এক একবার 'সরলা'র অভিনয় দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য বুঝিয়া আসেন।"

'স্বর্ণলতা'র নাট্য-রূপ সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"এই সরলা নাটকের অভিনয় নাট্যজগতে একটা যুগান্তর আনে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ধরণের সামাজিক নাটক বাংলার কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। সরলার অভিনয় প্রায় এক বৎসর সমান ভাবেই চলিয়াছিল, এবং ষ্টার-সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।" (পৃ. ১১২)

"এ পর্য্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যত উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ভিন্ন কোন উপন্যাসকেই দর্শকগণ তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই—যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।" (পৃ. ১৪৯)

পত্নীবিয়োগ ঃ মৃত্যু

শেষ-জীবনে তারকনাথ স্ত্রীপুত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া বক্সারে বাস করিতেছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়।

"তারকনাথ 'স্বর্ণলতা'তে বিধুভূষণের যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন সেই চিত্র তাঁহার গৃহে ফুটিয়া উঠিল। তারকনাথের পত্নী সুন্দরী ছিলেন না বলিয়া তারকনাথ কোনো দিন তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। এবং অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে দেশে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। বহুদিন পরে বক্সারে তাঁহাদের মিলন হইয়াছিল। কিন্তু অভাগিনী সরলা যেমন বিধুভূষণকে দেখিবার জন্য প্রাণ ধারণ করিয়া ছিল তেমনি তারকনাথের পত্নী অল্পকাল বক্সারে বাস করিবার পর পতিপুত্র পশ্চাতে ফেলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহার পর তারকনাথের পিতৃবিয়োগ হইল। মানসিক

অবসাদ দূর করিবার নিমিত্ত তারকনাথ পুনরায় সুরার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।" (ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা', ১৩১৭ সাল, পৃ. ৫৯)

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে পক্ষাঘাত রোগে তারকনাথের মৃত্যু হয়। বক্সারের বিখ্যাত রামরেখাঘাটে তাঁহার নশ্বর দেহ বিলীন হইয়াছে।

তারকনাথ সদাপ্রফুল্ল, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন—সর্ব্বোপরি ছিলেন রহস্যপটু। প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন :—

"চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। কেহ এ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—"ক্ষেপেছ ; বুড়ো বয়সে কি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তৈয়ারি ক'রে যাব?" মুগ্ধবোধ ব্যাকরণটা কি রকম, জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া আওড়াইতেন :—

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া॥

তিনি বড় বড় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অপেক্ষা সামান্য বেতনভোগী কেরাণী প্রভৃতির প্রতি সমধিক অনুরক্ত থাকিতেন। বলিতেন, "ডেপুটি, মুনসিফ্, সবজজ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বড় অহঙ্কারী। 'হরিষে বিষাদে' ডাক্তার বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রিতা মহিলা-মহলে এক কোন্দল বাধিয়াছে। মুনসিফ্ বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন,—ডেপুটি আবার হাকিম ; আরসুলা আবার পাখী—আ আমার পোড়া কপাল!" ('দাসী', আগষ্ট ১৮৯৬)

তারকনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলালে'র সমালোচনা করিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্যারীচাঁদ চরম দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন; কারণ, তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙালী লেখক, যিনি বৈদেশিক বা ভিন্ন-ভাষার সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতেই রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র সামাজিক চিত্র মাত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, উপন্যাস রচনা করেন নাই। স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে উপকরণ লইয়া প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার 'স্বর্ণলতা'ই বাংলা দেশের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এই একটি মাত্র উপন্যাসের দ্বারাই তারকনাথ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় কবি গ্রে যেমন তাঁহার বিখ্যাত 'এলিজি' কাব্যের সাহায্যে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে চিরদিনের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তারকনাথও তেমনি তাঁহার 'স্বর্ণলতা'র সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইটিই তাঁহার প্রথম রচনা। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার পরবর্ত্তী আর কোনও রচনাই স্থায়ী গৌরব লাভ করিতে পারে নাই।

'স্বর্ণলতা' দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালী সমাজকে হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে, সমাজের অনেক গ্লানি ও কালিমা দূর করিবার সহায় হইয়াছে। সেকালের ঈর্ষাদিগ্ধ কলহপরায়ণ কুসংস্কারমণ্ডিত সমাজের এমন বাস্তব জীবন্ত চিত্র আর কেহ তেমন ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ তাঁহার জীবনীর মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়—তিনি তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন হইতে এই উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। যাহা দেখিয়াছিলেন, যথাযথভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার

আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভা তাঁহার ছিল। 'স্বর্ণলতা'য় বাস্তব অভিজ্ঞতার এই সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই বাংলা দেশ সরলার সুখ-দুঃখে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, 'স্বর্ণলতা'র যাবতীয় চরিত্রকে বাস্তব ও জীবন্তজ্ঞানে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল; আজও পর্য্যন্ত গদাধরচন্দ্র ও নীলকমল আমাদের প্রিয় পরিচিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াই আছে। এই বাস্তবমুখিতার জন্যই 'সরলা' নাটক দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছিল। তারকনাথের পর আরও অনেকে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী সমাজের চিত্র সাফল্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু 'স্বর্ণলতা'র গৌরবকে কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫৮*

কামিনী রায়

১৮৬৪—১৯৩৩

কামিনী রায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৫৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৭১
মূল্য—১·০০ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১.—২০।৯।১৯৬৪

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কামিনী রায়ের জীবদ্দশায়, ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় "আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী" নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ইহা সম্ভবতঃ সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা। ইহা হইতে কামিনী রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্য-পরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেন। কামিনী দেবীর পিতামহ ও পিতামহী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তাঁহাদের পুত্রের ও কিয়ৎ পরিমাণে পৌত্রীর জীবনে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।...

কামিনীর চারি বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাতার নিকটেই তিনি বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ ও শিশুশিক্ষা ২য় ভাগ শেষ করেন। দেড় বৎসর ধরিয়া শিশুশিক্ষাখানি ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে বইখানি আদ্যোপান্ত তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।...

স্কুলে আসিবার কিছু দিন পরেই আপার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইলেন। পিতা তাঁহাকে গণিত এমন সুন্দর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে সময়ে কেহই গণিতে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের গণিতের শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ বসু তাঁহাকে গণিতের পারদর্শিতার জন্য

লীলাবতী আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময় কামিনীর পিতা জলপাইগুড়ির মুন্সেফ। পিতা চিরকালই অধ্যয়নশীল ছিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ রুচি থাকাতে এই সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক তাঁহার পুস্তকাগারে ছিল। মাইনর পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে আসিয়া কামিনী সমস্ত সময়ই এই পুস্তকাগারে কাটাইতেন।

বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতাপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় ছিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কামিনী প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পদ্য রচনা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত উপহার দিলেন। তাঁহার যখন নয় বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ সবডিভিসনে মুন্সেফ হইয়া যান। সে সময়ে সে স্থানে যাইতে হইলে কতকটা পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত; সপরিবার তথায় যাওয়া সুবিধাজনক নহে বলিয়া স্ত্রী কন্যাগণকে কেশব বাবুর ভারতাশ্রমে রাখিয়া পিতা একাই কর্ম্মস্থানে গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে কামিনী [মিস এক্রয়েড-প্রতিষ্ঠিত] হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার হন। ছয় মাস কাল এখানে থাকিয়া তাহার পর আবার পিতার কর্ম্মস্থান মাণিকগঞ্জে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পরবর্ত্তী দেড় বৎসর কাল পিতাই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রতি দিন সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল, না হয় অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ কন্যার পাঠের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; *Morning & Evening Meditations* নামক পুস্তক

হইতেও প্রতি দিন একটি করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতে দিতেন। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর পড়িতেন, কন্যাকেও সেগুলি পড়াইতেন। ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল সব বিষয়ই নিজেই পড়াইতেন। বার বৎসর বয়সের সময় আবার কামিনীকে বোর্ডিঙে পাঠান হইল। স্কুলে পাঠাইবার সময় পিতা কন্যাকে বলিয়া দিলেন যে, সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে, "My life has a mission."

ষোড়শ বর্ষে [১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে] কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাই দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর দুই বৎসর পড়িয়াই [১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে] F. A. পরীক্ষা দেন এবং [দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া] সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আবার দুই বৎসর পরে [১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে] B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় ক্লাস অনার পাইয়াছিলেন।...

১৮৮৬ সালে কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রণীত 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ সালে বাহির হয়।...কোন সমাজের কোন দিক্ই কামিনীর ভাল করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা ঘটে নাই। সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম। তাঁহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য-জগৎ হইতে লব্ধ ও কল্পনা-প্রসূত। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি পুরাতন ছাঁচে ঢালা হইতে পারে নাই।

১৮৯৪ সালে ষ্ট্যটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। ইনি বহুপূর্ব্ব হইতেই কামিনীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজীতে তাহার এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। বিবাহের পর কামিনীর কেবল একখানি পুস্তক 'গুঞ্জন' বাহির হইয়াছে। কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার কোন বন্ধু অনুযোগ করাতে, কামিনী তাঁহার সন্তানগুলিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "এইগুলিই আমার জীবন্ত কবিতা।" স্বামিসেবা, গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালনই তাঁহার নিকট পত্নী ও জননীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতেই তাঁহার সমুদয় অবসর ও শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে।"

কামিনী রায়ের সুখের সংসারে সহসা শোকের গভীর ছায়া পড়িল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামীকে হারাইলেন। ইহার চারি বৎসর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোকেরও মৃত্যু হয়। আঘাতের পর আঘাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত শোক-দুঃখের মধ্যেও তিনি সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হন নাই। শেষ জীবনে তিনি জনহিতকর কার্য্যে—বিশেষ করিয়া নারীকল্যাণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ (১১ আশ্বিন ১৩৪০) তারিখে তিনি পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

সাহিত্য-সেবা

কামিনী সেন আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "সুখ" নামে সুপরিচিত কবিতাটি এন্ট্রান্স পরীক্ষা

দিবার ছয় মাস পূর্ব্বে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রচিত হয়। পর-বৎসর তাঁহার পিতা মেদিনীপুরে বদলি হন। এই সময়ে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র 'মেদিনী'তেই বোধ হয় তাঁহার রচনা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—

"'মেদিনী' নামে মেদিনীপুরে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। পিতা তাহার জন্য আমাকে কবিতা দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে "প্রার্থনা" ও "উদাসিনী" শীর্ষক দুইটি কবিতা দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও 'আলো ও ছায়া'য় স্থান পায় নাই।...'আলোচনা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রসন্নময়ী দেবীর লিখিত "কেন মালা গাঁথি?—কুমারীর চিন্তা" শীর্ষক কবিতা পড়িয়া আসিয়া পরদিন "সঞ্জীবনী মালা" লিখি। প্রসন্নময়ী প্রবীণা বিবাহিতা—কুমারীর চিন্তা লিখিলেন, আমি কুমারী হইয়া প্রবীণার মত তাহার উত্তর দিলাম! এ এক তামাসা!"* ('বঙ্গের মহিলা কবি', পৃ. ৮১)

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কামিনী সেনের 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। পুস্তকে রচয়িত্রী-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, "প্রথম জীবনে, কেবল প্রতিকূল সমালোচনা বা উপেক্ষার ভয়ে নহে, এক দারুণ লজ্জাবশতঃই আপনার নিভৃত চিন্তাগুলি অবগুণ্ঠন-মুক্ত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম না। সেই লজ্জা ও ভীরুতা দূর করিবার জন্য আমার নাম, ধাম ও নারীত্ব গোপন রাখিয়া,

* 'নীহারিকা'-রচয়িত্রীর (প্রসন্নময়ীর) রচনাটি ১২৯২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা (ইং ১৮৮৫) 'আলোচনা'য় প্রকাশিত হয়। উত্তরে কামিনী সেন পরবর্ত্তী ভাদ্র-সংখ্যা 'আলোচনা'য় "জনৈক বঙ্গ মহিলা" এই নামে "কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর? (সন্ন্যাসিনীর উক্তি)" লিখিয়াছিলেন; ইহাই "সঞ্জীবনী মালা" নামে 'আলো ও ছায়া'য় মুদ্রিত হইয়াছে।

কোন পূজনীয় পিতৃবন্ধু কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 'আলো ও ছায়া'র পাণ্ডুলিপি লইয়া যান" ('অম্বা': নিবেদন)। হেমচন্দ্রের লিখিত ভূমিকা সহ পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় হেমচন্দ্র লেখেন :—

"এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে ; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলত বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।

কবিতাগুলি আজকালের 'ছাঁচে' ঢালা।...বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা, এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর, বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।"

'আলো ও ছায়া'য় এমন কোন কোন কবিতা আছে, যাহা বিষয়গৌরবে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বগামী কবি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :

"আমার মনে হয় আমি কিছু অকাল-পক্ক ছিলাম। কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা শীঘ্র বাড়ে, তাহা শীঘ্রই নষ্ট হয়, প্রকৃতির মধ্যে ইহা সর্ব্বদাই দেখি। অশ্বত্থ বটাদি বনস্পতি ধীরে বাড়ে, যত দীর্ঘায়ু হয়, লাউ কুমড়া শশা অন্য শাকাদি সে রকম হয় না। দু দিনে বাড়ে দু দিন বাদে মরে। .যে সব ছেলে precocious তাহাদের মধ্যে কেহই বড় হইয়া বড়লোক হয় না। আমার মধ্যেও একটা precocity

ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি দেখা গেল না। অবশ্য সারাজীবন কতকগুলি প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে। সাহিত্যের সাধনা ও অনুশীলনের সুযোগ ঘটে নাই। মনের জড়তাও ছিল।"—'বঙ্গের মহিলা কবি', পৃ. ৮৩-৪।

'আলো ও ছায়া' অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা লাভ করিল; কবির নাম বেশী দিন গোপন রহিল না। কাব্যখানি সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। অতঃপর মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রীর রচনা মাঝে মাঝে আমাদের নজরে পড়ে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' প্রকাশিত হইলে, উহার প্রথম বর্ষে (ইং ১৮৯০) কামিনী সেনের "যমুনা-কল্পনা" ও চতুর্থ বর্ষে (ইং ১৮৯৩) "ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ" মুদ্রিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল; তিনি মহিলা-কবিদের শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইলেন।

শেষের দিন সমীপবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া কবি তাঁহার প্রকাশিত অপ্রকাশিত বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি কোনরূপ নির্ব্বাচন না-করিয়াই 'দীপ ও ধূপ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার যশ ক্ষুণ্ন হইতে পারে—কেহ কেহ এরূপ অনুযোগ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন:—

"যে যাত্রার পর প্রত্যাবর্ত্তন নাই, তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া আছি; বাছাবাছির দিকে মন দিতে পারিতেছি না। দেশান্তরে যাইবার সময় কেহ যেমন বহু দিনের সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজের সখের জিনিষ প্রতিবাসীদের মধ্যে বিলাইয়া যায়, তাহাদের দামের কথা ভাবে না, অন্ততঃ কিছুদিন কাজে আসিবে বা ভাল লাগিবে এই মনে করিয়াই খুশী হয়, আমার এই কবিতাগুলিও সেই ভাবেই দিয়া আমি খুশী।"

যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই,
বুঝি না জমেছে গীত যত ;
কি যে তার দামী, কি যে খেলো,
কি যে শুধু কথা এলোমেলো,
কতটুকু প্রাণহীন কতটুকু বাঁচিবার মতো। ("অনির্ব্বাচন")

সাহিত্যক্ষেত্রে সম্মান

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় 'জগতারিণী স্বুবর্ণ-পদক' দান করিয়া কামিনী রায়কে সম্মানিত করেন। ১৯৩০ সনের ২-৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত ১৯শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে তিনিই সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও তাঁহাকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

রচনাবলী

কামিনী রায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। বন্ধনীমধ্যে সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **আলো ও ছায়া** (কাব্য)। ইং ১৮৮৯ (১ নবেম্বর)। পৃ. ১৬৮।

ইহার পরিশিষ্ট ভাগে দুইটি খণ্ড কাব্য—মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক মুদ্রিত হইয়াছে ; ইহা কবির কোন অজ্ঞাতনামা সতীর্থকে উৎসর্গীকৃত। এই সতীর্থ—মিসেস কুমুদিনী দাস, পরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল।

২। **নির্মাল্য** (কাব্য)। ? (১ এপ্রিল ১৮৯১)। পৃ. ৮০।

"গত দশ বৎসরের মধ্যে রচিত আমার কতগুলি কবিতা আলো ও ছায়াতে প্রকাশিত হইবার অযোগ্য বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উজ্ঝিত হইয়াছিল। সেইগুলির সহিত দুই চারিটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করা গেল।"

৩। **পৌরাণিকী** (কাব্য)। ১৮১৯ শক (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ৬০।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় সমালোচিত। সূচী:—একলব্য, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ, রামের প্রতি অহল্যা।

চতুর্থ সংস্করণের পুস্তকে (ইং ১৯২২) "যযাতি দেবযানী" নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৪। **গুঞ্জন** (শিশুরাজ্যের কবিতা)। ১৩১১ সাল (১৫ মে ১৯০৫)। পৃ. ৬৬।

৫। **ধর্ম্মপুত্র** (গল্প)। ১৩১৪ সাল (১৫ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ৪২।

"কাউণ্ট টলষ্টয় প্রণীত [Godson] গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনুবাদিত।"

৬। **অশোক-স্মৃতি** (জীবনী)। (২ জুন ১৯১৩)। পৃ. ৩২।

৭। **শ্রাদ্ধিকী** অর্থাৎ শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কতিপয় সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। ইং ১৯১৩ (৪ জুন)। পৃ. ১০৩।

ইহাতে কবির পিতা—চণ্ডীচরণ সেনের জীবনচরিতও আছে।

৮। **মাল্য ও নির্ম্মাল্য** (কাব্য)। ইং ১৯১৩ (২৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৬০।

৯। **অশোক-সঙ্গীত** (সনেটগুচ্ছ)। ইং ১৯১৪ (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫৮।

"অশোক-সঙ্গীত শোকার্ত্ত হৃদয় হইতে উত্থিত।"

১০। **অম্বা** (নাট্যকাব্য)। ইং ১৯১৫ (৮ এপ্রিল)। পৃ. ১০৪।

ইহা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

১১। **সিতিমা** (গদ্য নাটিকা)। ইং ১৯১৬ (১৭ এপ্রিল)। পৃ. ৬২।

১২। Some Thoughts on the Education of our Women. 1918, p. 27.

১৩। **বালিকা শিক্ষার আদর্শ**—অতীত ও বর্ত্তমান (নিবন্ধ)। ? (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ৩৫।

১৪। **ঠাকুরমার চিঠি** (কবিতা)। ? (১৭ মে ১৯২৪)। পৃ. ২৩।

১৫। **দীপ ও ধূপ** (কাব্য)। ইং ১৯২৯। পৃ. ১৭৬।

"এই পুস্তকে কবির কতকগুলি অপ্রকাশিত 'সনেট' ব্যতীত, ইং ১৮৯৩ সন হইতে বর্ত্তমান ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত লিখিত তাঁহার অধিকাংশ খণ্ড কবিতা পাওয়া যাইবে।...'ঠাকুরমার চিঠি' ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও 'দীপ ও ধূপ' মধ্যে পুনরায় নিবদ্ধ হইল।"

১৬। **জীবনপথে** (সনেটগুচ্ছ)। ইং ১৯৩০। পৃ. ৭০।

"...অপ্রকাশিত সনেটগুলি জীবনপথে নামে প্রকাশিত হইল। ইহার অল্প কয়েকটি ব্যতীত আর সমস্তই অনেক বৎসর পূর্ব্বের রচনা...। ১৯১৩ সনে...প্রথম ছয়টি সনেট 'সাহিত্যে' ছাপাইতে দিয়াছিলেন।" —প্রকাশক।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

কামিনী রায়ের অনেক রচনা—গদ্য ও পদ্য মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় পড়িয়া আছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

বঙ্গ : ফাল্গুন ১৩২৭—প্রাচীন ও নবীন

নব্যভারত : বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২—সুপ্তশক্তির জাগরণ (প্রবন্ধ)
আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩২—মা (চিত্র)
মাঘ-চৈত্র ১৩৩২—অশ্বিনীকুমার দত্তের বিশিষ্টতা (প্রবন্ধ)

প্রবাসী : বৈশাখ ১৩৩৭—কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির (অভিভাষণ)
শ্রাবণ ১৩৩৭—বিদায়ের অর্ঘ্য
পৌষ ১৩৩৮—শ্রীহট্টে প্রদত্ত অভিভাষণ
কার্ত্তিক ১৩৩৯—সাহিত্য ও সুনীতি (প্রবন্ধ)
আশ্বিন ১৩৪০—স্বরাট্ স্বাধীন
অগ্রহায়ণ ১৩৪০—স্থবিরা ; নবীন কর্ম্মী
পৌষ ১৩৪০—রবীন্দ্র-পরিচয়
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১—বুলবুলের প্রতি

বিচিত্রা : ভাদ্র ১৩৩৭—স্বর্গীয়া বামাসুন্দরী দেবী (জীবনী)
আশ্বিন ১৩৩৭—আত্ম-ধারা
কার্ত্তিক ১৩৩৭—আজিকার মত
চৈত্র ১৩৩৭—অনির্ব্বাচন ; আমার ভাষণ

বঙ্গলক্ষ্মী : বৈশাখ ১৩৩৭—বৌ-কথা-কও
বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৯—ডাঃ কুমারী যামিনী সেন (জীবনী)
অগ্রহায়ণ ১৩৪০—সেবিকা

পত্রাবলী

আমরা কামিনী রায়ের দুইখানি পত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। পত্র দুইখানি 'হেমচন্দ্রে'র গ্রন্থকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষকে লিখিত। কি সূত্রে হেমচন্দ্রের সহিত কবির আলাপ-পরিচয় হয় এবং হেমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাই বা কিরূপ ছিল, পত্র দুইখানি হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

হাজারিবাগ
২রা মার্চ, ১৯১৮

মান্যবরেষু— ……

আপনি কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার জীবনের কথা কিছুই জানি না। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার পিতৃদেবের 'বন্ধু' ছিলেন ঠিক এ কথাও বলা যায় না। আমার পিতৃদেবের পাঠ্যাবস্থায় তিনি হেমবাবুর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য পাইয়াছেন এই কথা শুনিয়াছি।

আমি জীবনে একদিন মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। তখন 'আলো ও ছায়া' যন্ত্রস্থ।

আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে দেন এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি অবশ্য ইহাব বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি. কে. রায়কেই দেখিতে দিয়াছিলাম — কবিবর কতগুলি কবিতার উপরে 'সুন্দর' Beautiful ইত্যাদি এবং খাতার উপরে A true poet লিখিয়া দুর্গামোহন বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ছেলেটি কে হে?" দুর্গামোহন বাবু বলিলেন "ছেলে নয় মেয়ে।" তিনি অতিশয় আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমার কবিতা তাঁহার মত লোকের ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আমার ভয় ও সঙ্কোচ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন জানিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতেও আর দ্বিধা রহিল না। যখন কয়েক ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে, একদিন সকালবেলা মিসেস পি. কে. রায় (৺দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া

দিলেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কবিবরকে তাঁহারা আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি কলেজের কাজ হইতে ছুটি লইয়া তাঁহাদের রতন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আসিলাম। সেখানে হেমচন্দ্রের সহিত উমাকালী মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা আসিয়াছিলেন। কবি তাঁহার নব-রচিত গঙ্গা-স্তোত্রটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আহারের পর উমাকালী বাবু তাঁহাকে তাঁহার নিজের কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তিনি কবিতাবলী হইতে "হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে" ইত্যাদি কয়েক ছত্র পড়িয়া বলিলেন, "না, মিস সেনের কবিতা হইতে পড়ি।" তখন খুব ভাবের সহিত 'বর্ষ-সঙ্গীত' পড়িয়া শুনাইলেন।

এই দেখাসাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্নেহপূর্ণ চিঠিগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার চিঠি পড়িয়া আমার কবিতার মত আমার গদ্যরচনারও খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আসল কথা তিনি দোষ খুঁজিতেন না, গুণ খুঁজিতেন; সৌন্দর্য্য দেখিবার চেষ্টা থাকিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ ছিল বলিয়া উহাতে আমার আপত্তি হয়। তিনি সেই জন্য দ্বিতীয় বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। উহাই 'আলো ও ছায়া'র দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই বিশ্বাস।

তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত 'আলো ও ছায়া'র সমালোচনাগুলির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং কোন কাগজে সমালোচনা বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত আমাকে জানাইতেন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তিনি চিঠি লেখা কেন বন্ধ করিলেন জানি না। একবার উত্তর না পাওয়াতে আমিও আর লিখিতে সাহস পাই নাই।

'নির্মাল্য' ও 'পৌরাণিকী' প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই। হয়তো চক্ষুপীড়ার জন্যই চিঠি লিখিতে পারেন নাই।

আমি বাল্যকালে কল্পনা-জগতে, আমার দিবাস্বপ্নে তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া কল্পনা করিতাম। সত্য সত্যই তিনি আমার মানস-পিতা। কিন্তু তিনি যে আমার কবিতা পড়িবেন এবং প্রসংসা করিবেন এ কথা আমার 'নিশার স্বপ্নের'ও অগোচর ছিল। কি সূত্রে তাঁহার উজ্জ্বল নাম আমার প্রথম পুস্তকের সহিত গ্রথিত হইল মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

আমি তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, অথচ আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। তাঁহার বাক্যেই আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাই বিশ বৎসর পরে, 'আলো ও ছায়া'র ৫ম সংস্করণের সময় তাঁহার নামেই 'আলো ও ছায়া' উৎসর্গ করিলাস।"*

* ১৯০৯ সনে প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের 'আলো ও ছায়া' "পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"কে এই ভাবে উৎসর্গ করা হইয়াছে :—

বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু, ঢালে গীতধার
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী,
সেইরূপ আপনাকে লুকাইয়া রাখি'
তব স্নেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি খুলি কণ্ঠ, প্রাণ।
তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্ব্বাদ তব
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিংশতি বরষ ধরি' যেই গীতহার,
আজ লোকান্তর হ'তে তাই উপহার

আমি তাঁহার কথা লিখিতে গিয়া 'আলো ও ছায়া'র কথাই লিখিলাম। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে পারিতেছি না। সময়ান্তরে লিখিব। ইতি—

শুভার্থিনী
শ্রীকামিনী রায়

৯৮, বেলতলা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।
১১ই জুলাই ১৯২৩।

মান্যবরেষু—···

হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি, এ সকল কথা এক সময়, অর্থাৎ 'আলো ও ছায়া'তে তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকা পড়িবার পর, তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, সমালোচনা করিবার ইচ্ছা কখনও হয় নাই, এখনও হইতেছে না। পিতা মাতা বা ধাত্রীকে যেমন মানুষ চিরদিন ভালবাসে, তাহাদের গুণাগুণের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করে না, আমারও কতকটা সেই রকম।

হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনা করিয়া বর্ত্তমানে কাহাকেও তাঁহার কাব্যের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিব সে বিশ্বাস আমার নাই। যাঁহারা

লহ এ ভক্তের হাতে ;—আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা' নয় ;
বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
ভকতি-চন্দন-লিপ্ত, নব-সুবাসিত
পাবে তুমি, আশা এই। আছে আশা আর,
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার।

তাঁহার কবিতা পূর্ব্বে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ভালবাসিতেছেন। নব্যতন্ত্রের সাহিত্যবিলাসীগণ তাঁহার খুঁতগুলিই ধরিবেন এবং হয়তো গুণের যথেষ্ট সমাদর করিবেন না। সে জন্য আপনার আমার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। এক এক সময়ে এক একটা বিশেষ ধরণের লেখা সাধারণের নিকট প্রিয় ও আদরণীয় হইয়া উঠে। আজকাল রবীন্দ্র-যুগ—এ যুগে 'আর্টে'র দিকেই বিশেষ রবীন্দ্রের আর্টের দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ। কবিতার প্রভাব (effect) কানের উপর যতটা, ততটা প্রাণের উপর হয় কি না কেহ দেখে না।

রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি, নারীজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ—এ সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলা-কুশলতা (art) হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত; আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধা বুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেই জন্য ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষে কর্ণে কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গভীর সাড়া পাওয়া যায় না।

এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে যেন বক্তব্যটা স্পষ্ট

করিয়া বলিতে পারি নাই, নিজেকে ভুল বুঝাইতেছি। কেহ হয়তো মনে করিবেন আমি রবীন্দ্রনাথকে অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, গীত-রচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার লেখনীস্পর্শে শুষ্ক বিষয়ও সরস ও মধুর হয়, যাহা কিছু তাঁহার কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়, সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু গীতি-রচনায় তাঁহাকে মাপকাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব্ব-কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 'স্কুলের' প্রবর্ত্তক, তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ, সুর, নিখুঁত মিল, উপলাহত গিরি-স্রোতের কল-কল ধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানা বর্ণের ক্ষণিক খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশ এই সব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক উপাদান। এগুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানব-জীবন তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে—এবং তাহার একটা সরল সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম এবং স্পষ্টকে অস্পষ্ট ও সরলকে জটিলও হয়তো করিলাম। এইখানে অদ্যকার মত শেষ করি।

কাল চিঠিখানা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। অন্য কাজে উঠিয়া যাইতে হয়। আজ লিখিতে বসিয়া অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবুও একটা কথা বাকি রহিয়া গেল, সেটা এই, মহাকাব্য

এখন out of fashion. কবিতার গুণ দোষ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা গীতি-কবিতারই কথা।

বিনীতা

শ্রীকামিনী রায়*

'প্রভাতী'-সম্পাদক শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরীকে লিখিত কামিনী রায়ের একখানি পত্র সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। উহা এইরূপ :—

৪২ এ হাজারা রোড, বালীগঞ্জ

২২শে জুলাই, ১৯২২

মান্যবরেষু,

বৈশাখাদি তিন মাসের "প্রভাতী" সহ আপনার পত্রখানি পাইয়াছি, প্রাপ্তিস্বীকার করিতে অযথা বিলম্ব হইল, এজন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

পত্রিকা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, সুযোগ হইলে সময়ান্তরে বলিব। একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। তাহা এই যে, বর্ত্তমানে মাসিক পত্র ভরিয়া তুলিতে কবিতা ও গল্পের অভাব হয় না, বরং বাহুল্যই লক্ষিত হয়। একখানি "প্রভাতী"তে এ বিষয়ে একটী উত্তম প্রবন্ধ পড়িয়া সুখী হইলাম। বাস্তবিক কবিতা ও গল্পের সংখ্যা কমাইয়া ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রবন্ধ এবং স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনার ভাগ বাড়াইলেই পাঠকেরা অধিক উপকৃত হইবেন।······মাসিক পত্রিকার পাতা ভরাই কেবল পত্রিকা চালনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া কতটা সত্য, কতখানি সৌন্দর্য্য, কতখানি জ্ঞান এবং কতখানি আনন্দ বিতরণ করিতে পারি, প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।···

শুভার্থিনী—

শ্রীকামিনী রায়।

* পত্র দুইখানি ১৩৪২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'বিচিত্রা' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

কামিনী রায় ও বাংলা-সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-কয়জন মহিলা-কবি বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কবি কামিনী রায়ের স্থান তাঁহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিক প্রতিভার সহিত উচ্চশিক্ষার সংযোগ ঘটাতেই তাঁহার রচনা মার্জ্জিত ও শিল্পসুষমামণ্ডিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষ পাদে 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রী বাংলা সাহিত্য-সমাজে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাহা অনুমান করিতে পারিব না। কবিবর হেমচন্দ্র-লিখিত 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকাতেই সাহিত্যরসিকদের তৎকালীন হর্ষ-বিস্ময়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলিবে।

"আঁধারের কীটাণু আমরা
দু-দণ্ড আঁধারে করি খেলা,
অন্ধকারে ভেঙে যায় হাট,
জীবন ও মরণের মেলা।"

অথবা

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

বাঙালী নারীকণ্ঠে এই সরল মধুর ও বিচিত্র সুর রবীন্দ্র-প্রতিভার নব-অভ্যুদয়-যুগে বিস্ময়কর ঠেকিবার কথাই। "চন্দ্র-পীড়ের জাগরণ," "মহাশ্বেতা," "পুণ্ডরীক" প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গৃহীত চরিত্র-বিষয়ক কবিতাও বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অভিনবত্ব সঞ্চার করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কবি কামিনী রায় যে সুবিপুল সম্ভাবনার মধ্যে তাঁহার

কাব্য-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার পরবর্ত্তী কীর্ত্তি তদনুযায়ী হয় নাই। তথাপি 'আলো ও ছায়া,' 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' ও 'দীপ ও ধূপের' কবি কামিনী রায় চিরদিন সগৌরবে বাংলা-কাব্য-সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা কবির বিবিধ কাব্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

আলো ও ছায়াঃ

সুখ

গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল;
সকলি গিয়াছে—কি আছে আর?

নিবিল অকালে আশার প্রদীপ,
ভেঙ্গে চুরে গেল বাসনা যত,
ছুটিল অকালে সুখের স্বপন,
জীবন মরণ একই মত!

জীবন মরণ একই মতন,—
ধরি এ জীবন কিসের তরে?
ভগন হৃদয়ে ভগন পরাণ
কত কাল আর রাখিব ধরে'?

বুঝিতাম যদি কেমন সংসার,
জানিতাম যদি জীবন জ্বালা,

সাধের বীণাটি লয়ে থাকিতাম
সংসার আহ্বানে হইয়ে কালা।

সাধের বীণাটি করিয়া দোসর
যাইতাম চলি বিজন বনে,
নীরব নিস্তব্ধ কানন হৃদয়ে
থাকিতাম পড়ি আপন মনে।

আপনার মনে থাকিতাম পড়ে',
কল্পনা আরামে ঢালিয়া প্রাণ,
কে ধারিত পাপ সংসার ধার ?
সংসারের ডাকে কে দিত কাণ ?

না বুঝিয়া হায় পশিনু সংসারে,
ভীষণ-দর্শন হেরিনু সব,
কল্পনার মম সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত
হইল শ্মশান, পিশাচরব !

হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী
মরুভূমি মত রয়েছে পড়ে',
বাসনা-পিয়াসে উন্মত্ত মানব
আশার ছলনে মরিছে পুড়ে'।

লক্ষ্যতারা ভুমে খসিয়া পড়িল,
আঁধারে আলোক ডুবিয়া গেল,
তমস হেরিতে ফুটিল নয়ন,
ভাঙ্গিয়ে হৃদয় শতধা হ'ল।

সেই হৃদয়ের এই পরিণাম,
 সে আশার ফল ফলিল এই !
সেই জীবনের কি কাজ জীবনে ?—
 তিলমাত্র সুখ জীবনে নেই ।

যাক্ যাক্ প্রাণ, নিবুক এ জ্বালা,
 আয় ভাঙ্গা বীণে আবার পাই—
যত না—যাতনা—যাতনাই সার,
 নরভাগ্যে সুখ কখনো নাই ।

বিষাদ, বিষাদ, সর্ব্বত্র বিষাদ,
 নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব জীবন,
 যত দিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই ।

নাই কি রে সুখ ? নাই কি রে সুখ ?
 এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
 কেবলই কি নর জনম লয় ?

কাঁদাতেই শুধু বিশ্বচরিতা
 সৃজেন কি নরে এমন করে' ?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
 মানব জীবন অবনী' পরে ?

বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈস্বরে,—
 না,—না,—না, মানবের তরে

আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

কার্য্যক্ষেত্র অই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ ;
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

গেছে যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন,
স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে,
গেছে যাক্ নিবে আলেয়ার আলো,
গৃহে এস, আর ঘুর' না পাঁকে।

যাতনা যাতনা কিসেরি যাতনা ?
বিষাদ এতই কিসেরি তবে ?
যদিই বা থাকে, যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে' ?

লুকান বিষাদ আঁধার আমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত।

লুকান বিষাদ মানব হৃদয়ে
গভীর নৈশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চীৎকার,
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙ্গে না তায়

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে'?
মানবের মন এত কি অসার?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে?

সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়নধার?
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ ভার?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী' পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

আশার স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,

আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধার তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু তথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা-গোদাবরী-নর্ম্মদা-কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান,
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজো মূর্ত্তিমান্,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারতরমণী, সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়গাথা।

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি,—মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোট খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার।

কামনা

ওহে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।

স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,
তোমারি নির্দ্দিষ্ট করি কাজ,—
ছোট হোক্, বড় হোক্, পরের নয়নে।
পড়ুক বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ ?

তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার ;

আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যেটুকুর ভার।

ভুলে যাই আপনারে, যশঃ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

পঞ্চক

(১)

কণ্টক-কানন মাঝে তুমি কুসুমিত লতা,
কোথা হ'তে এলে ?
জনমিয়া পৃথিবীতে, অপার্থিব প্রভারাশি
কোথা তুমি পেলে ?
যে চাহে ও মুখ পানে তাহারই হৃদয় যেন
ভুলয়ে সংসার,
মোহিত নয়ন পথে যেন গো খুলিয়া যায়
ত্রিদিবের দ্বার।
স্নেহসিক্ত আঁখি তুলি মৃদু বিলোকনে যার
মুখ পানে চাও,
পূত মন্দাকিনী-নীরে হৃদয় তাহার যেন
ধুয়াইয়া যাও।
স্বরগের পবিত্রতা মানবী আকারে কি গো
গঠিলা বিধাতা ?
অথবা, চিনি না মোরা, নর মাঝে তুমি কোন
প্রবাসি-দেবতা ?

(২)

বিষাদের ছায়া সুচারু আননে,
বিষাদের রেখা আঁখির কোলে,
কুসুমের শোভা-বিজড়িত হাসি,
তাতেও যেন রে বিষাদ খেলে।
স্বচ্ছ নীরদের আবরণ তলে
নিশীথে চাঁদিমা যেমন হাসে,
তরঙ্গ আঘাতে বিকচ কমল
ডুবিতে ডুবিতে যেন রে ভাসে।
কি জানি কেমনে মৃদুল নয়ন
হৃদয়ে আমার বেঁধেছে ডোর,
শত মন্দাকিনী দেছে ছুটাইয়া
মরুভূমি সম জীবনে মোর।

(৩)

আধেক হৃদয় তার সংসারের তীরে,
আধেক নিয়ত দূর সুরপুরে রয়,
নিরাশা, পিপাসা কভু আধেকের ঘিরে,
আধ তার ভুলিবার টলিবার নয়—
সেই তার কুমারী-হৃদয়।
জানি আমি, মোর দুঃখে ঝরে আঁখি তার,
জানি আমি, হিয়া তার করুণা-নিলয়,
তাই শুধু শুধু তাই, কিছু নহে আর ;
আমার—আমার কভু হইবার নয়
সেই তার কুমারী-হৃদয়।

ধরা আর ত্রিদিবের মাঝে করে বাস,
আলো আর আঁধারের মিলন সীমায়
আধ কাঁটা, আধ তার সৌরভ সুহাস ;
কাঁটা ধরি, সে সুবাস ধরা নাহি যায়—
সেই তার কুমারী-হৃদয়।
বিহগ-বালিকা ছুটি দূর শূন্য-থরে
মুক্ত-কণ্ঠে কত গীত গাহে মধুময়,
ভুলে ভুলে ভাবি আমি, অভাগারি তরে
বিষাদের মৃদু স্রোতঃ তার সাথে বয়,
আধেক আমারি সেই কুমারী-হৃদয়।

(৪)

এত কি কঠিন তব প্রাণ ?
তোমারে আপনা দিয়া, অতি তিরপিত হিয়া
আমি তো চাহি না প্রতিদান।
দূরে রও, ঊর্দ্ধে রও, দেবী হয়ে পূজা লও,
পূজিবার দেব অধিকার ;
তার বেশী চাহি নাই, তাও কেন নাহি পাই,
তাও কেন অদেয় তোমার ?
শোন্ বালা, বলি তোরে— সুদূর গগনক্রোড়ে
অই যে রয়েছে ধ্রুবতারা,
ওর পানে চেয়ে চেয়ে দুস্তর সাগর বেয়ে
চলে যায় দূরযাত্রী যারা ;
মানবের দৃষ্টি আসি, তারকার আলোরাশি,
এতটুকু করে না মলিন,

তারা সে তারাই রয়, তাহারে নেহারি, হয়
দৃষ্টিবান্ দিগ্‌ভ্রান্ত দীন।
তুমি তারকায় চেয়ে লক্ষ্য পানে যাবে বেয়ে
এই শুধু অভিলাষ যার,
না দেখায়ে আপনারে আর কাঁদা'ও না তারে
তার পথ ক'র না আঁধার।

(৫)

দেখি আমি মাঝে মাঝে,
শুনি এ করুণ গান,
গলি আসে আঁখি প্রান্তে,
করুণা-কোমল প্রাণ ;
নিষাদের বংশীরবে
মুগ্ধা হরিণী সম,
অসতর্ক ধীরে ধীরে
সন্নিহিত হয় মম।
চিতে নাহি লয় মোর
বিঁধিতে বাঁধিতে তারে,
তারে যে এ গীত মোর
মুহূর্ত্ত ভুলাতে পারে ;
ভুলে যে সে কাছে আছে,
জেনে যে সে চলে যায়,
পূর্ব্বকৃত তপস্যার
ফল বলি মানি তায়।
এ লোকে একণ্ঠ মম
নীরব হইবে যবে ;

দু' চারিটি গান মোর
হয় তো বা মনে রবে ;
হয় তো অজ্ঞাতসারে
গায়কে পড়িবে মনে ;
হয় তো বা ভুলে অশ্রু
দেখা দিবে দুনয়নে ;
তা হ'লেই চরিতার্থ
জীবন—জনম—গান,
তাহাই যথেষ্ট মম
প্রণয়ের প্রতিদান।

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ

অন্ধকার মরণের ছায়
কত কাল প্রণয়ী ঘুমায় ?—
চন্দ্রাপীড়, জাগ এইবার।
বসন্তের বেলা চলে যায়,
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গায়,
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।

মাস, বর্ষ হ'ল অবসান,
আশা-বাঁধা ভগন পরাণ
নয়নেরে করেছে শাসন,
কোন দিন ফেলি অশ্রুজল,
করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—
এই তার আছিল যে পণ।

আজি ফুল মলয়জ দিয়া,
শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর হিয়া,
পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে ;
নবীভূত আশারাশি তার,
অশ্রু মানা শোনে নাকো আর—
চন্দ্রাপীড়ি. মেল আঁখি এবে।

দেখ চেয়ে, সিক্তোৎপল দুটি
তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি,
যেন সেই নেত্র-পথ দিয়া,
জীবন, তেয়াগি নিজ কায়,
তোমারি অন্তরে যেতে চায়—
তাই হোক্, উঠ গো বাঁচিয়া।

প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড়, ঘুমা'ও না আর—
কাণে প্রাণে কে কহিল তার,
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।

মৃত্যু-মোহ অই ভেঙ্গে যায়,
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ দরশন ;
একদৃষ্টে কাদম্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—
"এ তো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।"

নয়ন ফিরাতে ভয় পায়,
এ স্বপন পাছে ভেঙ্গে যায়,
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া।
আঁখি দুটি মুখ চেয়ে থাক্,
জীবন স্বপন হয়ে যাক্,
অতীতের বেদনা ভুলিয়া।

"আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর
জাগরণে আছে মিশি ;
"আঁধারে মুদিনু আঁখি"
আলোকে মেলিনু তায়
মরণের অবসানে
জীবন জনম পায়।"

"জীবন ?—জীবন, প্রিয় ?
নহি স্বপনের মোহে ?
মরণের কোন তীরে
অবতীর্ণ আজি দোঁহে ?"

ভালবাসার ইতিহাস

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, নব-বধুটির মত
ভালবাসা মৃদুপদে করে বিচরণ,
পশিলে আপন কাণে আপনার মৃদু গীত,
সরমে আকুল হ'য়ে মরে সে তখন ;

আপনার ছায়া দেখি দূরে দূরে সরি যায়,
অযুতে অযুত ফুল ফুটে তার পায় পায়!

শূন্য আলয়ের মাঝে উদাস উদাস প্রাণ,
কাঁদে সদা ভালবাসা, কেহ নাহি তার,
কেহ তার নাহি ব'লে সকরুণ গাহে গান;
সে যে গেঁথেছিল এক কুসুমের হার,
মাঝে মাঝে কাঁটা, তার কেমনে জড়ায়ে গেছে,
টানিয়া না ফেলে কাঁটা, মালাগাছি ছেঁড়ে পাছে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার ফুরায়েছে আঁখিজল,
ভালবাসা তপস্বিনী কাঁদে না কো আর;
বিষাদ-সরসে তার ফুটিয়াছে শতদল,
শারদ-গগনভরা কৌমুদীর ভার;
নলিনী-নিশ্বাস-বাহী সুমধুর সান্ধ্য বায়,
দেখিতেছে ভালবাসা—কে যেন মরিয়া যায়।

কে যেন সে মরে গেছে, তার শ্মশানের 'পরে
উঠিয়াছে ধীরে ধীরে চারু দেবালয়,
বিশ্বহিত পুরোহিত নিয়ত ভকতিভরে
পূজিতেছে বিশ্বদেবে; ত্রিভুবনময়
বিচরিছে ভালবাসা, স্বাধীনা, আননে তার,
দিব্য প্রভা, কণ্ঠে দিব্য সঙ্গীতের সুধা-ধার

মাল্য ও নির্মাল্য:

হাত

দুখানি সুগোল বাহু, দুখানি কোমল কর,
স্নেহ যেন দেহ ধরি সেথায় বেঁধেছে ঘর,

রূপ নাকি কাছে টানে, গুণ বেঁধে রাখে হিয়া,
আমারে সে ডাকিতেছে ছোট হাতখানি দিয়া
এ দুখানি শুভ্র বাহু মালা করি পরি গলে,
এ হাত উঠাবে স্বর্গে, ডুবাবে বা রসাতলে!

পদধ্বনি

১

চারি দিকে বাজে পদধ্বনি,
বার বার চমকে হৃদয়,
কখন বা আবরি নয়ন,
প্রত্যাশার কি জানি কি হয়!
মুখে বলি, 'সে তো আসে নাই,'
মন বলে "বুঝি আসিয়াছে।"
পুনঃ ভাবি আশা রাখিব না,
নিরাশ হইতে হয় পাছে।
তাই বলি, "ভুলে আছে মোরে,"
বলি, আর প্রতীক্ষায় থাকি,
আমি তো রাখি না কোন আশা
তবুও সে দেখা দিবে না কি?
শুনিয়াছি ব্যাকুলে ডাকিলে
হৃদে যায় হৃদয়ের ডাক,
এ আহ্বান পৌঁছিয়াছে তবে,
এ বিশ্বের যেথাই সে থাক।
চারি দিকে এত পদধ্বনি,
এত লোক করে যাতায়াত,

মুখ তুলে পথ পানে চেয়ে
অধোমুখে করি অশ্রুপাত।
তার পদে সঁপিয়া জীবন
পর পদধ্বনি গোণা কাজ!
কোথা তুমি, কোথা হে অন্তক,
অন্ত কর জীবনের লাজ।

২

যেথা পদধ্বনি নাই, কোথা সেই স্থান?
সেথায় বাঁধিব আমি ঘর,
সৃষ্টির আরম্ভ হতে প্রলয় অবধি
পশে নাই, পশিবে না নর।
সেই স্তব্ধতার দেশে ফেলিতে চরণ
প্রত্যাশার লাগিবে তরাস,
এ চির বিরহ লয়ে, স্থির নিরাশায়
সেথায় করিব গিয়া বাস।
মুহূর্ত্তে উঠিছে জীয়া হিয়া মৃতপ্রায়,
মুহূর্ত্তে আবার ম্রিয়মাণ,
তার চেয়ে চিরমৃত্যু বহুগুণে শ্রেয়ঃ,
করিবে সে চিরশান্তি দান।
শব্দহীন, জনহীন, সন্ধ্যাহীন দেশে
ভুলি যাব এক চিন্তা—'ঐ আসিছে সে!'

ভালবাসা

তবে কি গো ভালবাসা বাঞ্ছিত উদ্দেশে ভাসা,
ফেলি কুল, ভুলি দিক্, গতি নিরুদ্দেশ?

প্রবৃত্তি পাষাণে ঠেকি পুণ্যের বিনাশ সে কি?
অকালে অকূলে ইহ জীবনের শেষ?
মরণসঙ্কুল ভবে লাগে ভালবাসা তবে
কোন কাজে? আছে সেথা বাসনার ক্লেশ,
নিতে মৃত্যু অভিমুখ. আছে ভাসিবার সুখ
আত্মার জড়তা. আছে কত ভীরু ভয়,
দেখায়ে সুখের লোভ, হৃদয়ে বাড়াতে ক্ষোভ
নরের দেবত্বটুকু করিবারে ক্ষয়.
বাড়াতে ধরার ভার আছে কত কিছু আর,
এই ভালবাসা পুনঃ নহিলে কি নয়?
আমি ভাবি ভালবাসা ভাল হইবার আশা,
পরের ভিতরে পেয়ে ভালর সন্ধান,
তার ভালটুকু নিয়া সঞ্জীবিত রাখি হিয়া,
আপনার ভাল যাহা সব তারে দান;
তাহারে নিকটে আনি, অথবা নিকটে জানি,
পূর্ণ করা জীবনের যত শূন্য স্থান।
তোমাদের মনে হয়. এ তো ভালবাসা নয়,
এ ভাষা সে নাহি কয়, প্রেমিক যে জন,
প্রেম শুধু কাছে টানে, ভাল মন্দ নাহি জানে,
চোখে চোখে রাখিবারে চাহে অনুক্ষণ;
সে সমস্ত দেহ প্রাণ বিনা অঙ্গীকারে দান,
সে ভীতিভাবনাহীন আত্মবিসর্জন।

পঙ্ক ও পঙ্কজ

পঙ্ক হতে যথা উঠে পঙ্কজিনী, ভুঁইচাঁপা ছাড়ি ভুঁই,
আমার হৃদয়ে মূলটুকু রাখি তেমনি উঠিলি তুই,—

তোর সাথে মোর জীবনের যোগ, তবু এক নহি—দুই।
জীবনের তব প্রথম অঙ্কুর উঠেছে আমারি দেহে,
যত দিন আছ, জীবনের মূল গুপ্ত এ আঁধার গেহে।
যত দূরে যাও আলোক সন্ধানে, বঞ্চিত হবে না স্নেহে।
তোমার সৌন্দর্য্য যবে উর্দ্ধদিকে উঠিতেছে থরে থর,
তোমার সৌরভ ছুটিছে বাতাসে, দূর হতে দূরতর,
শিকড় ক'খানি বুকে ধরে আমি পুলকিত কলেবর।
তোমারি গৌরব, আঁধার ভেদিয়া উঠেছ আলোর দেশ,
মাটিতে জনমি, বিমল শরীরে রাখ নি মাটির লেশ,—
তোমার গৌরব, আমার গৌরব ভাবি আমি নির্ব্বিশেষ।

আধ ঘুমে

... ...

মোর গান শুনিবার তরে
দাঁড়ায়ে কি আগ্রহের ভরে ?
সখা মোর অতি পূর্ণ প্রাণ
কেমনে গাহিব আমি গান ?

বুঝাইব কোন কথা দিয়া,
এ আমার সমুদয় হিয়া
তোমারে যে করিয়াছি দান,
কেমনে গাহিব আমি গান ?

কোন ভাষা করিবে প্রকাশ
এ আমার আনন্দ উচ্ছ্বাস,
মিলন মিলিত ব্যবধান,
কেমনে গাহিব আমি গান ?

এ জগতে আছে কোন লয়
ধ্বনিতে এ ব্যথা মধুময়,
এই হাসি অশ্রুর সমান,
কেমনে গাহিব আমি গান ?

যাও সখা, আগে আগে যাও,
কেন থাম, ফিরে ফিরে চাও,
থামিবার নহে তো এ স্থান—
কেমনে গাহিব আমি গান ?

করিব কি সমগ্র চরিত
পদাবলী শুদ্ধ সুললিত,
নীরবতা রাগ লয় তান ?
এমনে গাহিব আমি গান ?

জগতের আর কোন জন
করে কিবা না করে শ্রবণ,
তুমি তো করিবে অবধান—
এমনে গাহিব আমি গান।

তুমি যেন শুনে প্রিয়তম,
ভুলে যাও দীর্ঘপথশ্রম,
সম্মুখেতে হও আগুয়ান,
এমনে গাহিব আমি গান।

আকাঙ্ক্ষা

এ জীবন শুধু কি স্বপন
সবি কি গো ছায়া মাত্র সার ?

তবে কেন তবে কেন মন
কাঁদিয়া কহিছে অনিবার—
জনম লভিনু অকারণ,
সাধ এক মেটে নি আমার।
কি যেন গো কি যেন গো চাই
স্বপনের ছায়া তাহা নয়,
এত খুঁজি তবু নাহি পাই,
তারি তরে তৃষিত হৃদয়।
নিরবলম্বন সম প্রাণ
কি যেন ধরিতে সদা চায়,
পেলে যেন তাহারি সন্ধান
সুখে সুখে দিন কেটে যায়।
কি যেন করিতে চাহি আমি,
কল্পনা সে স্বপন সে নয়,
তুমি তো জানিছ অন্তর্যামী,
প্রাণ মাঝে কি যে মোর হয়,—
প্রাণে কিবা জ্বলে হুতাশন,
ভাবি যবে স্বপন মিছায়
এত দিন কাটানু জীবন,
বিনা কাজে দিন আসে যায়।
যাই করি কিছু যেন করি,
স্বপন না ভাল লাগে আর;
সাধিয়া একটি ক্ষুদ্র ব্রত
সাঙ্গ হোক জীবন আমার।

স্মৃতিচিহ্ন

ওরা ভেবেছিল মনে, আপনার নাম
মনোহর হর্ম্ম্যরূপ বিশাল অক্ষরে
ইষ্টক প্রস্তরে রচি, চিরদিন তরে
রেখে যাবে ! মূঢ় ওরা, ব্যর্থ মনস্কাম।
প্রস্তর খসিছে ভূমে প্রস্তরের পরে,
চারি দিকে ভগ্ন স্তূপ, তাহাদের তলে
লুপ্ত স্মৃতি ; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী-জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে !
মানবহৃদয়ভূমি করি অধিকার,
করেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসন,
দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সম্বল
প্রস্তরের এত বোঝা জড়ো করিবার ;
তাদের রাজত্ব হের অক্ষুণ্ণ কেমন,
কালস্রোতে ধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল !

নারীর অভিমান

বুঝিলে কি অবশেষে, অবোধ হৃদয়,
সম্পূর্ণ কাহারো নহ, কেহ তব নয় ?
কাছে থাক দূরে যাও, প্রাণ দাও, প্রেম দাও,
সে তোমারে এতটুকু করে না প্রত্যয়,
যত চল বাড়ে পথ, পুরে না কো মনোরথ,
তৃষা বাড়ে, শান্তি মরে, জনমে সংশয়।
বুঝিলে কি অবশেষে, বুঝিলে কি হায় !
কারা বলি অনুসরি চলিছ ছায়ায় ?

কখন বা সুপ্তি আসে, অসত্য বাহুর পাশে
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ভাব আপনায়,
ছুটিলে ঘুমের ঘোর, টুটে যায় বাহুডোর,
আঁধারে একলা পড়ি কাঁদ অসহায়।
বর্ষ বর্ষ হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন
একটি একটি করি করালে শ্রবণ,
সুখ দুঃখ ঊর্মিলীলা সঙ্গীতে গাঁথিয়া দিলা,
বুঝিয়াছে সে তোমার কতখানি মন ?
বিমল দর্পণ হয়ে, তার ছায়া বুকে লয়ে,
দিবালোকে সম্মুখেতে দাঁড়ালে যখন,
দেখিল সে কত বার, সে বুঝি স্বপন তার,
তাই এত শত প্রশ্ন করে অনুক্ষণ ?
আর কেন, চলে এস, কত কথা কবে ?
তোমার ফুরাবে কথা, তার প্রশ্ন রবে।
কথায় কি হবে আর, জীবন মেনেছে হার,
হিয়া নাহি অনুভবে, কথায় কি হবে ?
নিবিড় সায়াহ্ন তলে, উত্তাল সিন্ধুর জলে,
নীরব নিশীথে তুমি ভাবিছ যবে
এক হয়ে গেছ দোঁহে,—তুমি মুগ্ধ ছিলে মোহে,
অনন্ত দূরত্ব মাঝে, আর কেন তবে ?

যবে ছিল ভালবাসা

প্রাণে যবে ছিল ভালবাসা চোখে সব লেগেছিল ভালো,
ভালবাসা জীবনের মধু, ভালবাসা নয়নের আলো।
ভিতরে বাহিরে, প্রিয়, মোর কোন কিছু হয় নি বদল
তুমি প্রেম হারাইলে বলে, মোর চোখে বহাইলে জল

সর্ব্ব অস্বীকার হতে তোমা মুক্তি দিয়া, জনমের মত,
আমি যদি চলে যাই আজ, বুকে ঢেকে অতীব বিক্ষত
মুমূর্ষু আনন্দটুকু, প্রিয়, সহসা কি মুহূর্ত্তের লাগি
অতীতের প্রেমোন্মাদ তব স্মৃতিতলে উঠিবে না জাগি?
বুঝিবে না, আমি যাহা আছি, তাই আমি ছিনু চিরদিন,
বিচিত্র তোমারি প্রেমালোকে লভেছিনু মাধুরী নবীন?
আমিও যে পেরেছি দাঁড়াতে সে আলোকে কোনো শুভক্ষণে,
সেইটুকু নারীজীবনের সফলতা জানিতেছি মনে।

অশোক সঙ্গীত ঃ

(১)

হে অনাদি, হে অনন্ত, হারায়ে সন্তান
বিশ্ব হোর মাতৃহীন। শিশু বুকে ধরি,
জননী কি স্বপ্নাবেশে নিজে দেয় ভরি
মাতৃস্নেহে মহাবিশ্ব? স্নেহাসিক্ত প্রাণ,
একটি প্রদীপ যেন, একটি সে গান,
আপনি কি নয় ব্যক্ত আলোকিত করি
যা থাকে আঁধারে লুপ্ত? ব্রহ্মাণ্ড আবরি
এ কি চিতাধূম তবে দেখায় শ্মশান?
নিষ্ঠুর সৌন্দর্য্য আজ মুখে প্রকৃতির,
মমতাবিহীন হাস, উপহাস তার,
দ্বিগুণ ব্যথায় ভরে ব্যথিত হৃদয়;
শোকার্ত্ত ধূলায় যবে ঢালে অশ্রুনীর
কোথায় বহিছে ধারা সম-বেদনার,
ওহে বিশ্বরূপ দেব, ওহে সর্ব্বময়?

(২)

জানি প্রভু, দাবী মোর কিছুতেই নাই ;
যা' কিছু আমার ভাবি, তোমারি সে দান,
অযোগ্যেরে অযাচিত। তুমি শক্তিমান্
দিতে পার, নিতে পার ;—দিয়াছিলে তাই
অতুল সৌভাগ্য মম। তবু দুঃখ পাই
কেড়ে নিলে বলে' মোর,—হে ঐশ্বর্য্যবান্,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তব—প্রাণের সন্তান।
কেড়ে লবে ছিল মনে, দিলে কি বৃথাই ?
কেন এ আঁধার বক্ষঃ উজলি আশায়,
ভরালে শোকের গেহ বালককণ্ঠগীতে,
কোলে মোর মূর্ত্তিমান্ দেখালে কল্যাণ—
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে পার কি ভাষায় ?
জীবনে জানাব তাহা—আহা আচম্বিতে
ভাঙ্গিলে আনন্দস্বপ্ন হানি মৃত্যু-বাণ।

(৩)

সে যখন চলে গেল, তখন জাগিয়া
কহিল হৃদয় মোরে,—"দুদিনের তরে
এসেছিল, রে দুঃখিনি, তোর ভাঙ্গা ঘরে
দেবতা সে। দেখেও কি দেখনি চাহিয়া
তার সেই অপার্থিব প্রেমে ভরা হিয়া ?
দেছে, কভু চাহে নাই ; দুটি বাহু-করে
রেখেছে সেবায় রত ; দেখনি অধরে
ছিল কি যে প্রীতি ক্ষমা আনন্দে মিশিয়া ?

পুষ্প-জন্ম দুদিনের ; সৌন্দর্য্যে সৌরভে
সে ছিল পুষ্পের জাতি ; বহুদিন তাই
নারিলে রাখিতে তারে। আছিল সে ভাই
মহাপ্রাণ সাধুদের, ত্যাগের গৌরবে।
তোমার নিজস্ব বলি, করি অর্ঘ্য দান
তুমি দেব-অতিথির করনি সম্মান।

(৪৪)

লুকায়ে পড়িছ ধরা, ওহে বিশ্বনাথ,
সর্ব্ব পুষ্পগন্ধে, সর্ব্ব সঙ্গীতে বাদনে
জগতের, সর্ব্বরূপরসে, সর্ব্বক্ষণে ;
সর্ব্বপ্রেমে পেয়েছিনু তোমার সাক্ষাৎ
একদিন—বহুদিন। যদি বজ্রপাত
অন্ধ করে থাকে চক্ষুঃ, সমস্ত জীবনে
এনে থাকে অবশতা, বিকল এ মনে
সিঞ্চ অমৃতের ধারা, আন সুপ্রভাত
শেষ করি এ রজনী। যেন না দাঁড়ায়
ছিন্নশিরা সংশয়ের কবন্ধ-মূরতি,
সঞ্চারিয়া বিভীষিকা। আলোকে তোমার
সব অবিশ্বাস মোর যেন, লয় পায়
সকল অশান্ত চিন্তা। হে জগৎপতি,
শুনাও বচন, শক্তি দাও বুঝিবার।

(৪৫)

অন্ধকার ছায় যথা ধরণীর বুক,
তেমনি আমার বক্ষঃ ভরে বেদনায়

এই শান্ত সন্ধ্যাকালে। দূরে শোনা যায়
আনন্দ-সঙ্গীতধ্বনি, হাস্য ও কৌতুক,
নিরুৎসাহ চিত্ত মম অতি নিরুৎসুক,
খোঁজে লুকাবার স্থান, নীরবতা চায়
লয়ে তার স্মৃতিখানি। আঁধারের গায়
সে আমার স্থিরতারা চিরজাগরূক।
হৃদয়ে রেখেছি তারে তবু এ হৃদয়
কাঁদে নিত্য। এত কাছে ছিল না তো আগে?—
তবু দূরে গেছে বলি চোখে ঝরে জল।
এক পুত্র গেছে মোর, তাহে মনে হয়
হয়েছি একান্ত নিঃস্ব। আশা নাহি জাগে
আলোকিতে কর্ম্ম-পথ, দেহে দিতে বল।

(৪৬)

তবুও চলিতে হবে পথ নিরালোক,
যতনে রাখিতে হবে পৃষ্ঠে গুরুভার
যতই দুর্ব্বহ হোক, কে বহিবে আর?
তবুও খেলিতে হবে, ঢাকি গুরুশোক,
হাসিতে হইবে, মুছি অশ্রুভরা চোখ,
অপর শিশুরা মোর হাসে যত বার।
তাদেরো জননী আমি, নহি একলার,
তাদের কল্যাণ যাহে তাই তবে হোক্।
আমার দায়িত্ব যাহা আমার যা ঋণ
পালিব, শুধিব আমি।

ওহে ভগবন্,
আঁধারে ঢাকিলে মোর শেষ ক'টা দিন,

আলো দিয়াছিলে কত নাহি কি স্মরণ ?
অযোগ্যেরে অযাচিত যত দিয়াছিলে,
কি কহিব, কিছু তার যদি ফিরে নিলে ?

দীপ ও ধূপ :—

আশ্বস্ত

আমি যবে আরাধনা করি ভক্তি ভরে,
কিম্বা ভীত, বার বার ডাকি আর্ত্তস্বরে,
দেখি কোথা কেহ নাই, কাণে না শুনিতে পাই
কাহারো চরণ-ধ্বনি, খেদে অশ্রু ঝরে।
আজি গো অবশমনে মুদিয়া নয়ান,
শূন্য আকাশের তলে রয়েছি শয়ান
তৃণদলে চাপি বুক—সহসা তুলিয়া মুখ
চকিতে শিয়রে হেরি এ কার বয়ান ?
স্নেহময়ী মার বেশে কে আমার শিরোদেশে
আশীর্ব্বাদ স্পর্শ রাখি করিছে প্রয়াণ।
কাণে প্রাণে গুঞ্জরিয়া উঠে কার বাণী,
আধেক দুষ্কর বোঝা, সোজা আধখানি,
সেইটুকু মনে রেখে, গেয়ে উঠি থেকে থেকে,
মেলে কি না মেলে ছন্দ কিছুই না জানি।
এ বাণী তোমারি বাণী, আর কারো নয়,
তুমি ভয়াতুর প্রাণে দিয়াছ অভয়।
মুক্ত আকাশের তলে শয্যা পাতি দুর্ব্বাদলে
ভেবেছিনু মাতৃহীন আমি নিরাশ্রয় ;

ভেবেছিনু জীবনের নাহি কোন কাজ,
কেন মিছা গান গেয়ে পথে পাই লাজ ?
স্নেহ দিতে কেহ নাই, কার কাছে গান গাই ?-
তুমি চাহ মোর গান শুনায়েছ আজ।
হে দেবি, তোমারে আমি শুনাইব গান ?
তবে পদতলে তব দাও দীনে স্থান,
তোমার বীণার মাঝে যে সুধা-সঙ্গীত বাজে
তাহে মিলাইয়া কণ্ঠ হই ভাগ্যবান্।

অমৃতের পথে

দেখি কর্ম্মজগতের দীর্ঘ পথ দিয়া
নানা জন নানা দিকে যাইছে চলিয়া,
চাহি দূর লক্ষ্য—দূর ? সকলেরি নয় ;
চলিছে সবাই ; পথ চলিতেই হয়।
স্রোতোমুখে শূন্য তরী সে তো নাহি ভাবে
কোথা গিয়া পাবে তীর, কত দূরে যাবে।

ধনী অই চলে দৃপ্ত, মত্ত ধন-মদে,
ভাবিতেছে চির স্থির ক্ষণিক সম্পদে,
পিতার অর্জ্জিত ধন উড়ায় খেলায়,
দেয় যদি মুষ্টিভিক্ষা, দেয় সে হেলায় ;
দয়া নাহি, দায়িত্ব সে করে না স্বীকার,
সে জানে সংসারে তার নাহি কোন ধার ;
চাহে আপনার সুখ, পায় কি না পায়,
সন্ধানে ঘুরিছে তার ;—জীবন ফুরায়।

শান্ত দৃষ্টি চলে জ্ঞানী, অচঞ্চল চিতে,
খুলি গুপ্ত জ্ঞান-খনি, দিতে আর নিতে।
কেহ লয়, কেহ যায় অবজ্ঞার ভরে,—
"নাই বা চিনিল আজ, চিনিবেক পরে,"
এই বলি প্রবোধিয়া মন আপনার
চলে বিজ্ঞ, নবতত্ত্ব করিতে উদ্ধার।
কর্ম্মী চলে কর্ম্মভার আনন্দে বহিয়া;
সাধু চলে অবিচার নীরবে সহিয়া,
অপরের দুঃখতাপ করিবারে শেষ
নিজ বক্ষঃ পাতি লয় অপমান ক্লেশ;
জ্ঞান দিয়া, প্রেম দিয়া, দিয়া যেবা আর
শোধি চলে জনমের এরা ঋণভার।
ভিক্ষুক কেবলি লয় পাতি রিক্ত হাত,
পাওয়া তার অপমান, বাঁচা আত্মঘাত।

কবি সে বিশ্বের প্রাণে মিলাইয়া প্রাণ
সুখে দুঃখে সকলেরে শুনাইছে গান;
তার বুকে বাজে যাহা শুধু নহে তার,
শুনি তাহে শত প্রাণে উঠিছে ঝঙ্কার।
রুদ্রেরে সুন্দর করে, তিক্তে সুমধুর,
ব্যথারে আনন্দ, তার অন্তরের সুর,
তার অন্তরের আলো মৃত্যুমুখে পড়ি
অমৃতের জ্যোতির্মূর্ত্তি দেখাইছে গড়ি।
চলে যেন স্বপ্নাবেশে, সুপ্ত কিন্তু নহে,
অপরে যা শোনে নাই তাই শোনে, কহে—

অজানার, অনন্তের অফুরন্ত বাণী :
ধরারে সে ত্রিদিবের কাছে দেয় আনি ।

সঙ্গীতে বাদনে যারা মানব অন্তরে
স্নেহে করুণায় বীর্য্যে বৈরাগ্যেতে ভরে,
যে বৈরাগ্য ক্ষুদ্র স্বার্থ আসক্তি তেয়াগি,
অল্পে তুচ্ছি, ফিরে নিত্য ভূমানন্দ লাগি,
যে করুণা, বীর্য্যময়ী, জগতের হিতে
হেলায় আপন প্রাণ পারে বলি দিতে,
সে বৈরাগ্য, সে করুণা দু দণ্ডেরো তরে
মানব হৃদয়ে যারা সঞ্চারিত করে,
ধন্য তারা, ধন্য কণ্ঠ, যন্ত্র ধন্য হয় :
জানে কি না জানে তারা, দীন তারা নয় ।

অলস কি চিত্রশিল্পী ? আনি দেয় কাছে
অলক্ষিত যে মাধুরী বিশ্ব ভরি আছে ;
বাহিরে যা, সুদূরে যা, পৌঁছায় সে ঘরে :
বিস্মৃতেরে অতীতেরে সঞ্জীবিত করে
তুলিকায়, অস্ফুটেরে করে স্ফুটতর,
দেহে ফুটাইয়া তোলে নিভৃত অন্তর ;
ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে করে চির আয়ুঃদান,
তার চক্ষু অচক্ষুরে করে চক্ষুষ্মান্ ।
কপর্দ্দকহীন, তবু দরিদ্র সে নয়,
অন্তরে শোভার খনি যদি তার রয় ;
সেও দাতা, মানবেরে সেও দিয়া যায়,
পায় যাহা ভিক্ষা নহে, যদি কিছু পায় ।

কৃষক অজ্ঞাত গ্রামে কর্ষে ভূমি তার
দেহে সহি খর রৌদ্র ধারা বরষার ;
সে যে খাটে, শস্য কাটে, তার মাঝখানে
কি গৌরব, জানি না সে জানে কি না জানে।
মুর্খ হোক, দুঃখী হোক, নহে সে ভিখারী,
সে আমার অন্নদাতা, নিত্য উপকারী।

কেহ লেখে, কেহ খোদে, প্রাসাদ নির্ম্মায়,
খাটে কেহ ঘাটে বাটে, মোট বহি খায়,
কুম্ভকার, সূত্রধর, কামার, চামার
মাঝি মাল্লা, তাঁতি জোলা, সবাই আমার
নমস্য—সবাই মোরে কিছু করে দান,
সুখ দেয়, দুঃখ হতে করে পরিত্রাণ।
সবারে চিনি না, তবু দানের বন্ধনে
বাঁধা আছি নানা দিকে সকলের সনে।

আমি এই ধনধান্যময়ী পৃথিবীতে
আজন্ম ভিখারী রব ভিক্ষা কুড়াইতে ?
এ বিশ্বের ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যের মাঝে
বেড়াব আলস্য সুখে, লাগিব না কাজে ?
অতি দূর অতীতের চিন্তা চেষ্টা শ্রম,
জ্ঞানালোক, মানবের সভ্যতা সম্ভ্রম
সকলের ভাগ লব, দিব না কো কিছু,
ছুটিব কি চিরদিন আপনার পিছু ?

অবিচার, অত্যাচার, দারিদ্র্য যথায়
অজ্ঞান, অধর্ম্ম করে দাসত্ব প্রথায়
কঠিন শৃঙ্খলে দৃঢ়, মনুষ্যত্ব মোর
জাগিবে না ভাঙ্গিতে সে দাসত্ব কঠোর
বজ্রহস্তে ? দেহে রক্ত ছুটিবে না ধেয়ে—
মেলি আঁখি চিত্রমূর্ত্তি শুধু রব চেয়ে ?
কিম্বা স্বপ্নাবিষ্ট সম কহিব প্রলাপ,
অদৃষ্টেরে, বিধাতারে বরষিব শাপ,
তার পর ধীরে ধীরে করিব শয়ন
কোমল শয্যায় সুখে ? মুদ্রিত-নয়ন
দেখিব না চারি দিকে দৃশ্য দুঃখময়—
কে যে ব্যথা সহি দেয়, কে যে সুখে লয়
অন্ন বস্ত্র, জ্ঞানালোক, দেহের আরাম,
চলে মনুষ্যত্ব গর্ব্বে পূর্ণ সর্ব্বকাম ?

যুগে যুগে দুঃখ সহি এ নরসমাজ
লভিয়াছে যে সৌভাগ্য, যেই শক্তি, আজ
আমি বাড়াইব তারে। এই বর্ত্তমানে
আছে প্রেমী, সাধু, কর্ম্মী, শিল্পী যে যেখানে,
আছে শ্রমী, ঋজু শির নহে ভিক্ষানত,
তাহাদের সহকর্ম্মী, বিশ্বসেবা রত,
আমি দাঁড়াইব গিয়া তাহাদের পাশে।
আসুক না অপমান, তাই যদি আসে
প্রেমের, সেবার দণ্ড।

হে আমার প্রভু,
হে আমার প্রেরয়িতা, আসি নাই কভু
শুধু বহিবারে ঋণ। ওহে বিশ্বরাজ,
তব কর্ম্মচারী আমি, আছে মোর কাজ
তোমার বিপুল রাজ্যে। সুখ দুঃখ দিয়া
দিয়া জরা মৃত্যু শোক, পাঠালে বরিয়া
সেনাপতি, দুঃখ ভয় করিবারে জয়;
পলায়নে লজ্জা, দুঃখে মরণেতে নয়।
দুঃখ দেছ, মৃত্যু দেছ, দোঁহে কার রথ
চলিব আলোকে নিত্য অমৃতের পথ।

গীতস্পর্শ

যশঃ আমি চাহি নাই, চেয়েছিনু স্নেহ,
চেয়েছিনু একখানি শান্তিভরা গেহ,
নহে কলরবপূর্ণ সভা-সম্মিলনে
সহস্র চক্ষের দৃষ্টি। নীরবে, বিজনে
রচি যদি কোন চিত্র, গাহি যদি গান,
সে কেবল জীবনের দান-প্রতিদান।
পাখী যথা বনফলে পুষ্ট, মুক্তাকাশে
হরষে বিহরে, গাহে সহজ উল্লাসে,
পূর্ণ করি বনভূমি; লতিকা ফুটায়
পুষ্পরাশি প্রাণদাত্রী ধরণীর গায়,
সমীরে ঢালিয়া দেয় সৌরভ আপন,
আলোকে দেখায় বর্ণ, তারি দত্ত ধন;—

মোর গান মোর চিত্র সেইরূপ জানি ;
যদি ভাল লাগে কারো, ভাগ্য বলে মানি ;
দুঃখ নাহি মোর, যদি কেহ তুচ্ছ করে।
যার যাহা ভাল লাগে তাহা তারি তরে,
তার যোগ্য, তারি ভোগ্য। পাখা আছে যার
উড়ে সে আকাশে, মীন দেয় সে সাঁতার,
কেহ বা চলিছে দৃঢ় মাটির উপরে.
সর্ব্বত্র চলার সুখ, বিশ্ব চরাচরে
সর্ব্বত্র চলার স্থান ; বর্ণ গন্ধ গান
নানা রূপে নানা রসে জুড়াইছে প্রাণ।
আমার এ গান যদি ভাল লেগে থাকে,
হে সুহৃৎ, সাধুবাদ কোর না আমাকে।
নিভৃত অন্তরে তব আছে যেই কান
সেথায় নীরবে কত ঘুমাইছে গান,
একটি যে গীতস্পর্শে উঠেছে জাগিয়া
আমার সে গীত ছিল তাহারি লাগিয়া।

জীবন পথে :—

সহ-যাত্রা

(১)

ফুল যবে ফোটে ভরি উদ্যান, কানন,
পাখী যবে গাহে গান সহকারশাখে,
যদি ভুলাইয়া কাজ মোরে ধরে রাখে ;
যদি স্নিগ্ধ রশ্মিজালে টেনে লয় মন

জ্যোৎস্নাহীন রজনীর তারা অগণন ;
উদিয়া গগন-প্রান্তে যদি মোরে ডাকে
রাঙ্গা শশী, বনস্পতি-পল্লবের ফাঁকে
উঁকি দিয়া, আজন্মের বন্ধুর মতন,—
মোরে সখে দিও ছুটি দু-দণ্ডের তরে।
কাছে যা ভুলিতে তারে চেষ্টিত এ নহে।
আমি চাহি ফুলবনে করি' বিচরণ
ফুলের সৌরভে মোর দেহ মন ভরে ;
জ্যোতিষ্কের আঁখি হ'তে যে অমৃত বহে
পিয়া, দূরতার বাধা হই বিস্মরণ।

(১০)

কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, লয়ে কি সঞ্চয়
চলেছি, কেন সে চিন্তা ? কি হইবে জানি
কতখানি স্বপ্ন, আর সত্য কতখানি ?
জীবনের আদ্যোপান্ত জাগরণ নয়,
সমস্তই নহে স্বপ্ন। তাও যদি হয়,
ক্ষতি কি ? একান্তে হেথা মোরা দুটি প্রাণী
পরস্পরে পরিতৃপ্ত, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
মুছে গেছে প্রেম-স্পর্শে, ঘুচে গেছে ভয়।

মোরা আসি নাই হেথা বহিবারে ভার,
দিনের মজুরী লয়ে, ধনীর আলয়ে
খাটিতে ঘর্ম্মাক্ত ক্লান্ত ; জীবন উৎসবে
আদৃত অতিথি মোরা বিশ্ববিধাতার ;

অমৃত পড়িলে পাতে পিয়া নিঃসংশয়ে,
কহিব—মানবভাগ্যে অমৃত সম্ভবে।

(১৮)

কবিতা সঙ্গীত সম ছন্দে আর সুরে
ভরে নাই এ জীবন, সুখের স্বপন
উঠে নাই সত্য হয়ে ; নিষ্ফল বপন
অজস্র আশার বীজ। কল্পনার পুরে
প্রতিষ্ঠিত যেই প্রেম, সে যে বহু দূরে
মানবের গৃহ হ'তে ; চন্দ্রমা তপন
ধরা হ'তে যথা দূর ; করি প্রাণপণ
যে ছোটে ধরিতে, সে তো মরে শুধু ঘুরে।

যে আলো আরাম চাহি বাঁচিবার লাগি
পেয়েছ, হৃদয়, বেশী কেন চাহ আর ?
জীবনের গূঢ়শিক্ষা লহ এইবার—
আসিয়াছ অনেকের সুখ-দুঃখ-ভাগী,
সহায়, সেবকরূপে। নিজস্ব কে কার ?
কে কার প্রেমের লাগি ফিরে সর্ব্বত্যাগী ?

(১৯)

পড়িতে চাহি না বাঁধা বাসনার পাশে,
বেড়াইতে চাহি আমি একান্ত স্বাধীন,
তবুও হৃদয় মোর দীর্ঘ রাত্রি দিন
এই পান্থশালা পানে ফিরে ঘুরে আসে।

আজ যাক্। কাল তপ্ত উদাস বাতাসে
দিবা যবে গোধূলিতে হইবে বিলীন,
বাহির হইব আমি, বাধা-বন্ধ-হীন,
সংসারের রাজপথে আপন তল্লাসে।

কেন এসেছিনু হেথা, শুনে কার ডাক ?
সে কি দাঁড়াইবে কাল তপ্ত অশ্রু দিয়া
পিচ্ছিল করিয়া মোর সম্মুখের পথ,
অথবা বলিবে—যদি যেতে চাহে যাক্;
ভুল করে একদিন এনেছি ডাকিয়া,
হায় রে, সংসারে কোথা পূরে মনোরথ ?

একলা

(৮)

আর নাহি মাঝখানে কিছু দুজনার,
বেদনা-মুখরা বাণী, মূক অভিমান
দূরত্ব স্থাপিত যারা, সব তিরোধান :
দরশ পরশ তৃপ্তি তা'ও নাহি আর

ভেঙ্গেছে যা ছিল স্থূল মৃত্যুর প্রহার ;
ক্ষুদ্র হ'তে, ক্ষোভ হ'তে করি পরিত্রাণ
রেখে গেছে পাশাপাশি দুটি দীপ্ত প্রাণ,
সুখের ভোগের সাধ করি ভস্মসার।

এত দিনে হ'লে তুমি নিত্য সহচর,
সকল চিন্তার মোর, সকল চেষ্টার
সমভাগী, সমব্যথী ; দেহ তেয়াগিয়া
আমার হৃদয়পুরে বাঁধিয়াছ ঘর ।
তাই স্তূপাকার ভ্রম, আঁধারের ভার
সরিতেছে, শান্তিউষা উঠিছে জাগিয়া ।

(১৭)

প্রিয়তম, বিচ্ছেদের আছে অবসান,
হেথায় পেয়েছি বহু তার পূর্ব্বাভাস ।
তবু কভু ঢাকি আঁখি করি অবিশ্বাস,
না শুনি অন্তরবাণী ; জ্ঞান, সন্দিহান,
সত্যেরে কল্পনা বলি করে প্রত্যাখ্যান ।
একদিন নিশ্চয় সে হইবে প্রকাশ
সন্দেহ অতীতরূপে । দেহ হলে নাশ
আত্মা পাবে দৃষ্টি নব—মরণের দান ।
আজ অশ্রু-আবরিত ক্ষীণ দৃষ্টি লয়ে
সেই সুদিনের তরে চেয়ে আছি পথ ।
মোর দীর্ঘ তপস্যায় করুণার্দ্র হয়ে
দেবতা করুন পূর্ণ এই মনোরথ—
সেবি এই ধরণীরে, সুখ দুঃখে ভরা,
লোকান্তরে হই তব সখী যোগ্যতরা ।

অক্ষয় প্রদীপ

তব কাছে, হে অনন্ত, দূর কাছে নাই,
জনম মরণ ঠেলি বাড়াইলে হাত

তোমারেই হাতে ঠেকে। অগ্র ও পশ্চাৎ,
ইহ-পর, দেশ কাল, মিশে এক ঠাঁই
তোমাতেই; তোমা ছাড়ি খুঁজিবারে যাই
যাহা কিছু বিশ্বে তব, ওহে বিশ্বনাথ,
শূন্যে যায় মিলাইয়া; সব এক সাথ
মিলে মোর, যে মুহূর্ত্তে স্পর্শ তব পাই।
স্পর্শ সেই চিরদিন এ তপ্ত হৃদয়
জুড়াক্ প্রলেপ সম; কবচের মত
শোকশরাঘাতে মোরে রাখুক অক্ষত;
দুর্গম এ গিরিপথ, বর্ষ-তাপ-ময়,
চলি গান গেয়ে। নাথ, সন্ধ্যা বাড়ে যত
জ্বল এ অন্তরে মম, প্রদীপ অক্ষয়।

বসন্তাগমে

বসন্ত কি সহসা এ নির্জ্জন আবাসে
পশিয়াছ চুপি চুপি? নবীন পল্লবে
সাজিয়াছে তরুরাজি। ঝেড়ে দিলে কবে
পুরাতন জীর্ণপত্র? শীতল বাতাসে
বাতাবি ফুলের গন্ধ ধীরে ভেসে আসে
আমার গবাক্ষপথে; ঘন কুহুরবে
মুখরিত আম্রবন,—বসন্তই হবে।
উদ্যান উজ্জ্বল শত শ্বেত পুষ্প হাসে।

আজিও ধরণী মোরে রেখেছে ধরিয়া
তার স্বর্ণ-কারাগারে। বর্ণ গন্ধ গানে,
রসে স্পর্শে দিতে চাহে দেহে আর চিতে
নব প্রাণ, কিন্তু হায় নিঃশেষে ভরিয়া
কই দিতে পারে, মধু? দূরে কোন্‌খানে
থাকে অদেহীরা, বঁধু, পার বলে দিতে?

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫৭

মানকুমারী বসু

১৮৬৩—১৯৪৩

মানকুমারী বসু

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
মূল্য ৬০ ন. প.

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—৯।১২।১৯৬২

মানকুমারী জীবিতকালে "আমার অতীত জীবন" নাম দিয়া আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ('উত্তরা,' ২য় বর্ষ, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার জীবনী রচনায় ইহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য।

বংশ-পরিচয় ; বাল্য-জীবন

তিনি বাল্য-জীবনের কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। স্মৃতিকথায় সাল-তারিখের এক-আধটু গণ্ডগোল থাকা স্বাভাবিক। মানকুমারীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা—খুলনার উকীল শ্রীচারুচন্দ্র নাগ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্ম-তারিখ প্রকৃতপক্ষে ১৩ মাঘ ১২৬৯ (২৫ জানুয়ারি ১৮৬৩),—১৩ মাঘ ১২৭১ নহে :—

"যাঁহারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর জীবন-কাহিনী পড়িয়াছেন, তাঁহারা উক্ত কবিবরের জ্যেষ্ঠতাত ৺রাধামোহন দত্ত-চৌধুরীর কথা অবশ্য মনে রাখিয়াছেন ; কারণ, তিনিই সাগরদাঁড়ির দত্ত-বংশের সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠাকারী। তিনিই আমার পিতামহদেব। তাঁহার প্রথমা পত্নী বালিকা বয়সে গতাসু হইলে, দ্বিতীয় বার যে পত্নী গ্রহণ করেন, সেই পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র আমার পিতৃদেব ৺আনন্দমোহন দত্ত-চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামের জমিদার ৺বনমালী বসু আমার মাতামহ দেব। আমার জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী শান্তমণি দেবী তাঁহার আটটি সন্তানের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা। অতি বাল্যকালে (তখনকার প্রথামত) আমার মাতাপিতা বিবাহিত

হন। বিবাহকালে পিতৃদেবের বয়স এগার, মাতৃদেবীর বয়স পাঁচ বৎসর। আমার মাতার চারিটি মাত্র সন্তান হয়।...চতুর্থ আমি—মানকুমারী সর্ব্বকনিষ্ঠা।...১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ রাত্রিকালে, মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর জন্ম হয়।...শিশুকালে আমাকে "অভিমানিনী" বুঝিয়াই নাকি আমার নামকরণ হইয়াছিল।...আমি অতি বাল্যকাল হইতে আমার মাতা-পিতাকে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি অথবা পুরাণের শিবশক্তির মতই দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাবা পুস্তক-পাঠ, পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনা, শিবপূজা, পুরমহিলাদিগের নিকটে পুরাণ পাঠ, বালিকাদিগকে সদুপদেশ দান এবং শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া এই সব করিতেন। আর মা কার্য্যকারকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রের উন্নতিচেষ্টা, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধিসাধন, গৃহকর্ম্মে অসাধারণ নৈপুণ্য, এই সব করিতেন।...

আমি বাবার কাছে, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীর কাছে এবং আমার এক দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম। ঔ-কার বানান শেষ হইলেই দ্বিতীয় ভাগ ধরিলাম। দ্বিতীয় ভাগের যুক্তাক্ষর শীঘ্র মুখস্থ হইবে বলিয়া বাবা আমার সহিত সর্ব্বদা বানান করিয়া কথা কহিতেন। যুক্তাক্ষর পড়া শেষ হইলে আমাদের বাহির বাড়ীতে বালিকা-বিদ্যালয় হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কথামালা লইয়া পড়িতে স্কুলে চলিলাম।...বিদ্যালয়ে যাইবার সময়ে বাবার আদেশমত ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপায় পাঠ আমি খুব শীঘ্র শিখিতে লাগিলাম; কিন্তু হাতের লেখার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতাম না।...এই সময়ে আমি ঘরে বসিয়া বাবার পুস্তক সকল অর্থাৎ কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীখণ্ড, হর-পার্ব্বতী-মঙ্গল প্রভৃতি পড়িতাম আর

পুরবাসিনীদিগের অনুকরণে, বাবা মা দাদা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের উদ্দেশে কৃত্রিম পত্র লিখিতাম।...আমার দাদা স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন।... আমার সধবা ভ্রাতৃজায়া 'বামাবোধিনী'র গ্রাহিকা ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় বামা রচনা দেখিয়া তাঁহারাও গদ্য-পদ্য রচনা করিতেন। এই সব দেখিয়া আমারও "রচনা" করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত।...

আমি চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসিয়া উপকথা রচনা করিয়া খাতায় লিখিতাম।...পদ্য বা গদ্য অর্থাৎ উপকথা যাহা লিখিতাম, কাহাকেও দেখাইতাম না,...তাহার ভিতর রচনার দুইটি ছত্র মাত্র আমার স্মরণ আছে, তাহা এই :—

"রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার,
ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।"

গদ্য রচনারও একটু নমুনা দিলাম : "এক রাজ-কন্যার বারাণ্ডায় এক ঝাঁক পাখী আসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে রাজ-কন্যা একটি পাখী ধরিয়াছিলেন ; তাহার গায়ের রং লাল, সবুজ, হলুদে, আর কালো ; এমন সুন্দর পাখী কেহ কখনও দেখে নাই ; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটি বাদুড় !" এই রচনা দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়াদ্বয় হাসিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, আমি ভয়ানক অপ্রতিভ হইয়াছিলাম ; সৌন্দর্য্যের শেষ উপমেয় "বাদুড়" হওয়া যে এত হাসিবার কথা তাহা আমি মোটেই বুঝি নাই, কারণ "বাদুড়" আমি তখন মোটেই দেখি নাই।"

বিবাহ ও বৈধব্য

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিত্থানন্দকাটী গ্রাম-নিবাসী বিবুধশঙ্কর বসুর সহিত ১০ বৎসর বয়সে মানকুমারীর বিবাহ হয়। বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন স্বামি-সুখ লেখেন নাই; দশ বৎসর যাইতে-না-যাইতেই তিনি একটি কন্যা লইয়া বিধবা হন। তাঁহার আত্মকথায় প্রকাশ :—

"আমার পিত্রালয় সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিত্থানন্দকাটী গ্রাম। সেখানকার বসু মহাশয়েরা ধন, মান, বিদ্যাবত্তা এবং লোকহিতকর কাজের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার এক পিতৃব্যের দুইটি কন্যা ঐ বসু মহাশয়দিগের গৃহে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। আমার সেই দিদিদিগের কয়টি দেবর কার্য্যোপলক্ষে একদিন আমার সেই পিতৃব্যের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজনকে দেখিয়া আমার মাতৃদেবী, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং সচ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া, নিজ জামাতা করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। ক্রমে সেই পাত্রের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেন।...বাবা তাঁহার স্নেহের কন্যাকে মহাসমারোহপূর্ব্বক, ১২৭৯ সালে ৭ই মাঘ তারিখে, সেই মনোনীত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।...বিবাহের সময়ে চারি পাঁচ দিন শ্বশুরালয় গিয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, ননন্দা, জা প্রভৃতি নূতন আত্মীয়দিগের যথেষ্ট আদর পাইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।...

তেরো বৎসর বয়সে পড়িয়াই অর্থাৎ বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইবামাত্র আমাকে দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল।...আমার শ্বশুরালয়ে গিয়া দেখি, তাঁহারা বৃহৎ পরিবার।...সেখানে অনেক লোক ছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃতিও নানা রকম। আমাকে "অদ্ভুত জীব" দেখিয়া অর্থাৎ আত্মগোপন করিতে অক্ষম, ছলনা-চাতুরীতে অনভ্যস্ত এবং গৃহ-কর্ম্মে

অশক্ত, এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কেবল আমি বলিয়া নহি, বঙ্গগৃহের অনেক বালিকা বধূকেই এইরূপে "মানুষ" হইতে হয়। যাহা হউক ক্রমে ক্রমে আমাকে বিনীতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দেখিয়া গুরুজনেরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। আর আমার তখনকার সরলতা ও কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া ননন্দা প্রভৃতি সমবয়স্কাগণ আমাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন। এখানে আমি একগুঁয়েমি ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলকে প্রসন্ন করিতে এবং গৃহকর্ম্ম শিখিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার জ্যেষ্ঠা জা শিল্পকাজে সুনিপুণা, তাঁহার নিকটে সেলাই শিখিলাম।

তখন পতি-দেব কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটীতে বাটী আসিয়া আমার ননন্দাদিগের নিকটে আমার কবিতা রচনার কথা শুনিলেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ এক-একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। তিনি যে আমার পরম সুহৃদ্ শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া তাহাই আমার বিশ্বাস হইল। ক্রমশঃ তাঁহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে আমি সহস্র গৃহকর্ম্মের মধ্যে দিনের বেলায় এক একটি পদ্য লিখিয়া রাত্রিতে তাঁহাকে "উপহার" দিতাম। এই কাজ খুব গোপনে করিতে হইত। কারণ, তখনকার দিনে এরূপ কাজ বড়ই "লজ্জা"র, বড়ই "অসমসাহসে"র এবং "বিরক্তি"র বিষয় হইত। যাহা হউক স্বামী ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইতেন এবং পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত উহা পাঠ করিতেন। বন্ধুগণ সেই কবিতার সুখ্যাতি করিতেন; কিন্তু আমি পাছে সুখ্যাতি শুনিয়া অহঙ্কৃতা হইয়া উঠি, এজন্য স্বামী অত্যন্ত সতর্ক হইতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি আমার নিকটে—যিনি আমাদের বঙ্গ-

মহিলা-কুলের শীর্ষস্থানীয়া সেই 'দীপ-নির্ব্বাণ' 'ছিন্নমুকুল' রচয়িত্রী, সুকবি প্রসন্নময়ী দেবী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণের আদর্শ রচনাশক্তি আমার সম্মুখে ধারণ করিতেন। আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে তাঁহার মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত, কিন্তু তিনি সময় ও সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার নিজের পাঠ্যাবস্থা, সে জন্য অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায়ই থাকিতেন; যে সময়ে বাটী আসিতেন, তখন গুরুজনদিগের শাসনে, লজ্জার অনুরোধে দিনের বেলায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত না। রাত্রি ১২টা কি ১টার সময়ে যখন শয়ন-গৃহে যাইতাম, তখন আমি পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি আমার অসুস্থতার আশঙ্কায় নিষেধ করিতেন; সেই জন্য তাঁহার কাছে আমার লেখাপড়া হইত না।

আমার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন আমি "পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা" শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে, বীররস-পূর্ণ একটি কবিতা লিখিয়া স্বামীকে দিয়াছিলাম; তাহার প্রথম কয়েক ছত্র এই—

"দুরন্ত যবন যবে ভারত ভিতরে
পশিল আসিয়া, পুরন্দর মহাবলী
কেমনে সাজিলা রণে, প্রিয়তমা তার
ইন্দুবালা কেমনে বা করিলা বিদায়?
কৃপা করি কহ মোরে হে কল্পনা দেবী।
কেমনে বিদায় বীর হ'ল প্রিয়া কাছে।"

পদ্যটি সুদীর্ঘ হইয়াছিল। স্বামী এবং তাঁহার কা[illegible] বন্ধুগণ ইহা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হন। কিছু দিন পরে একজন বন্ধু এই কবিতাটি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে মুদ্রিত করেন। ইহাই আমার প্রথম প্রকাশ্য লেখা।

কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া উক্ত কাগজের সম্পাদক টীকায় লিখিয়াছিলেন, "আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী; ইনি ইঁহার পিতৃব্য-সৃষ্ট বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শত-নরী হার পরাইলাম। চর্চ্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব করিবে।"

ইহা দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্ব্বিতা হইও না। দেখ দেখি, তোমার কাকা কত বড় ক্ষমতাপন্ন কবি ছিলেন; তুমি তাঁহার উপযুক্তা ভ্রাতুষ্পুত্রী হইলে তবে আমার মুখোজ্জ্বল হইবে। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া সকলে এতটা প্রশংসা করে।"

যাহা হউক, আমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়া দুই বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং উপন্যাস লিখিয়াছিলাম। তাহা স্বামীর কাছে দিয়াছিলাম; তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর একান্ত প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্বামী আমাকে কলিকাতা হইতে ইংরাজী শিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আদেশে আমি আনন্দের সহিত আমার একখানা খাতাকে সঙ্গিনী করিয়া বাটীর বালকদিগের নিকটে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমার বয়স যখন সতর বৎসর তখনই আমার একমাত্র সন্তান—আমার কন্যাটি ভূমিষ্ঠা হয় [৩০ ডিসেম্বর ১৮৮০]। তখন আমি পিত্রালয়ে ছিলাম। আমার কন্যার বয়স যখন কুড়ি দিন তখন আমার পরমারাধ্যতম স্নেহময় বাবা আমাদিগকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশে আমি একটি শোক-গাথা

লিখিয়াছিলাম। তার পর অনেক দিন আর লেখাপড়া করিতে পারি নাই।

পর-বৎসর [ইং ১৮৮২] স্বামী মেডিকেল কলেজ হইতে এল্. এম্. এস্. (L.M.S.) উপাধি প্রাপ্ত হন।…কিন্তু আমার অদৃষ্টে এত সুখ ও সৌভাগ্য বেশী দিন সহিল না! আমার শ্বশুরঠাকুরের অনুরোধে এবং কয়েকটি সম্ভ্রান্ত বন্ধু-বান্ধবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্বামী সাতক্ষীরা মহকুমায় ডাক্তারি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে "সুদক্ষ চিকিৎসক" বলিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইলেন। দু'জনেই মনে করিয়াছিলাম, এইবারে আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইল। তিনি আমাকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "এইবার আশ্বিন মাস হইতে তোমাকে, খুকীকে এবং আমার ছোট ভাই দু'টিকে আমার কাছে লইয়া যাইব।" আমার এক ননন্দা পীড়িতা হওয়াতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুই তিন দিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া ২৭শে বৈশাখ সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। আমরা উভয়েই আশ্বিন মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

শ্রাবণ মাসে তাঁহার দারুণ পীড়ার সংবাদ আসিল। আমার শ্বশুর, আমার অন্যতম ডাক্তার দেবর, আমার দাদা প্রভৃতি একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। কেহ আমাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন না। আমি হিন্দু কুলবধূ, লজ্জায় ভয়ে কিছুই বলিলাম না। কেবল তাঁহার আরোগ্য-সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম; কেবল তাঁহার মঙ্গল-কামনায় ভগবান্‌কে ডাকিলাম…তার পরে আর কি বলিব? সংবাদ পাইলাম, যিনি আমার রমণী-জীবনের অবলম্বন, আমার সেই পরোপকারী, দয়ালু দেবপ্রতিম পতিরত্ন, তিনি ২৯শে শ্রাবণ সোমবারের রাত্রিতে আমাকে জগতের দুয়ারে হতভাগিনী করিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া গিয়াছেন! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যানন্দকাটীর

বাটীতে থাকিয়া আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই—সাড়ে আঠারো।”

সাহিত্য ও সমাজ-সেবা

বিধবা হইবার পর সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে মানকুমারীর মন বসিত না; তিনি শেষে কবিত্বশক্তির অনুশীলনে ও সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

“অতি বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এইরূপ হইয়াছিল যে, কোনরূপ সুখ-দুঃখাদি কর্তৃক আমার মন একটু উত্তেজিত হইলে আমার একটি কবিতা হইত। এই কবিতা প্রায়ই পদ্য, সময়ান্তরে গদ্য কবিতাও লিখিতাম। আমি যখন সেই তরুণ বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার হৃদয় পিষিয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল। এই শোকোন্মাদ অবস্থায় আমার গদ্যকাব্য ‘প্রিয় প্রসঙ্গ’ রচিত হইয়াছিল। উহা কেবল নিজের মনকেই সান্ত্বনা দিবার জন্যই লিখিতাম। বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য কোন চিন্তা করি নাই।

আমার একজন কৃতবিদ্য আত্মীয় তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে ঐ হস্তলিপি দেখিতে পান, এবং উহা ছাপাইলে বিধবা রমণীগণের একটা সান্ত্বনার জিনিস হইবে এইরূপ পরামর্শ দেন। আমার স্বর্গীয় পতিদেবের একটি স্মৃতি রক্ষা হইবে, ইহা মনে করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আমি একান্ত উৎসুক হই। আমার স্বামীর পরলোক গমনান্তে আমার আত্মীয়গণ, তাঁহার কিছু অর্থ আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই অর্থ দিয়া আত্মীয়ের নিকটে উহার মুদ্রাঙ্কনের ভার প্রদান করি। পুস্তকে আমার নাম এবং পরিচয় দিতে নিষেধ করি। এই

কাজ খুব গোপনে করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয়, তখন আমার যে রকম লজ্জা সঙ্কোচাদি ছিল, তাহাতে যদি আমার মন সেরূপ অপ্রকৃতিস্থ না হইত, তবে আমি 'প্রিয় প্রসঙ্গ' ছাপাইতে পারিতাম না। যাহা হউক, 'প্রিয় প্রসঙ্গ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে আমার আত্ম-গোপনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকে বুঝিতে পারিলেন আমিই উহার রচয়িত্রী। তখন অনেক হিংসা, দ্বেষ, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আমাকে সহিতে হইয়াছিল। আমার এত আদরের 'প্রিয় প্রসঙ্গ'ও সাধারণের কাছে আদৃত হয় নাই। বিজ্ঞাপনাদি অভাবে অনেকে উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনেক দিন জানিতে পারিলেন না।...

যখন ক্রমশঃ দিন যাইতে লাগিল, তখন কেবল গুরুজনের সেবা, শিশুপালন অথবা সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না। বাকী জীবনটি কি করিয়া কাটাইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। ভগবান্ এ অধম সন্তানকে যে বিদ্যানুরাগ ও একটু কবিত্বশক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ব-বিধাতার কাজে আত্মোৎসর্গ করা উচিত। বলা বাহুল্য, তখন ভগবানের স্নেহে অবিশ্বাস বা তাঁহার উপরে অভিমান দূর হইয়াছিল। আমার অদৃষ্টফল আমি পাইলাম। ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। আমি মনে করিলাম, সধবা মহিলাদিগের যেমন সংসারের কাজ করা কর্ত্তব্য, বিধবা মহিলাদিগের সেইরূপ সমাজের কাজ করা কর্ত্তব্য। ইহা যখন আমার "সত্য" বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই সময় আমি পুরাতন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিতা, এবং সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের

অনেক গ্রন্থ পড়িতাম। নবজীবন, প্রচার, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্র এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' পড়িতে আমার স্বদেশ ও স্বজাতীয়া ভগিনীদিগের জন্য অনেক চিন্তা উপস্থিত হইত; সেই সকল চিন্তা আমি অনেক সময় লিপিবদ্ধ করিতাম। যখন পিত্রালয়ে থাকিতাম, তখন আমি দাদার নিকট অনেক মিনতি করিয়া তাঁহার কাছে একটু ইংরাজী পড়া শিখিয়া লইতাম। একখানি উপক্রমণিকা ব্যাকরণ হইতে শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি মুখস্থ করিতাম। ...এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত কোন পুরুষের সম্মুখীনা হইতাম না, কোন আমোদ বা উৎসাহে যোগ দিতাম না; এবং স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ মিশামিশি বা রহস্যালাপ করিতাম না। আমার স্বর্গীয় স্বামীর দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার উপরে নিপতিত আছে ইহাই আমার ধারণা ছিল।

আমাদের বাড়ীতে 'সখা' নামক মাসিকপত্র আসিত। সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন দেশের বালক-বালিকাদিগকে জ্ঞানানুশীলন এবং নীতিশিক্ষা দান করিয়া গঠিত-চরিত্র করিবেন এই উদ্দেশ্যে 'সখা' প্রবর্ত্তন করেন। আমি তাঁহার এই সাধু কাজের সহায়তা করিতে একান্ত ব্যগ্র হইলাম। 'সখা'র উপযুক্ত কবিতা লিখিয়া প্রমদাবাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি যত্নপূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত 'সখা'য় লিখিতে লাগিলাম।* কিছু দিন পরে প্রমদাবাবু ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই অ-দৃষ্ট বন্ধুর মৃত্যুসংবাদে আমি মনে মনে বড় শোকাকুলা হইলাম। এরূপ দুঃখে কেহ সহানুভূতি

* প্রমদাচরণ সেন-সম্পাদিত 'সখা'য় (৩য় বর্ষ, ১৮৮৫, জানুয়ারি ও মে সংখ্যা) "জনৈক বঙ্গ মহিলা" নামে মানকুমারীর "সোহাগ" ও "নববর্ষ" শীর্ষক দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

করিবে না বলিয়া কাহাকেও বলিলাম না। তখন "শোক-সঙ্গীত" শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া 'সখা'র উদ্দেশে প্রেরণ করিলাম। প্রমদাবাবুর ভ্রাতা এবং 'সখা'র রক্ষক বাবু অন্নদাচরণ সেন তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেকগুলি প্রাপ্ত কবিতা হইতে কেবল আমার সেই কবিতাটি 'সখা'য় [আগষ্ট ১৮৮৫] প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে একখানি অতি সুন্দর ছবির পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন।

আমার জাতীয় ভগিনীগণের জন্য কিছু কাজ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল হইল। সেই জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আমি বামাবোধিনীর লেখিকা-শ্রেণীভুক্তা হইলাম।* কিছু দিন বামা-বোধিনীতে কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার অধিকাংশ আমার স্বর্গীয় পতিদেবের উদ্দেশে রচিত।

বামাবোধিনীর ২৫শ বর্ষ পূর্ণ হইলে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় উহার জন্য "জুবিলী" করেন। সেই সময়ে অনেকগুলি পুরস্কার-প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেন। আমি তিন-চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। বামাবোধিনীর বিজ্ঞাপনানুসারে 'বনবাসিনী' নামক এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি উহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বামাবোধিনীর জুবিলীতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিধবা রমণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম। সেই চিন্তার ফলে আমার মনে হইল, জ্ঞানধর্ম্মে

* 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মানকুমারীর প্রথম রচনা—"আমার দেবতা" নামে একটি কবিতা। ১২৯৩ সালের ভাদ্র (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আত্মগঠন করিয়া ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গীয় স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, জাতীয় ভগিনীগণের উন্নতিসাধন, শিশুদিগকে উপযুক্তরূপে গঠন এবং অনাথ আতুরদিগকে সেবা, ইহাই বিধবা রমণীদিগের কর্ত্তব্য। আমার এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে 'বনবাসিনী' লিখিয়াছিলাম। ইহা বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় স্বতঃই বুঝিয়াছিলেন।...ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণের নিকটে খুব আদৃত হইয়াছিল।

এই "জুবিলী" সময় হইতে বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় আমাকে নিজ কন্যারূপে স্নেহ করেন। আমার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণ-সাধন, তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। আমার লেখা তিনি সাগ্রহে, সমাদরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিষয়ে কোন ত্রুটি হইলে তাহাও স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিতেন। আমাকে যেরূপ সদুপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেন, আমার জীবনে তাহা যেরূপ প্রার্থনীয় সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য। তিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য এবং দেবতুল্য চরিত্রবান্ জানিয়া তাঁহার কাছে পত্রাদি লিখিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সঙ্কোচ হইত না। আমি মনে মনে তাঁহাকে আমার পিতৃদেবের মত ভক্তি করিতাম। এই সময় হইতে বামাবোধিনীতে আমি পদ্য অপেক্ষা গদ্য প্রবন্ধ অধিকাংশ লিখিতে লাগিলাম। আমাদের অন্তঃপুর-শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামের স্ত্রাচিকিৎসক এবং ধাত্রীর আবশ্যকতা বিষয়ে আমি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একাধিক বার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বাল্য-বিবাহ নিবারণ এবং বরপক্ষের অর্থলুব্ধতা নিবারণ জন্যও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি নব্যভারত পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাসিকপত্রে দুই-চারিটি কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

৶ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের পুরস্কার প্রবন্ধ "বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম" রচনার প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায়, আমি ১২৯৬ সালে পুরস্কার পাইয়াছিলাম। ঐ কথা শুনিয়া আমার কয়জন আত্মীয় "যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী" সভার বিজ্ঞাপনানুসারে "বিবাহিতা রমণীর কর্ত্তব্য" বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় আমি প্রথম হইয়াছিলাম এবং মিসেস্ বি. দে. প্রদত্ত রৌপ্য মেডেল পাইয়াছিলাম। সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই প্রবন্ধটি উক্ত সম্মিলনীর কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করেন। বামা-হিতৈষী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাহা দেখিয়া নিজ সহৃদয়তায় একান্ত আনন্দিত হন, এবং আমাকে বিশেষ উৎসাহজনক পত্র লিখিয়া কতকগুলি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া মহাত্মা ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ধাত্রীশিক্ষা-প্রণেতা) তাঁহার 'বাঙ্গালী মেয়ের নীতিশিক্ষা' পুস্তকে আমার নাম মুদ্রিত করিয়া, বিশেষ গৌরবসূচক এক পত্র মুদ্রিত করিয়া, উহা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহার পরে আরও দুই বারে আমি যশোহর-খুলনা-সম্মিলনীতে "সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য" এবং "মহৎ জীবনী" নামক প্রবন্ধ রচনায় প্রথম বিবেচিত হই এবং শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার পাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ও আমাকে যার-পর-নাই স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার এবং বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি অধিকতর মনোযোগপূর্ব্বক ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে চেষ্টা করি। তখন আমার শিক্ষক বিশেষ কেহই ছিল না। আমি ভগবানের উপরে নির্ভরপূর্ব্বক একান্ত চেষ্টা করিতেছিলাম। একদিন ইংরাজী পড়িতাম আর একদিন সংস্কৃত পড়িতাম। ইংরাজী এবং দেবনাগর অক্ষর লিখিতেও শিখিতাম। যে দিন আমার

ইংরাজী হস্তাক্ষর বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম, আর যে দিন টীকা দেখিয়া কুমারসম্ভম পড়িতে পারিয়াছিলাম, সেই দিন ঐ মহাশয়দ্বয় যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমার চিরস্মরণীয়। মানবের মাতৃ-পিতৃ-স্নেহঋণ যেমন অপরিশোধনীয়, ঐ দুই আরাধ্যতমের স্নেহের ঋণও আমার সেইরূপ অপরিশোধ্য।...

বলিয়াছি, বামাবোধিনী, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রে আমি কবিতা লিখিতাম। পূজনীয় কবিরত্ন মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল সংগ্রহপূর্ব্বক কাব্যকুসুমাঞ্জলি নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং উহার বিজ্ঞাপন লিখিয়া দেন। ইহার পরে স্নেহময় কবিরত্ন মহাশয়ের আগ্রহ ও অনুগ্রহে আমার 'কনকাঞ্জলি' 'প্রিয়-প্রসঙ্গ' (২য় সংস্করণ), 'বীরকুমার-বধ কাব্য' জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামাবোধিনীর ত্রিশ বৎসর বয়সেও এক জুবিলী হইয়াছিল, আমি তাহাতে বিজ্ঞাপনানুসারে "বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা"-শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাহার পরীক্ষক ছিলেন; সে বারেও আমি কয়েক জন পুরুষ ও রমণীর সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হই।

যাঁহারা দেশ-হিতৈষী, নারী-হিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক, তাঁহাদিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। বরিশালের শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের 'ভক্তিযোগ' পড়িয়া অবধি প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতাম। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি জীবনে কখনও না দেখিলেও তাঁহাকে একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ভক্তি করিতাম।... এই বঙ্গদেশে যাঁহারা সমাজ-শিক্ষকরূপে পরিগণিত,—যাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, নীতিবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সুকবি, তাঁহাদের

মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মনুষ্যত্ব-লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্যক্তিগত ভাবে না হইলেও শক্তিগত ভাবে)। আমি এই সকল লোকের নিকট ঋণী। এইরূপে নব্যভারতের অন্যতম সুকবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্বশক্তি এবং ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক শক্তির নিকট আমি বহুল পরিমাণে ঋণী। সকলের অপেক্ষা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণই আমার গুরুতর। কেবল সাহিত্য-শিক্ষা বিষয়ে নহে। আমার চির অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রণেতা আচার্য্যদেবকে আমি গুরুদেবের আসনে বসাইয়া, তাঁহারই উপদেশানুসারে আত্ম-গঠন-চেষ্টা করিয়াছি।”

গ্রন্থাবলী

মানকুমারী যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশ-কাল, বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **প্রিয় প্রসঙ্গ**। বা হারানো প্রণয় (গদ্য-পদ্য)। ইং ১৮৮৪ (২৪ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৩০।

পুস্তকে লেখিকার নাম ছিল না ; ইহা “কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত” ও “এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।” প্রকাশকের নিবেদনটি এইরূপ :—“নবীনা বঙ্গবালার তরুণ শোকোচ্ছ্বাস বঙ্গবাসীর সমক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।…গ্রন্থকর্ত্রী পল্লীগ্রামে শিক্ষিতা, উচ্চ শিক্ষা বিবর্জ্জিতা, বিধবার কি মর্ম্মান্তিক যাতনা তাহাই চিত্রিত করা নবীনা

লেখিকার উদ্দেশ্য, পরিমার্জ্জিত ভাষার সহায়তায় হীন বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান তাঁহার ইচ্ছা নহে ইহা যেন সকলে স্মরণ রাখেন।"

'প্রিয় প্রসঙ্গে' এই কয়টি রচনা আছে :—দুর্গোৎসব, তুমি কোথায়? চিত্রপট, মুকুরে মুখ, পিঞ্জরে বিহগী, মরুভূমে মরীচিকা, অরণ্যে রোদন (কবিতা), একাদশী।

পনর বৎসর পরে তারাকুমার কবিরত্ন এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে "সাতক্ষীরায়" নামে একটি কবিতা অতিরিক্ত স্থান পাইয়াছে।

২। **বনবাসিনী** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১২৯৫ (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)। পৃ. ২৩।

'প্রিয় প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রী-প্রণীত এই উপন্যাসখানি বামাবোধিনীর জুবিলী উপহার হিসাবে বিতরিত হইয়াছিল। ইহা প্রথমে ১২৯৫ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়।

৩। **বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম** (সন্দর্ভ)। (১৫ জুলাই ১৮৯০)। পৃ. ১২।

ইহা "ব্রজমোহন দত্ত-পুরস্কার" প্রাপ্ত রচনা; প্রথমে ১২৯৬ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪। স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে **শোকোচ্ছ্বাস**। ? [ইং ১৮৯১] পৃ. ৮।

পুস্তিকাখানি বামাবোধিনী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও বিতরিত হয়। ইহাতে মানকুমারীর তিনটি রচনা—"শোকোচ্ছ্বাস" (গদ্য), এবং "শোকাতুরা মা" ও "বিসর্জ্জন" নামে দুইটি কবিতা আছে। এগুলি

১২৯৮ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৫। **দুইটি প্রবন্ধ**। ১২৯৮ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯১)। পৃ. ৩২।

যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী সভা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত 'প্রিয় প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রীর দুইটি রচনা—"বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য" ('বামাবোধিনী পত্রিকা,' আশ্বিন ১২৯৭ দ্রষ্টব্য) ও "সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য"—এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে।

৬। **কাব্যকুসুমাঞ্জলি**। ইং ১৮৯৩ (২ অক্টোবর)। পৃ. ২৭১।

এই পুস্তকে ৬৮টি কবিতা এবং বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে "শোকোচ্ছ্বাস" নামে একটি গদ্য প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (চৈত্র ১৩০৩) প্রবন্ধটির পরিবর্ত্তে "ভালবাসি" ও "সাতক্ষীরায়" নামে দুইটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে, ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে লিখিত "অভিষেচন" নামে আরও একটি কবিতা 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'তে যেমন স্থান পাইয়াছে, তেমনি আবার "সাধের মরণ" নামে কবিতাটি বর্জ্জিত হইয়াছে।

৭। **কনকাঞ্জলি** (কাব্য)। ১৩০৩ সাল (২৯ অক্টোবর ১৮৯৬)। পৃ. ২৬০।

"হেয়ার-প্রাইজ্ এসে ফণ্ড" হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

৮। **বীরকুমার-বধ কাব্য**। ১৩১০ সাল (১০ মে ১৯০৪)। পৃ. ২৩৫।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এই কাব্যের বিষয়—অভিমন্যু-বধ।

৯। **শুভ সাধনা** (গদ্য-পদ্য)। ইং ১৯১১। পৃ. ১৮৪।

"এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ, বহুদিন প্রথমে বামাবোধিনী

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম।…"সাধক"-শীর্ষক কবিতাটী মৎকৃত 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' হইতে গৃহীত।"

সূচী :—রাজা ও প্রজা, সহানুভূতি, পঞ্চ যজ্ঞ, উন্নতি, দধীচ (পদ্য), চরিত্র, আর্য্যদিগের দাম্পত্য-জীবন, পুত্র-ভিক্ষা (পদ্য), আর্য্য-মহিলা শৈব্যা, স্বার্থে পরার্থ, গুণগ্রাহিতা শক্তি, অভাব, দুইখানি ছবি, নিন্দুক, আত্মসংযম, ক্ষমা, ভক্তি, সাধক (পদ্য)।

'শুভ সাধনা' অনেক দিন বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।

১০। **বিভূতি** (কাব্য)। চৈত্র ১৩৩০ (১২ এপ্রিল ১৯২৪)। পৃ. ৩১১ + ১ শুদ্ধিপত্র।

১১। **সোনার সাথী** (কাব্য)। ? (২ মে ১৯২৭)। পৃ. ৫০।

১২। **পুরাতন ছবি** (আখ্যায়িকা)। ? (২৫ জুলাই ১৯৩৬)। পৃ. ১৩১।

সূচী :—গৃহলক্ষ্মী, মাতৃহৃদয়, বিমাতা, শৈশব সঙ্গিনী, বন্ধু ও পত্নী, মহামুহূর্ত্ত, ভিখারিণীর গীতি।

* * *

ছোট গল্প রচনায় মানকুমারী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কুন্তলীন-পুরস্কারের ১ম বর্ষে (১৩০৩ সাল) তাঁহার লিখিত "রাজলক্ষ্মী" গল্পটি "বিশেষ পুরস্কার ১৫৲ টাকা", ৩য় বর্ষে (১৩০৫ সাল) "অদৃষ্ট চক্র" গল্পটি "সপ্তম পুরস্কার—৫৲", এবং ৪র্থ বর্ষে (১৩০৬ সাল) "শোভা" গল্পটি ৫৲ পুরস্কার লাভ করিয়াছিল।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্মান

মানকুমারীর সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতসরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে তাঁহাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসিক ৩০৲ (পরে ৩৪৲) বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে (ফাল্গুন ১৩৪৩) চন্দননগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। মানকুমারী এই সম্মিলনে 'কাব্য-সাহিত্য' শাখার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম 'ভুবনমোহিনী স্বুবর্ণ-পদক' ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'জগত্তারিণী স্বুবর্ণ-পদক' দান করিয়া সম্মানিত করেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জুলাই শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক খুলনায় মানকুমারীর জয়ন্তী-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

মৃত্যু

মানকুমারী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ ডিসেম্বর (৯ পৌষ ১৩৫০) মধ্যরাত্রে ৮১ বৎসর বয়সে খুলনায় পরলোকগমন করেন। তিনি জামাতার গৃহে দৌহিত্র-দৌহিত্রীদিগের সহিত বাস করিতেন। একমাত্র কন্যা প্রিয়বালাকে হারাইয়া (মৃত্যু : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) তিনি শেষজীবনে এক প্রকার জীবন্মৃতা হইয়া ছিলেন। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে তিনি "আর কেন?" নামে যে মর্ম্মস্পর্শী কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আর কেন ডাকো !
যে যুগে মা বীণাপাণি করেছিলা পূজারিণী
সে যুগের বীণাতান কেন মনে রাখো।
ভালবেসেছিলে বুঝি, তাই এ সায়াহ্নে খুঁজি
পুনঃ আসিয়াছ কাছে,—নীরবেই থাকো !
সে যে গো অনেক দিন নাহি তার কোন চিন্,
সে পুরানো স্মৃতি কেন আজি বুকে মাখো !
সে বসন্ত, সে বরষা, সে আনন্দ, সে ভরসা,
আঁধারে মিলায়ে গেছে, আর পাবে নাকো !
এখন কিসের দাবী ? হারায়ে গিয়াছে চাবি,
ভেঙে গেছে বীণা বাঁশী—আর হবে নাকো !
আজি বৈতরণী নীরে তরণী লাগিছে তীরে
ডাকিছে পারের মাঝি,—সবে সুখে থাকো !
বিদায়, বিদায়, ভাই ! আর কেন ডাকো !

মানকুমারী বসু ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা দেশে যে-কয়জন মহিলা-কবি সর্ব্বজনবিদিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, মধুসূদন-ভ্রাতুষ্পুত্রী কবি মানকুমারী বসু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘ ষাট বৎসর কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুই বৎসর পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ আমাদের কালেও বিবিধ পুস্তক ও সাময়িক-পত্রের মারফৎ তিনি সাধারণ বাঙালী পাঠক-সমাজের সহিত যোগসূত্র রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি প্রধানতঃ বিয়োগবেদনাসঞ্জাত।

মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে স্বামিসুখবঞ্চিত হইয়া তিনি যে দুঃখের মধ্যে সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার অনুভূতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সহজ সরল ভাষায় সুললিত ছন্দে নিজের মনের কথা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ পাঠকের হৃদয় অধিকার করিতে এই কারণেই তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার বিবিধ কাব্য হইতে কয়েকটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' :—

একা

১

একা আমি, চিরদিন একা,
সে কেন দু'দিন দিল দেখা?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বলিল আলো?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা!
ভুলে ভুলে ভালবাসা
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা!

২

একা আমি এ অবনী-তলে
কেহ নাই "আপনার" ব'লে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি,
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে!

সে কেন পরাণে আসে
সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে !

৩

বসন্ত বরষা শীত যারা
আমার কেহই নয় তা'রা,
ভাসিলে নয়ন-নীরে
দেয় না মাথার কিরে
হাসিলে আসে না কাছে ঢেলে সুধাধারা !
একা আমি একা রই
সুখ দুখ একা স'ই
সে কেন আমার তরে হ'ত দিশাহারা ?

৪

একা আমি—জগতের পর
এক পাশে বেঁধে আছি ঘর,
আমার উঠানে ভুলে
হাসে না কুসুমকুলে
ঢালে না কো কলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর ;
সে, হেন একার ঘরে
কেন অধিকার করে
প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর ?

৫

একা আমি আসিয়াছি ভবে,
আমার "দোসর" কেন হবে ?

শ্মশান-সৈকত-বুকে
একাই ঘুমাব সুখে
জগৎ সংসার মোর শত দূরে র'বে,
আমারে মমতা-স্নেহ
দেয় নি—দিবে না কেহ,
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ?

একা আমি চিরদিন একা,
তবু সে দু'দিন দিল দেখা !
এখন বাসনা তাই
কোটি পরমায়ু পাই
তাহারি তপস্যা করি কপালের লেখা ?
তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসি-ভরা কান্না-ভরা
জীবনের মূল তত্ত্ব তারি লাগি শেখা !
সে আলোকে আলো পথ
ত্রিদিবের পুষ্পরথ !
ও পারে অনন্তপুরী যায় যেন দেখা !
যে কদিন থাকে প্রাণ !
এই কোরো ভগবান্ !
গাই যেন তারি গান বসি' একা একা।

মৃত্যু-সুহৃৎ

১

আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে,
বসন্তের নব হাসি
উল্লাসে উঠেছে ভাসি,
মল্লিকা-মালতী-জাতি থোপা থোপা দোলে ;
অঙ্গের সৌরভ তার
তুলনা মিলে না আর,
নন্দনে মন্দার মরি ! প্রাণ-মন ভোলে !
আমি দেখিয়াছি তার ফুলমালা গলে ।

২

আমি দেখিয়াছি তারে মলয়বাতাস,
তেমনি মধুর ছটা !
তেমনি আনন্দ-ঘটা,
পরাণে তেমনি ক'রে মাখায় উল্লাস ;
অতি ধীরে অতি ধীরে
হাসে তোষে চলে ফিরে,
অনন্তে ছুটিতে ঢালে অমৃত-উচ্ছ্বাস,
আমি দেখিয়াছি সে তো মলয়বাতাস !

৩

আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী,
শারদ চাঁদের মত
তারও জ্যোছনা কত !
হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে খসি ;

ফুটায়ে বনের ফুল,
উছলি নদীর কুল,
জীবন-মেঘের পাশে সেও থাকে বসি,
আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী।

৪

আমি দেখিয়াছি তারে পূরবী রাগিণী,
সে যখন জাগে যন্ত্রে,
কি জানি কি মোহ-মন্ত্রে—
নিচল নিথর চিত্ত ঘুমায় অমনি;
সে যেন মধুর ঊষা,
সে যেন দেবের ভূষা,
সে যেন সুখের সাধ, সোহাগের খনি!
আমি দেখিয়াছি সে তো পূরবী রাগিণী

৫

আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময়,
মমতা-মাখান প্রাণ,
মুখে মমতার গান,
বড় আদরের কথা কাণে কাণে কয়;
কাছে গেলে মিঠা হাসে,
আদরে ডেকে নে পাশে—
কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময়!

৬

আমি দেখিয়াছি তারে মহাযোগে রত,
সে এক জ্বলন্ত যোগী,
সুখভোগে নহে ভোগী,
পোড়ায়েছে নেত্রানলে পাপ রিপু যত ;
আশা তার পরমার্থ,
কোথা কিছু নাহি স্বার্থ,
বিশ্বপ্রাণ-ধ্যানে যেন আছে অবিরত,
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মত !

৭

নিষ্কাম সন্ন্যাসী সে যে এ মর-ধরায়,
তারে তো চেনে না কেহ,
করে না আদর স্নেহ,
"আপদ বালাই" ব'লে ফিরে নাহি চায় ;
শত ঘৃণা শত রাগে
তার হিংসা নাহি জাগে,
সব অত্যাচার সে তো হাসিয়া উড়ায়,
অথচ সে মহাবীর
ভাঙে ভূধরের শির,
দু'দণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড-নাশ তার ক্ষমতায়,
দু'হাতে সে ভালবাসা জগতে বিলায়।

৮

আমি তারে চিনি শুনি ভালবাসি তায়,
শুনিলে তাহারি নাম,
উথলে হৃদয়ধাম,

পরাণ শিহরি উঠে সুধা পড়ে গায়
এক দিন দূরে—দূরে,
অনন্তে অমরপুরে
নিয়ে যাবে সে আমারে, কয়েছে আমায়,
সে আমার কাছে কাছে,
দিন রাত সদা আছে,
পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে চ'লে যায়,
তার নাম "মৃত্যু", আমি ভালবাসি তায়।

অন্তিম-প্রার্থনা

১

দূরে দূরে উঠে নিতি মরণের তান,
আকুল উদাস হিয়া শুনি সেই গান;
ভাঙিয়া স্যাধের ঘর
চলি যায় ক্ষুদ্র নর,
পিছনে সংসার থাকে সমুখে শ্মশান!
কোথায় মেঘের 'পরে
মরণ ঝঙ্কার করে,
জানি না সে কেন ডাকে, কেন চাহে প্রাণ,
কেন সে আগুনে ছুটি পতঙ্গ সমান?

২

তুমি যদি লহ হরি! এ অধম প্রাণ,
সুখে এ বাঁধন ছিঁড়ি করিব প্রয়াণ।
মরণে কিসের ভয়,
মরিব, মরিতে হয়,

দাসের এ ক'টী কথা রেখ ভগবান্!
যেন এ দীনের তরে
কেহ না বিষাদ করে,
না পড়ে মায়ের অশ্রু, না জাগে সন্তান,
মৃত্যু যেন করে স্নেহ-কোমল আহ্বান।

৩

অভাগার এ মিনতি অন্তিম শয্যায়,
তোমার প্রেমের ধরা
এত শোভা-সুখে ভরা,
সহজে ছাড়িতে বিভো! কার মন চায়?
তাই জীবনের সাঁঝে
এ মহাসৌন্দর্য্য মাঝে
ডুবিব জন্মের মত—বড় সাধ যায়,
মনে রেখ, অভাগার অন্তিম শয্যায়।

আমি যেন মরি হরি! বাসন্তী উষায়-
ফুলময়ী বসুন্ধরা
বাতাসে অমিয়া-ভরা,
দিগন্ত উছলি পাখী কল-কণ্ঠে গায়;
সোণার কিরণ দিয়ে
ধরাখানি সাজাইয়ে
বালক রবিটী যবে হাসিয়া দাঁড়ায়!
আমি যেন মরি সেই বাসন্তী উষায়।

৫

অথবা—

আমি যেন মরি হরি ! শ্যামা বরষায়—
নীলাকাশে ঘনঘটা,
নিবিড় নীলিমছটা !
চঞ্চলা চপলা ছোটে ভীম ভঙ্গিমায় !
ধরণীর হৃদিতল
ছাপাইয়ে বহে জল,
তুফানে তুফান, বুঝি ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় !
আমি যেন মরি সেই শ্যামা বরষায় ।

৬

অথবা—

আমি যেন মরি হরি ! শারদী সন্ধ্যায়—
বিমল চাঁদের ভাসে
আকাশ অবনী হাসে,
তরল জ্যোছনা ঢালা কমল-পাতায় !
প্রকৃতি করেন কেলি
পরিয়া সবুজ চেলি,
সোণার আঁচল উড়ে আকাশের গায় !
আমি যেন মরি সেই শারদী সন্ধ্যায় ।

৭

আমি যেন মরি হরি ! সেই নদী-তীরে—
যেখানে বাদাম গাছে
শারী-শুক চেয়ে আছে,
চুমি চুমি বেলাভুমি ঢেউ চলে ধীরে

সেই স্নেহ-সিক্ত বুকে
ডুবিব অসীম সুখে,
ঘুমিব অনন্ত কাল পড়ি সশরীরে!
আমি যেন মরি সেই কপোতাক্ষী-তীরে!

৮

আমি যেন মরি হরি! সেই গৃহ-তলে—
জনতার বহু দূর,
নিভৃত যে অন্তঃপুর,
নিঠুর কুটিল আঁখি যথা নাহি চলে!
শৈশব-কৈশোর-রেখা,
যেখানে রয়েছে লেখা,
ভগ্ন হৃদয়ের অশ্রু দগ্ধ কালানলে!
আমি যেন মরি সেই প্রিয় গৃহতলে!

৯

আমি যেন মরি হরি! সেই স্নেহ-ছায়—
যে পূত করুণারাশি
অনশ্বর অবিনাশী!
পলে পলে যে মমতা জীবনী জাগায়!
যে সব হৃদয়, আহা!
ত্রিদিবে মিলে না যাহা!
অমৃতে অমৃতভরা অণু-কণিকায়!
আমি যেন মরি হরি! সেই স্নেহ-ছায়।

১০

আমি যেন মরি হরি ! হেরি শত সুখ—
আমি যেন দেখে যাই—
জগতে বেদনা নাই,
মানবের বুকে নাই ছলা-মলা-দুখ ;
সবাই আনন্দে ভাসে,
পরাপরে ভালবাসে,
বিশ্ব-ভরা দয়া, ধর্ম্ম, উৎসাহ, কৌতুক ;
আঁধার ভারতাকাশে
পুন রবি শশী ভাসে,
দেবতা প্রসন্ন তারে, সুখে ভরা বুক !
আমি যেন মরি হরি ! সেই মহাসুখ !

১১

আমি যেন মরি হরি ! স্মরি সেই নাম—
সংসারের স্নেহ-প্রীতি,
মরমের সুখ-স্মৃতি,
জীবনের পুণ্য-সত্য-উল্লাস-আরাম !
সে নাম স্মরণ করি
যতই মরণ মরি,
পূর্ণ পরাণের আশা পূর্ণ মনস্কাম !
জপি যদি ইষ্টমন্ত্র
স্তব্ধ হয় দেহ-যন্ত্র,
সে যে অমরতা, মোক্ষ, বৈকুণ্ঠে বিরাম !
আমি যেন ম'রে যাই ভেবে সেই নাম !

অনন্ত প্রহেলিকা

১

কে মোরে শুনাবি আজি অনন্তের কথা ?
সে দেশে কি কালো জল,
রাঙা ফুল, পীত ফল,
দোলে কি তরুর গায়ে কুসুমিতা লতা ?
সে দেশে কি চাঁদ হাসে,
শীতান্তে বসন্ত আসে ?
সে দেশে কি ঢালে কেউ ব্যথিতে মমতা ?
কাহারে সুধাব আজি অনন্তের কথা !

২

সেথা কি চাঁদিমা-আলো উঠিল উথলি,
হইয়া আপন-হারা
চেয়ে থাকে দু'টী কা'রা,
জাগিয়া ঘুমের ঘোরে বিভোর কেবলি ?
নবস্ফুট ফুল-বেশে
কচি মুখে আধ হেসে—
"চাঁদ আয়" ব'লে কেউ দেয় করতালি ?
উষার আঁচলে রবি ফোটে কি উজলি' ?

৩

সেখানে কি সুমধুর মলয়ের বায়
লইয়া সৌরভরাশি
মাখিয়া উষার হাসি
বহে কি মৃদুলতর সুধা ঢালি গায় ?

করুণা-লহরী-সমা
সে দেশে কি আছে রে ! মা
ডাকে নিতি সন্ধ্যাকালে "যাদু কোলে আয়" ?
সেখানে কি ভালবাসা হৃদয় জুড়ায় ?

৪

সে দেশ কেমনতর ? শুধু আলোময় ?
প্রভাতি তপন-হাসি,
শারদ কৌমুদীরাশি,
বিজলীর চারু ছটা, তার কাছে নয় ?
অথবা আঁধার শুধু
কেবলি করিছে ধূধূ
কোথা বা অমার রেতে জলদ-উদয়,
সে দেশ কেমনতর কে জানে নিশ্চয় ?

৫

যারা তথা যায় আর ফিরে তো আসে না !
ডাকিয়া হয়েছি সারা,
কেমন নিষ্ঠুর তারা !
নাই শব্দ নাই সাড়া, কিছুই বলে না !
ভাবি তাই দিবারাতি—
কিসের উৎসবে মাতি,
ভুলিয়া রয়েছে হায় ! সকল কামনা,
একেবারে গেল চ'লে ফিরিয়া এল না !

৬

চলি যায় নব শিশু, আসে নাকো আর,
ফেলিয়া বুকের ধন
করে মাতা পলায়ন,
যায় পতি ফেলি প্রিয়া প্রিয়-কণ্ঠহার !
যায় বোন ছেড়ে ভাই,
কারো মনে দয়া নাই,
জনমের মত গেল, এল নাকো আর !
রৈল শুধু শোক-অশ্রু, শুধু হাহাকার !

৭

কি জানি অনন্ত কোথা নীলিমের পার,
আঁধার আঁধর যেন,
আমি তা বুঝিনে কেন !
যে গেল সে ফিরে কেন এল না আমার ?
চলি গেছ কত দিন
নিতি আমি গণি দিন,
ফিরে কি জগতে তুমি আসিবে না আর ?
ফুরাবে না শুকাবে না এই অশ্রুধার ?

৮

আর কি জগতে তুমি ফিরিবে না হায় !
আর কি তেমন ক'রে
হাসিবে না শূন্য ঘরে,
ভরিবে না শূন্য হৃদি সুধার ধারায় ?
তবে এ মলিন প্রাণ
হোক্ হোক্ অবসান,

হোক্ সুখ বলিদান এ মহাপূজায়,
আপনি দেখিব চোখে অনন্ত কোথায় !

ভাঙিও না ভুল

১

প্রভো ! ভাঙিও না ভুল,
যে কদিন বেঁচে র'ব,
তোমারে "আমারি" ক'ব
অন্তিমে খুঁজিয়া ল'ব, ও চরণমূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিও না ভুল।

২

প্রভো ! ভাঙিও না ভুল,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা,
তুমি মোর রচয়িতা,
কি কাজ খুঁজিয়া মম সৃষ্টিতত্ত্ব-মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিও না ভুল।

৩

প্রভো ! ভাঙিও না ভুল
আমি দাস তুমি প্রভু,
আমি হীন তুমি বিভু,
আমারি দেবতা তুমি অমৃত অতুল
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিও না ভুল।

৪

প্রভো ! ভাঙিও না ভুল,
স্নেহময়ী বসুন্ধরা,
তোমারি সৌন্দর্য্যভরা,

তোমারি প্রেমের সিন্ধু অনন্ত অকূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

৫

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
তোমারি স্নেহের শ্বাসে,
চাঁদ হাসে রবি হাসে,
তোমারি সোহাগ-মাখা কুসুম-মুকুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

৬

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
পিতা-মাতা-ভাই-বোন,
দম্পতীর সম্মিলন,
সকলি তোমার দান অমূল অমূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

৭

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
তোমারি ব্রহ্মাণ্ডভূমি,
অনাদি অনন্ত তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল

৮

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
তব এ নিখিল বিশ্ব,
তুমি গুরু আমি শিষ্য,

আমারে শিখায়ে দিও কর্ত্তব্যের মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

৯

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
তোমারি আশীষ-বরে,
খাটি যেন তোমা-তরে,
কি দুঃখ? হিংসুক যদি ভাবে চক্ষুশূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

১০

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
ভয় কি সে শোক-রোগে,
ভয় কি অশান্তি-ভোগে,
আমার "আমিত্ব" যাহে তুমি তারি মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

১১

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
বুঝি নে বেদান্ত, তন্ত্র,
জানি নে তপস্যা, মন্ত্র,
আমি তব, তুমি মম—এই জানি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল!

১২

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
আমি কে? তা বুঝি এই,
তুমি ছাড়া আমি নেই,
আমি তব অণুকণা তব পদধূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

১৩

ভাঙিও না ভুল প্রভো ! ভাঙিও না ভুল,
এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গভূমি,
এক অভিনেতা তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল ;
ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যাক্,
এ প্রাণ তোমাতে থাক্,
ও চরণ বুকে থাক্ হ'য়ে বদ্ধমূল,
জীবলীলা-অবসানে,
ওই প্রেমসিন্ধু-পানে,
ছুটিবে জীবন-গঙ্গা করি কুল-কুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিও না ভুল ।

'কনকাঞ্জলি' :

কি ক্ষতি আমার ?

১

কিসে কি ক্ষতি আমার !—
না হয়, আঁধার-মগ্ন
জীবনের সুখ-স্বপ্ন,
না হয়, মলিন প্রাণ আরো অন্ধকার !
না হয়, আপনা ভুলে,
পড়েছি জলধি-কূলে,
না হয়, গ্রাসিতে আসে ভীম পারাবার !—
আমি তো তোমারি, বিভো ! কি ক্ষতি আমার ?

২

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
আশা ছিল, বন-বালা
গাঁথিয়া মালতী-মালা,
আদরে বসন্ত-ভোরে দিবে উপহার ;
আশা ছিল হৃদিতলে,
আনন্দে পরিব গলে,
মনোরম সে মালিকা, দেব-বালিকার !
সে আশা "দুরাশা" তাহে কি ক্ষতি আমার ?

৩

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
ভেবেছিনু বসুন্ধরা
বাসন্ত-কুসুম-ভরা,
আঁচলে মলয়া চলে, শিরে তারা-হার ;
মুখে পাপিয়ার রব,
মধুর মধুর সব !—
দেখি যে বরিষা নেছে কেড়ে সে বাহার !
জলাভূমি ধরা, তাহে কি ক্ষতি আমার ?

৪

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
ঘর বেঁধে মহাবনে
ভেবেছিনু মনে মনে—
"আনন্দ-আশ্রম" মম সোণার আগার !
অকস্মাৎ মহা ঝড়ে,
সে ঘর ভাঙিয়া পড়ে !

মাটিতে মিশিল হায়! হয়ে চুরমার!
ভাঙিল কুটীর যদি, কি ক্ষতি আমার?

৫

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
ভেবেছিনু, কাছে গেলে
দিবে সখী সুধা ঢেলে,
আঁচলে মুছায়ে দিবে তপ্ত অশ্রুধার;
প্রাণের লুকানো ব্যথা
ভুলাইবে স্নেহলতা,
জুড়াবে তাপিত বুক, ছায়া পেয়ে তার,
সে নয় দেখে নি চেয়ে, কি ক্ষতি আমার?

৬

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
বড় সাধ ছিল মনে,
স্বরগে কমল-বনে
পাতিব আসন মম প্রীতি-প্রতিমার;
কনক-মন্দার গলে,
কনকের শতদলে
দাঁড়ায়ে কনকলতা ছড়াবে বাহার!
পূরিল না সে কামনা, কি ক্ষতি আমার?

৭

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
আমা হেরি অহর্নিশ
অমৃত উপজে বিষ,
পলকে নন্দন-বন হয় ছারখার;

পাইলে আমার সাড়া,
মনে করে "লক্ষ্মীছাড়া",
বিরক্ত, আতঙ্কে কেহ খোলে না দুয়ার !—
(আমার বিষাক্ত বায়ু, দোষ দিব কার ?)

৮

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
প্রাণের অসীম আশা,
বলিতে যা হারে ভাষা,
হৃদয়ের অবক্তব্য সাধ আব্‌দার ;
সেই সব বোঝা লয়ে,
চিরকাল মরি ব'য়ে,
কিছুই মুহূর্ত্ত তরে পোরে না আমার !
আমি যদি সোণা ধরি,
ছাই হয়, ভয়ে মরি !
কপাল এমনি পোড়া দীন অভাগার !—
পোড়া কপালের ভস্ম,
তাই যার "সরবস্ব,"
তার কাছে চাও কেবা, কিবা সমাচার ?—
—সে সব আমারি থাক
আমাতেই মিশে যাক,
সবে হবে এক সাথে চিতার অঙ্গার !—
পর বা অপর হও,
আমা হ'তে দূরে রও,
ছুঁলেই ফুরায়ে যাবে কুবের-ভাণ্ডার !
আমারে বিধির লেখা,
আমি র'ব একা একা,
টানিব ভগন বুকে শত বোঝা ভার !
একলা একটি ধারে
কাল—চিরকাল, হা'রে !

কাটাব, লইয়া চিতা সাধ বাসনার !
জগত জাগিয়া থাক,
অথবা ভাঙিয়া যাক,
আমারে সে ডাকিবে না, ভাগ নিতে তার !
আমি শুধু জানি, কিসে কি ক্ষতি আমার ?

৯

কি ক্ষতি আমার বিভো ! কি ক্ষতি আমার ?
পরে বলে আমি হরি !
নিষ্ফল তপস্যা করি,
মৃত্তিকা মিলে না মম মাথা রাখিবার !—
তা হলেও দয়াময় !
এ পরাণে নাহি ভয়,
তুমি যে আমার দেব ! কোটি পুরস্কার !
সংসারের শত ঝড়
চলুক মাথার পর,
চাহিয়া দেখিতে মম নাহি দরকার ;
তোমারে, আসন পেতে
হৃদয়ে রাখিব গেঁথে,
নিতি এ জীবনটুকু দিব "উপহার" ;
তব দত্ত সুখ দুখ,
তাহে ভরা মম বুক,
ভাবিলে পুলকে নাথ ! বাঁচি না যে আর,
সে তুমি আমারি, "ক্ষতি" কোথায় আমার ?

'বিভূতি' :

জাগ্রতি

১

চিরদিন ঘুমিয়াছি
আজি হ'ল জাগরণ,
এত দিনে বুঝিনু যে
জীবনে কি প্রয়োজন !

২

যুগে যুগে কি করেছি—
উপেক্ষা ও অবহেলা
স্বপনে কাটিয়া গেল
উজান মধ্যাহ্নবেলা !

৩

অদৃষ্টের শুভ গ্রহ
নীরবে গিয়াছে সরি,
সৌভাগ্যের দীপ্ত রেখা
মুছিয়া গিয়াছে মরি !

৪

আনমনে গেঁথেছি যা,
সবি গেছে ভেঙে চুরে,
এস আজি প্রাণারাম,
ব'স এ পরাণ পূরে।

৫

ভাঙা চোরা যত কিছু
থাক্ তা পশ্চাতে পড়ি,
সমুখে যা অসমাপ্ত
দাও শিক্ষা—তাই গড়ি।

৬

দাও বজ্র, দাও চন্দ্র,
দাও বিষ, দাও সুধা,
সুখ দুঃখ দুয়ে দিয়ে
মিটাও পিপাসা ক্ষুধা।

৭

মানুষের যাহা প্রাপ্য,
যাহা ভোগ্য, যাহা সীমা,
তাই দিও দীনবন্ধো !
সে শুভ্রতা—সে কালিমা

৮

চাহি না সে সিন্ধুপারে,
আনন্দে সোণার খাটে,
সুখাসীন রাজপুত্র
সরল জীবন কাটে।

৯

চাহি না অপ্সরাকণ্ঠে
প্রভাতে ললিত গীতি,
চাহি না শান্তির নামে
অলস জীবন প্রীতি।

১০

মানবের সুখ দুঃখ,
জীবনসংগ্রাম শত,
জয় পরাজয় আদি,
ঘটিছে যা ক্রমাগত।

১১

এক লক্ষ্য এক আশা,
অথচ অনেক কর্ম্ম ;
তোমাতে আপনা দান,
পরিত্যক্ত উপধর্ম্ম।

১২

প্রাণ দিয়ে ভালবাসা,
পায়ে দলি ঘৃণা করা ;
যেখানে যা শূন্য রবে,
তোমাতে তা হবে ভরা।

১৩

যদি জাগায়েছ প্রভো !
জীবন্ত জীবন দাও,
প্রতিদানে তাই দিব,
যা তুমি লইতে চাও।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬০

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

মূল্য ৬০ ন. প.

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—৯।১২।১৯৬২

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭০—১৮৯৯

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর (২১ কার্ত্তিক ১২৭৭) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বীরেন্দ্রনাথ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র; মাতা প্রফুল্লময়ী—বাঁশবেড়িয়ার কুলীনপ্রধান হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম বর্ষ বয়সে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।* এখানে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি হেয়ার স্কুলে চলিয়া যান এবং ১৮৮৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার বয়স "১৫ বৎসর ৩ মাস" বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে উল্লেখ আছে।

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ (২২ মাঘ ১৩০২) তারিখে সাহানা দেবীর সহিত বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ "পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে তাঁহার শুভ পরিণয় দিনে" 'নদী' কাব্যগ্রন্থখানি উপহার দিয়াছিলেন।

* বলেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও আত্মীয় (জ্যেষ্ঠতাত হেমেন্দ্রনাথের পুত্র) ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন:—"অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি [বলেন্দ্রনাথ] সংস্কৃত কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সেই বৎসর ৺মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রথম সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎপূর্ব্বে ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রিন্সিপাল ছিলেন।" ১৮৭৭ সনের মার্চ মাসে প্রসন্নকুমার বহরমপুর কলেজে বদলি হন এবং তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে ন্যায়রত্ন মহাশয় অস্থায়ী ভাবে (officiating) প্রিন্সিপাল হন।

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেনঃ—"তিনি বাণিজ্য-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়েও তাঁহার কল্পনা প্রবল ছিল; একটা কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়া তুলিব এই আশা তাঁহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল।... বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার এই অর্থকরী বিদ্যার দিকে মনের টান গিয়াছিল। স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে তিনি প্রথমে হস্তক্ষেপ করেন। এই বাণিজ্যে বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়ে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও পরে যোগদান করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল পরামর্শ-দাতা ছিলেন, আমরা দেখিতাম যাহা কিছু করিতেন তাহা বলেন্দ্রনাথই। যাহা হউক, বলেন্দ্রনাথের যত্নেই প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয় বলা যায়। এই সকল বাণিজ্যোপলক্ষে অধিক কায়িক পরিশ্রমই বোধ হয় তাঁহার শারীরিক বলক্ষয় করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহার মনোবলের বড় একটা হ্রাস হয় নাই। তিনি জীবনের শেষ ভাগে আর্য্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিসে আর্য্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ও একতা সাধিত হয় তাহার জন্য তাঁহার মনের একাগ্রতা [ছিল]।" *

বলেন্দ্রনাথ স্বল্পায়ু ছিলেন। মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে, ২০ আগষ্ট ১৮৯৯ (৩ ভাদ্র ১৩০৬) তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন।

প্রফুল্লময়ীর স্মৃতিকথা

বলেন্দ্রনাথের মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী সংক্ষেপে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই স্মৃতিকথায় পুত্র বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। স্মৃতিকথায়

* "বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়"—গ্রন্থাবলী, পৃ. ৬।

সাল-তারিখের এক-আধটু গোল থাকা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। কোন্ সালে এবং কত বৎসর বয়সে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহা তিনি ঠিকমত বলিতে পারেন নাই।—

"সেই বছর [১২৭১] ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে আমার বিবাহ হয়। দিদির বিবাহের দুই বৎসর পরেই ওই বাড়ীতেই মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার বয়স বার বৎসর ছয় মাস মাত্র। আশ্বিনের ঝড়ের বছরেই* আমার বিবাহ হয়,···। চার বৎসর বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। বিবাহের চার বৎসর পরে আমার স্বামী মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর ওই ভাবে কষ্টে কাটান। আমার বিবাহের পরই তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন†···দিন দিন শরীরের অবস্থা খারাপ হইতে থাকায় আমার শ্বশুর কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে আলিপুরের পাগ্লাগারদে পাঠাইয়া দেন। সেখানে ছয় মাস থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন। সেই সময় আমার শরীর নানা চিন্তার মধ্যে বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তাঁর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত, মনে কিছুতেই আনন্দ পাইতাম না। পাগ্লাগারদ হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে বলুর (বলেন্দ্রনাথের) জন্ম হয়।···

১২৭৭ সাল ২১শে কার্ত্তিক রবিবার বিকাল ৫টায় তার জন্ম হইয়াছিল। সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারেই কোনও কান্নার শব্দ পাওয়া যায় নাই, নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তাহার

---

* ৫ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে এই ঝড় হয়। ১২৭১ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—"গত ২০এ আশ্বিন বুধবার বেলা ১০টা হইতে বেলা ৪।। পর্য্যন্ত যে প্রবল ঝড় হয়, তাহাতে অনেকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।"

† বীরেন্দ্রনাথ ১৮৬৬ সনে বেঙ্গল একাডেমি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

পর ডাক্তারেরা নানা উপায়ে তাহাকে কাঁদাইতে সক্ষম হন। আমারও সেই সময় খুবই অসুখ। নাড়ী ছাড়িয়া কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম। আমার নানা রকম মনের অশান্তির মধ্যে ওর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারও শরীরটা তেমন সুস্থ ছিল না, দুটি পা-ও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল। তাহার দরুন অনেক দিন পর্য্যন্ত পা ঘসিয়া ঘসিয়া চলিত।···

বলু যখন সাড়ে চার বছরের, তখন আমার কাছেই তাহার হাতে খড়ি হয়। তখন হইতে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত আমি নিজেই তাকে অল্প অল্প পড়াইতাম। ছয় বছরের সময় তাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলাম। সে তার মামাতো ও জ্যেঠতুতো ভাইদের সঙ্গে আমাদের সরকারী গাড়ীতে করিয়া পড়িতে যাইত, কিন্তু তার পায়ের দোষ থাকায় অন্য ভাইরা ঠাট্টা করিত। এই কথা শুনিতে পাইয়া আমি প্রিয়নাথ ডাক্তারের গাড়ী কিছু দিনের জন্য ভাড়া করিয়া পাঠাইতে লাগিলাম। তাহার পর তার জন্য ঘোড়াগাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলাম, সে তাহাতে করিয়া যাইত। বার বছর বয়সের সময় সে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হয় ও পনের বছর বয়সে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেয়। যে বছর বলু বিদ্যালয়ে যায় সেই বছরে আমার শাশুড়ীর মৃত্যু [১১ মার্চ ১৮৭৫]* হইয়াছিল। বলুর বিদ্যালয়ে যাইবার সংবাদ আমার কাছে পাইয়া, তিনি খুবই খুশী হইয়াছিলেন।···

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্নী—সারদা দেবীর মৃত্যু হয় ২৭ ফাল্গুন ১২৮১। ১৭৯৭ শকের বৈশাখ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ:—"৩০ ফাল্গুন শনিবার। মাতার চতুর্থী শ্রাদ্ধক্রিয়াতে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্থনা। তিন রাত্রি গত হইল আমার মাতা তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় এলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।" "ব্রাহ্মমুহূর্তে" সারদা দেবীর মৃত্যু হয় (সৌদামিনী দেবী: "পিতৃস্মৃতি"—"প্রবাসী", ফাল্গুন ১৩১৮). সুতরাং ইংরেজী-মতে তাঁহার মৃত্যু-তারিখ—১১ মার্চ ১৮৭৫।

আমাদের এই সব সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া বলু বড় হইতেছিল। বাপের ওই রকম অবস্থা হওয়াতে তার মনে তখন হইতেই একটা বড় হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। যখন আট-নয় বছরের, সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত যে, সে লেখাপড়া শিখিয়া ইঞ্জিনিয়ার হইবে। লেখাপড়া তার নিকট একটা প্রিয় বস্তু ছিল, কোনও দিন তাহাতে অবহেলা করে নাই। যখন ওর তের বছর বয়স সেই সময় আমরা একবার শ্রীরামপুরে যাই। সেখানে থাকিবার সময় একদিন একটা মাঝি নৌকায় চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল, "আমার খুড়োখুড়ী পায় না মুড়ী" ইত্যাদি। এই গান শোনার পর হইতেই ওর মনে কি এক রকম ভাব উপস্থিত হয়, তখন হইতে সে প্রায়ই এক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে শোনাইত। বুঝিবার মত লেখাপড়া যদিও আমার তেমন জানা ছিল না, কিন্তু তবুও শুনিয়া ভালই লাগিত। তখন হইতেই স্যহিত্যের প্রতি তাহার দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বলুর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স সেই সময় ডাক্তার ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাহানা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহে খুবই ঘটা হইয়াছিল।···বলুর বিবাহ ১৩০২ সালে ২২শে মাঘ হয়। বউ যখন ঘরে আসিল তখন এত কষ্ট ভোগের পর মনে বড় আহ্লাদ হইল, ভাবিলাম এইবার ঈশ্বর আমাকে একটু বুঝি সুখের মুখ দেখাইলেন। সাহানার যখন বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার পূর্ণ হইয়া তের বছর। দেহের রং যদিও শ্যামবর্ণ, কিন্তু চেহারা খুবই সুশ্রী ছিল। স্বভাবটি সরল শিশুর মত, যে যাহা বলিত বা ঠাট্টা করিত, সে তাহাই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইত। আমার কন্যা হয় নাই, সে আমার কন্যার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।···

একবার [৩০ জুন ১৮৯৭] আমাকে বলুকে সঙ্গে লইয়া কোন একটি

আত্মীয়ের দুটি কন্যার বিবাহ স্থির করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। যখন বাড়ীতে ফিরিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পথের মধ্যে হঠাৎ শুনিলাম যে, কলিকাতার উপকণ্ঠে চিৎপুরে মুসলমান এবং ইংরাজদের ভিতর ভীষণ রকম মারামারি আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে অতি ভয়ানক রকমে মারিতেছে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমীর উপর একটা মস্‌জিদ ছিল, সেই মস্‌জিদ্‌টি ইংরাজের সাহায্যে তিনি ভাঙিয়া ফেলেন। তারই জন্য ইহাদের আক্রোশ। আগে জানিতাম না, রাস্তার মাঝে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলাম—আমাদের ঘরের গাড়ী ছিল, আমারই এক ডাক্তার নন্দাইয়ের গাড়ীতে সে দিন গিয়াছিলাম। তাহারা কোচম্যানকে প্রথমে কার গাড়ী জিজ্ঞাসা করাতে সে অত বিবেচনা না করিয়া বলে যে 'সাহেবের'। এই কথা বলিবামাত্র অজস্র ধারায় ইট লাঠি সমানে গাড়ীর উপর পড়িতে লাগিল। গাড়ীর কাঁচ ভাঙিয়া চারি দিকে ছিটকাইয়া পড়িল। আমি বলুর মাথাটা আমার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার পিঠের উপর অনেক ইট আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের যখন এই অবস্থা, তখন কোচম্যান চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এ গাড়ী বাঙ্গালীবাবুর—সাহেবের নয়।" তাহারা গাড়ীর নিকটে যখন আসিয়া দেখিল সত্য সত্যই ইহা বাঙ্গালীর গাড়ী তখন নিরস্ত হইল। আমরাও কোন রকমে প্রাণটুকু হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী আসিয়া তিন-চার দিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দুজনে পড়িয়া ছিলাম। সারা দেহে অসহ্য রকম বেদনা এবং তার দরুণ যন্ত্রণায় আমার সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া ওষুধপত্তর ব্যবস্থা করিবার পর ক্রমশঃ আরাম পাই। বলুর কপালের ভিতর একটি ছোট কাঠের টুকরা বিঁধিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল, তার পর আপনা হইতেই সেটা বাহির হইয়া যায়।

পঞ্জাবে আর্য্যসমাজের সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহাতে মিলন ভিত্তি স্থাপন হয়* সেই জন্য তাহার প্রাণের প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং তাহারই জন্য বলু আর্য্যসমাজে যাতায়াত করিতে থাকে, তাঁহারাও তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কখনও বিবাদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে বলুকে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেন, এবং সে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া মিলন স্থাপন করিয়া আসিত। তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ আর জীবনে ঘটিয়া উঠিল না। দ্বিতীয় বার যখন সে তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া যায় [মাঘ ১৩০৫], সেই দিন আমার মেজ জায়ের কন্যা ইন্দিরার ফুলশয্যা। সেই জন্য সকলেই তাকে যাইতে বারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাওয়াতে পাছে কর্ত্তব্যের অবহেলা হয় বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও সে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এবং কাছাকাছি অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসিল। সীতাকুণ্ডেতে স্নান করিবার পর তার কানে খুব যন্ত্রণা হয় এবং তাহা লইয়াই বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। বাড়ী আসার পর নানা রকম সেবা-যত্নে কানের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই সময় ঠাকুর কোম্পানীর হিসাবপত্তর চুকাইবার জন্য তাহাকে শিলাইদহে জমীদারিতে যাইতে হয়। সাহানা ওখানে আমার ছোট জায়ের কাছে ছিল, তাহাকে সেই সময় ওখানে একজন ইংরাজ মাষ্টার পড়াইত। সারা দিনরাত হিসাবপত্র লইয়া বলু এত ব্যস্ত থাকিত যে, সময়মত স্নানাহার তাহার হইত না, কখনও বা বেলা তিনটায় কখনও বা

* এই মিলন সাধনের জন্য বলেন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সনের মে ও জুলাই মাসে আর্য্যসমাজের সহিত ইংরেজীতে যে পত্রবিনিময় করিয়াছিলেন, ১৮২০ শকের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত দুইখানি পত্রের অনুবাদ পরবর্ত্তী শ্রাবণ-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঁচটায় খাইত, এইরূপ অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় কানের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া উঠে। সে যখন শিলাইদহে, তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে, বলু আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "মা আমার শরীর ভাল নাই।" ইহার পর আমার মন তাহার জন্য আরও অধিক অস্থির হইতে লাগিল। আমি সাহানাকে লিখিলাম যে, তাহাকে আমার কাছে শীঘ্র পাঠাইয়া দাও, আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার চিন্তার অবধি রহিল না, কিসে সে আরাম হইবে এই কেবল ভাবিতে লাগিলাম। অঘোর ডাক্তার, উমাদাস বাঁড়ুয্যে, ডাক্তার সালজার এই তিন জনে দেখিতে লাগিলেন। তাঁরা আমাকে বলিতেন, যে, ভয়ের কোনও কারণ নাই, ভাল হইয়া যাইবে, কিন্তু আমি কিছুতেই সে ভরসা পাইলাম না। বাড়ীর সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাইতে চাই কি না, আমার তখন ভাবনা-চিন্তায় মনের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাঁহারাই তখন সাহেব ডাক্তারকে আনাইয়া দেখান। বলুর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। যে দিন সে জন্মের মত আমাকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, সেই দিন রবি (আমার ছোট দেওর) আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, "তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে মা, মা করিয়া ডাকিতেছে।" আমি এক এক সময় তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে বসিলাম, তখন তাহার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল, আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহার পর একবার বমি করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে তাঁহার কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই

সময় তাহার দীপ নিভিয়া গেল।...যে দিন তার মৃত্যু হয় সেই দিন আমার স্বামী ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, চাকরদের নিকট বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বাড়ীতে সব তালাবদ্ধ কেন ?" যদিও তখন তিনি উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু ভগবান্ তাঁর ভিতরেও পুত্রশোকের দারুণ যন্ত্রণার অনুভব-শক্তি দিয়াছিলেন।

যাহাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে হইবে একথা মনেও জানিতে পারি নাই, তাহাকে ছাড়িয়া একত্রিশ বছর কাটিয়া গেল। উনত্রিশ বছর বয়সে ১৩০৬ সাল, ৩রা ভাদ্র তাহার মৃত্যু হয়।"—"আমাদের কথা" ঃ 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৩৭।

রচনাবলী

অল্প বয়স হইতেই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋতেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ—"[সংস্কৃত কলেজের] ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিয়া সংস্কৃত কাব্যরসের আস্বাদ অল্প অল্প লাভ করিলাম। সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম নবম বর্ষ মাত্র। সেই সময়ে আমাদের সাহিত্য রচনার প্রবৃত্তি উষাকিরণের রক্তিম আভার ন্যায় প্রথম দেখা দিল। আমরা দুজনেই কোন একটা বিষয় লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিতাম। একই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ লিখিতেন গদ্যে আমি লিখিতাম পদ্যে।" ছাত্রাবস্থায় রচিত ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত 'বালকে' প্রকাশিত "একরাত্রি (বালকের রচনা)" নামে প্রবন্ধ (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) ও "সন্ধ্যা" নামে কবিতাই (ফাল্গুন ১২৯২) ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম গদ্য-পদ্য রচনা। তাঁহার সাহিত্য-ক্ষমতার প্রতি পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহ-বারি-সিঞ্চনে তাঁহার সাহিত্য-জীবন বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

তরুণ বয়সেই বলেন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে। জীবদ্দশায় তিনি মাত্র তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; সেগুলি—

১। **চিত্র ও কাব্য** (নিবন্ধ)। ৫ ভাদ্র ১৩০১ (২০ আগষ্ট ১৮৯৪)। পৃ. ১১৭।

সূচী :—কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, জয়দেব, পশুপ্রীতি, কাব্যে প্রকৃতি, রবিবর্ম্মা, হিন্দু দেবদেবীর চিত্র।— এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে এগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

২। **মাধবিকা** (কাব্য)। ১০ বৈশাখ ১৩০৩ (২১ এপ্রিল ১৮৯৬)। পৃ. ৩২।

৩। **শ্রাবণী** (কাব্য)। ৪ আষাঢ় ১৩০৪ (১৭ জুন ১৮৯৭)। পৃ. ২৬।

গ্রন্থাবলী।—১৯০৭ সনের আগষ্ট মাসে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" সহ 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী' (পৃ. ৭৩৫) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাবলীতে বলেন্দ্রনাথের পুস্তক তিনখানি ও নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে কতকগুলি রচনা ইহাতে বাদ পড়িয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর একটি ত্রুটি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "রচনার কালানুক্রমে সঙ্কলন করিলেও লেখকের শক্তির ও মতামতের ক্রম-পরিণতি বুঝিবার সাহায্য ঘটিত; কিন্তু তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই।" এমন কি, পুনর্মুদ্রিত রচনাগুলি কোন্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যা হইতে গৃহীত, তাহার নির্দ্দেশও গ্রন্থাবলীতে পাইবার উপায় নাই। তাঁহার রচনাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা আমি অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি ('বিশ্বভারতী পত্রিকা,' মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩।

এখানে কেবল যে-রচনাগুলি গ্রন্থাবলীতে স্থান পাওয়া উচিত ছিল, তাহারই উল্লেখ করিতেছি :—

১। **আশা**—'ভারতী ও বালক,' আষাঢ় ১২৯৪।

২। **কল্লোলিনী** (কবিতা)—'ভারতী ও বালক,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭।

৩। **বিজ্ঞতা** (কবিতা)—'সাহিত্য', আষাঢ় ১২৯৭।

৪। **কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল**—'সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

৫। **প্রাকৃটিক্যাল**—'সাহিত্য', ভাদ্র ১২৯৮।

৬। **লণ্ডনে কংগ্রেস**—'ভারতী ও বালক,' ভাদ্র ১২৯৮।

৭। **রবিবর্ম্মা** (অসমাপ্ত); **লাহোরের বর্ণনা** (অসমাপ্ত); **শিবসুন্দর***—'প্রদীপ', আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৬।

বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার এই কয়টি অপ্রকাশিত রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে :—

নীরবে —'সাহিত্য', আষাঢ় ১৩২৩।

সৌরভ, তুলনায়, বিদায় (কবিতা)—'বিশ্বভারতী পত্রিকা,' বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩।

ব্রহ্মসঙ্গীত

সঙ্গীত-রচনাতেও বলেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত দুইটি গান 'ব্রহ্মসঙ্গীত' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। গান দুইটি—

* রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"বলেন্দ্র কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কলিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসন্ধ মহাশয়কে 'প্রদীপ'-সম্পাদকের নিকট ঋণমুক্ত করিলাম।"

(১)

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময় !
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমায়ে রয় !
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয় !
কোটি রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণ-ধারা তোমাতে পাইছে লয় !

(২)

নিশীথ নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখি-তারা,
সুপ্ত লোক লোকান্তরে সে আঁখি নিমেষহারা !
শ্বাসহীন মহাপ্রাণ মহাকাশে স্তম্ভমান,
অচেতন বিশ্বে বহে অনন্ত চেতনা-ধারা।
ছাড় যোগী নিদ্রাবেশ, হের আঁখি অনিমেষ,
মিল' সে জাগ্রত প্রাণে, ভাঙ্গ এ কুহক-কারা।

সজনীকান্ত দাসের লিখিত ভূমিকা-সহ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী"র একটি সুষ্ঠু সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। (পৃ.—/০-১৲ + ৬১৬)

বলেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

সুবৃহৎ সম্ভাবনা লইয়া যাহার জন্ম, অকস্মাৎ কালের নির্ম্মম আঘাতে অকালে তাহার তিরোধান ঘটার মত শোকাবহ ঘটনা পৃথিবীতে বিরল ; বাংলা সাহিত্য-সংসার হইতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরবিদায় এইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার। তাঁহার অল্পস্থায়ী জীবনেই কয়েকটি

কবিতা এবং অনেকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিভার যে-পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধে' বাংলা-সাহিত্যে প্রবন্ধ-রচনার যে নবধারার প্রবর্ত্তক, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতে সেই ধারার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই। আজও পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে এমন কবিত্বময় গদ্য আর কেহ রচনা করিতে পারেন নাই, বস্তুতঃ প্রবন্ধ-সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথ এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অকাল মৃত্যুর জন্য বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার স্পর্শ দিয়া তিনি চিরস্থায়ী ও সর্ব্বজনমান্য আসন দখল করিতে পারেন নাই; যেটুকু তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা এক বিপুল সম্ভাবনার আকস্মিক বিনাশের জন্য হাহাকার করিতে পারি।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে মনীষী প্রিয়নাথ সেন আলোচনা করেন। এই আলোচনা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রদীপে' (আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩০৬) প্রকাশিত হয়। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেই শোক-সন্তপ্ত হইয়াছেন। প্রথম হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তি বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছে। কি গদ্যে—কি পদ্যে তাঁহার একটি অভিনব সুন্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রথম গদ্য-প্রবন্ধে—তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তকে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার নবীন উন্মেষ পরিণত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশিত। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিশোর প্রতিভা প্রায়ই পূর্ব্বতন আচার্য্য-দিগের পদানুসরণ করে। আমরা তাঁহার তরুণ কণ্ঠস্বরে পরিচিত পুরাতন স্বরভঙ্গী শুনিতে পাই—ভাষা-গঠনে পরিচিত শব্দবিন্যাসপদ্ধতি দেখিতে পাই—এবং ছন্দ-রচনায় পূর্ব্বতন কবিদিগের শিল্পচাতুর্য্য অনুভব করি। বলেন্দ্রনাথের ইহা কম প্রশংসার কথা নয় যে প্রথম হইতেই

তাঁহার রচনাপ্রণালী তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে, যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত—যখন যে কোন আধুনিক কবিতা পড়িবে, তাহারই ভিতর অল্প বা অধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাব, ভাষা বা ভঙ্গীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের—তাঁহার সেই শিক্ষা-গুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আমি এমন বলিতেছি না যে, বলেন্দ্রনাথের গদ্যে বা পদ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। পরবর্ত্তী লেখককে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্ব্বতন সম্পন্ন লেখকের নিকট কিছু না কিছু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইতেই হইবে। তবে যাঁহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে যিনি কোনরূপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, বিলম্বে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিভা-গৌরব স্বাধীন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেন্দ্রনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল। ফল কথা, তিনি জন্মকবি—আজন্ম রচনা-রসিক (stylist)। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজত্ব ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে তিনি যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, পদ্যে আজও তাহা পারেন নাই। ইহার অর্থ নয় যে, তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা অপরিণত বা অসম্পূর্ণ। আমার বক্তব্য এই যে, গদ্যের সকল পর্দ্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গী নাই, যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পদ্য সম্বন্ধে আমরা ঠিক এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহার পদ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয় কবির অন্তর্লীন ক্ষমতা এখনও সমস্ত বিকাশ পায় নাই এবং কালে এই সৌন্দর্য্য পরিসরে আরও বিস্তৃত হইবে—ইহার গভীরতা আরও বাড়িবে এবং ইহার ঝঙ্কার ও উন্মাদনা আরও বৈচিত্র্য লাভ করিবে। গদ্য এবং পদ্যের মৌলিক বিভিন্নতা কিন্তু এইরূপ ভাবিবার অপর

কারণ। গদ্যের শক্তি ও উৎকর্ষের সীমা আছে—পদ্যের নাই—গদ্যে মানব হৃদয়ের সমস্ত উচ্চতার 'নাগাল' পায় না—গভীরতার 'থৈ' পায় না—সৌন্দর্য্যের সমস্ত উচ্ছ্বাস, ললিত-তরঙ্গ ধরিতে পারে না—জীবনের অসীম বিস্তৃতি ব্যাপিতে পারে না। কিন্তু মিল ও ছন্দে—ঝঙ্কার, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায়—কমনীয়তায় ও নমনীয়তায় পদ্য-জীবনের সমস্ত অনির্দ্দেশ পরিধি তাহার আলোকময়ী গতির চারু বিকম্পনে উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি ও প্রথম শ্রেণীর গদ্য-লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে, পদ্যের পক্ষ ও চরণ দু-ই আছে—কিন্তু গদ্যের পক্ষ নাই, কেবলমাত্র চরণ আছে। বলেন্দ্রনাথের গদ্যপাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হই। পদ্যপাঠে আনন্দলাভ করিলেও, আরও উচ্চতর রচনার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

'ভারতী'তে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া গদ্যে বলেন্দ্রনাথ একখানি পুস্তক 'চিত্র ও কাব্য' এবং পদ্যে 'মাধবিকা' এবং 'শ্রাবণী' নামে দুই-খানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন।

'চিত্র ও কাব্য' সাহিত্য ও ললিতকলা-বিষয়িণী সমালোচনা। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রস-গ্রাহিতা-শক্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—ততোধিক আশ্চর্য্য হইতে হয় ভাবোচ্ছল ভাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে। লেখার ভিতর বুদ্ধির কোন প্যাঁচ নাই—পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন প্রয়াস নাই—চকৃচকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেলা নাই। কেবল কাব্য ও কলা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ তন্ময় হৃদয়ের বিভোরতা আছে। এই গ্রন্থে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেব প্রভৃতি কবির কাব্যসমালোচনায় তাঁহাদিগের প্রতিভার স্বরূপ অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। কাব্যোপভোগ-জনিত আনন্দের সহিত অমৃত-মিশ্রণে প্রোজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত অতি সহজ সরল যুক্তি সকল হৃদয়কে মধুর আকর্ষণে সত্য ও সৌন্দর্য্যের কনকমন্দিরে উপনীত করে। গ্রন্থের ভিতর কোথাও

দেখিলাম না। মিথ্যা বাক্‌চাতুরীর জালে চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্য সকলের মর্য্যাদা লোপ করিয়া তাহাদের স্থানে উৎকট অভিনব মত স্থাপনের চেষ্টা—এবং রস ও সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রধান অন্তরায় কাব্যকলার তত্ত্বোদ্ভাবন-রূপ হালের আমদানী রোগ এ সুস্থ লেখকের লেখায় স্থান পায় নাই।

জয়দেব সম্বন্ধে প্রবন্ধটি কাব্য-সমালোচনার আদর্শ। রসগ্রাহী লেখক জয়দেবের দোষ ও গুণের মর্ম্মস্থান দেখাইয়া দিয়াছেন। "গীত-গোবিন্দ" যে প্রকৃত গীত—তাহার ভাব-দরিদ্র, বিরল-চিত্র পদাবলী কাব্যাংশে তেমন উপাদেয় না হইলেও তাহাদের কোমল-কান্ত শব্দ-বিন্যাস এবং বিচিত্র ঝঙ্কার যে গানের সর্ব্বথা উপযুক্ত, ইহা দেখাইয়া সন্দিহান পাঠককে জয়দেবের গানের প্রকৃত গৌরব এবং অসাধারণ উৎকর্ষ বুঝাইয়াছেন, এবং অপর দিকে দেখাইয়াছেন বিলাসকলাবর্ণনা-পটু কবির গীতের কোথাও প্রেমের অসীম স্বরূপ প্রতিভাত হয় নাই—কবিসুলভ স্বাভাবিক আত্মবিস্মৃতি তাঁহার কাব্যকে উজ্জ্বল পবিত্র করে নাই।

প্রবন্ধান্তরে ঐরূপই সুন্দর যুক্তি ও ভাষায় লেখক বুঝাইয়াছেন, কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা প্রকৃতির মহান্ ও বিরাট্ রূপবর্ণনে কেন অকৃতকার্য্য, এবং ভবভূতিই বা কেন একটি "মেঘমন্দ্র সমাসে"—নিবিড় শব্দ-যোজনায় তাহাতে সিদ্ধহস্ত।

চিত্র ও কাব্যে আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা আছে—ললিত কলার (Fine arts) আলোচনা। ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিনই ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যার তিরোধান হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিয়মবলে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের রসাস্বাদনশক্তিও লোপ পাইয়াছে। আজকাল আবার রবিবর্ম্মা—ক্ষাত্রে প্রভৃতির শিল্পচাতুর্য্যে এই দীন দেশের পূর্ব্ব-গৌরব জাগ্রত হইবার সূচনা দেখিতেছি।

এই পুস্তকে এবং অন্যত্র বলেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে তাহাদের নবীন প্রতিভার যথোচিত আদর করিয়াছেন।

'ভারতী'তে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গদ্য প্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, ভাব-গৌরবে ও রচনাসৌন্দর্য্যে তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। সে গদ্য সকল কথা কহিতে জানে, সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনিই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাঙ্গালা গদ্যে কোথাও দেখি নাই। এই বিস্তৃত অভিধান ভাষার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ, সরল, ভদ্র গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় অলঙ্কারশূন্য—কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কোথাও প্রচ্ছন্ন সরসীর ন্যায় স্বচ্ছ স্নিগ্ধ—কোথাও বৃক্ষবটিকার ন্যায় বিবিধ ফলপুষ্পাভরণে বিচিত্র—এবং কোথাও নক্ষত্রনিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল। 'বসুমতী'র লেখক যে বলিয়াছেন, "বলেন্দ্র সুলেখক ;—সুলেখকই নয়, অমন গদ্য লেখা বুঝি আর পড়ি নাই ; তেমন শব্দ-লালিত্য, ভাব-মাধুর্য্য, অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ," ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়।

বলেন্দ্রনাথের পদ্যগ্রন্থ দুইখানির একটি বিচিত্র আকর্ষণ—অপূর্ব্ব সম্মোহনী আছে। ইহাদের মধ্যে যে কবিতাটিই পড়িবে তাহারই ভিতর শুনিতে পাইবে এক নূতন কণ্ঠ, নূতন সুর। এরূপ কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই। গদ্যে বলেন্দ্রনাথের সমীচীন প্রাধান্য ও বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহার মৌলিকতা পদ্যে, কবিতায়। এই সিদ্ধহস্ত গদ্য-লেখক, মূলে কবি। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের এক একটি কথা এক একখানি চিত্র, তাহার অর্থই এই। গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বল্প বা

অধিক পরিমাণে তাঁহার কলম দোরস্ত করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু পদ্যে একা প্রকৃতি নিজেই তাঁহার শিক্ষক। এই সকল কবিতার বিষয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ইহাদের কবিত্ব ও কল্পনা নিতান্ত অন্তরের। গোলাপ বা পদ্মের সৌন্দর্য্যগৌরব ইহাদের নাই, কিন্তু বকুল বা কামিনীর মৃদু সৌরভ আছে। যাহাদের এই সকল কবিতা ভাল লাগিবে, তাহাদের বড়ই ভাল লাগিবে। ইহাদের মৃদুমদিরার ঘোর সহসা ছাড়ে না।

এই দুই পুস্তকে বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী "দিশে দিশে গীতে গন্ধে" মুঞ্জরিত। বিরহে মিলনে, অন্তরে বাহিরে, শয়নগৃহে, নদীবক্ষে—প্রেমের সেই নিত্য নব বসন্তোৎসব—আর হৃদয়ের সেই বর্ষা-ঘন নিবিড় অনুরাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায়—ইহার নাম কি? হৃদয়ের অন্তঃপুরে—কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে—সকল বিলাস-কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন—"একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি।"

কালিদাসের 'ঋতুসংহারে'র সহিত 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী'র কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—কিন্তু 'ঋতুসংহারে' বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। তাহার অনেক কবিতার ভিতরই একই ভাব, একই বিষয়, কেবল ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু এই দুই পুস্তকের প্রত্যেক কবিতারই প্রাধান্য আছে। তাহা ছাড়া 'ঋতুসংহার' বাহ্যশোভা বর্ণনেই পরিপূর্ণ। এই দুই পুস্তকের কবিতা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত অন্তরের। ইহাদের ভিতর একটি প্রেমমুগ্ধ হৃদয় জাগ্রত। ইহাদের ভাষা ও ছন্দ সুন্দর ও পরিপাটী। প্রথম কবিতাপুস্তকে এমন পাকা হাত প্রায়ই দেখা যায় না। স্বচ্ছ সরল ভাষার অন্তরে কল্পনার স্বর্ণ-রেণু চিক্ চিক্ করিতেছে।

প্রতিভার আর একটি মনোহর এবং প্রকৃত লক্ষণ বলেন্দ্রনাথে বিদ্যমান—নির্ভীকতা। সমালোচনায় বা মৌলিক রচনায় যখন যাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, বিনা সংশয়-সঙ্কোচে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এ নির্ভীকতা ক্ষমতার পরিচায়ক এবং প্রথম শ্রেণীর কলা-প্রবীণের স্বভাবগত ধর্ম্ম।

সাহিত্যে এমন অনুরাগ এমন অপূর্ব্ব ক্ষমতার অকাল অবসানে বাংলা ভাষার, বিশেষতঃ অভিনব ও উপচীয়মান বাঙ্গালা গদ্যের যে সুমহান্ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

রচনার নিদর্শন

বলেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল দেখাইবার জন্য আমরা এখানে তাঁহার দুটি সনেট ও একটি প্রবন্ধাংশ মুদ্রিত করিলাম।—

অন্তরবাসিনী

মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়ে,
তুমি এস নেমে এস হৃদয়গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি।
ঘনায়ে আসুক্ আরো তিমির-যামিনী
তব চারি ধারে, ঘন ঘন গরজনে
পরিপূর্ণ হোক্ দশ দিশি, সন সনে
বহুক্ পবন খর বেগে; তুমি রহ
অহরহ পূর্ণ করি' সকল বিরহ
অন্তর-মন্দির-মাঝে; তব স্নেহছায়ে
সজীব হইয়া উঠে নব মহিমায়

পুরাণ বিরহ যত কুঞ্জ-অভিসার
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন শ্রাবণ-নিশার ;
মত্ত দাদুরীর রোলে দ্বিধা কেকারবে
তুমি যেন ভরি' উঠ সর্ব্ব অবয়বে।

হাসি

গড়েছে রজত রেখা রক্তিম অধরে,
মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ।
জ্যোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পরে
ফুটায়ে দিতেছে তার সুরমা সুবাস।
কোন্ শুভ দিবসের চুম্বনের স্মৃতি
অধরের রাঙিমায় হয়েছে বিলীন ;
কোন্ সুখরজনীর চাঁদের কিরণ
অধর পরশে এসে আপনা বিহীন।
দুইটী তরঙ্গ মাঝে শুভ্র রশ্মিরেখা,
তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া।
দু'টী সুখস্মৃতি যেন আপনা ভুলিয়া
সহসা অধর কোণে মিশেছে আসিয়া।
পড়েছে রজত রেখা রক্তিম অধরে
মরমের ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া।

কণারক (উড়িষ্যার সূর্য্যমন্দির)

"কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি-মন্দির—শৈবলাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ

শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত, এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে দ্বারের সম্মুখে সিদ্ধগন্ধর্ব্ব-সেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয় একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনক কিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন!......

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবাল-শয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।"—'সাধনা', ভাদ্র ১৩০০।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬৯—১৯২৯

বংশ-পরিচয় ঃ বাল্য-জীবন

১৩ জুলাই ১৮৬৯ (৩০ আষাঢ় ১২৭৬)* তারিখে সুধীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তিনি মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র।

দ্বিজেন্দ্রনাথ পুত্রকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে ত্রুটি করেন নাই। সুধীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ক্যালেণ্ডার হইতে তাহার নির্দেশ দিতেছি :—

এন্‌ট্রান্স, দ্বিতীয় বিভাগ···ইং ১৮৮৬ (বয়স ১৫ বৎসর ৬ মাস)··· মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন

এফ. এ. তৃতীয় বিভাগ···১৮৮৮ ··· ঐ

বি. এ. ···১৮৯০ ···প্রেসিডেন্সি কলেজ

সাহিত্য-সাধনা

বলেন্দ্রনাথের ন্যায় সুধীন্দ্রনাথও ছাত্রাবস্থা হইতে বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার প্রথম রচনা 'বালকে' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউ ঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ

---

* শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষরে লিখিত পারিবারিক খাতা হইতে এই জন্ম-তারিখ গৃহীত

জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে।” ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ‘বালক’ প্রকাশিত হয়। ‘বালকে’ সুধীন্দ্রনাথের মাত্র একটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল; উহা বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত “স্বাধীনতা’ (বলকের রচনা) নামে, একটি প্রবন্ধ। এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর।

‘সাধনা’ সম্পাদন

২২ বৎসর বয়সকালে সুধীন্দ্রনাথ ‘সাধনা’ প্রকাশ করেন। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ ১২৯৮। তিনি তিন বৎসর—১৩০১ সালের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সহিত ‘সাধনা’ পরিচালন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে প্রকাশ:—“আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।”

গ্রন্থাবলী

সুধীন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা হইতে গৃহীত:—

১। **ধর্ম্মের অভিব্যক্তি এবং ব্রাহ্মসমাজ**। ১৩০৩ সাল (?)। পৃ. ১৪।

২। **দোলা** (কাব্য)। ১৩০৩ সাল (ইং ১২ আগষ্ট ১৮৯৬)। পৃ. ৫১।

৩। **মঞ্জুষা** (গল্প)। ২৮ ভাদ্র ১৩১০ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ১৪৭।

সূচী: সোরাব ও রোস্তম, রসভঙ্গ, বুড়ী খ্রীষ্টানের আত্মকথা, জলাঞ্জলি, সহধর্ম্মিণী, লাঠির কথা, পুরাতন ভৃত্য, সেবিকা, পাগল, অনুতাপ, অগ্নিপরীক্ষা, সন্তোষিণীর ডায়েরী।

৪। **মায়ার বন্ধন** (উপন্যাস)। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ (২ জুলাই ১৯০৪)। পৃ. ৯৭।

৫। **দাসী** (কবিতা)। ১৩১১ সাল (ইং ১৯০৫) পৃ. ৮।

৬। **চিত্ররেখা** (ছোট গল্প) ১২ বৈশাখ ১৩১৭ (১৯ এপ্রিল ১৯১০)। পৃ. ৯৩।

সূচী: স্নেহের জয়, রাজপুতানী, পরিণাম, পিতা ও পুত্র, দুঃখের বোঝা, দাদা।

৭। **বৈতানিক** (কাব্য)। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (২২ মে ১৯১২)। পৃ. ৪৮।

৮। **কঙ্কন** (গল্প)। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (২৮ মে ১৯১২)। পৃ. ১০৪।

সূচী: মিতে, কাসিমের মুরগী, ঠাকুর দেখা, পাড়াগেঁয়ে, কুকুরের মূল্য, ঋণশোধ, বিজয়বাবুর বদান্যতা, স্নেহের নির্ঝর।

৯। **প্রসঙ্গ**। ১ আষাঢ় ১৩১৯ (২৯ জুন ১৯১২)। পৃ. ১২১।

সূচী: ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, আনন্দ, ধর্ম্মে বণিকবৃত্তি, ভক্ত ও তাঁহার নেশা, শিশু-জীবন, সমাজের ভিত্তি, সারাপট্টন, কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা, সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, বুনিয়াদি জমিদার-দিগের অধঃপতন, সংগ্রহ, স্বাধীনতা, প্রার্থনার সফলতা।

১০। **সহজ সত্য।** ত্র্যশীতিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত ও পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভাভঙ্গের পর বিতরিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন ১৮৩৪ (পৃ. ২৬৯) দ্রষ্টব্য।

১১। **চিত্রালি** (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১৮৭

সূচী : পোড়ারমুখী, রসভঙ্গ, লাঠির কথা, পুরাতন ভৃত্য, পাগল, অগ্নিপরীক্ষা, মা ও ছেলে, বুড়ী, সহধর্ম্মিণী, সেবিকা, সোরাব ও রোস্তম, জুতার কথা, সন্তোষিণীর ডায়ারি, খ্রীষ্টানের আত্মকথা, অনুতাপ, জলাঞ্জলি।

মৃত্যু

৭ নবেম্বর ১৯২৯ (২১ কার্ত্তিক ১৩৩৬) তারিখে, ৬০ বৎসর বয়সে, সুধীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। অমায়িক প্রকৃতির গুণে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন

সুধীন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের দান যৎসামান্য হইলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তাহা সমুজ্জ্বল। তাঁহার ছোট গল্পগুলি এই বৈশিষ্ট্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী কথা-সাহিত্যে এ বিষয়ে তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। প্রবন্ধ ও কবিতা রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল রচনা 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬১

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৮৫৮—১৯২০

দেবেন্দ্রনাথ সেন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

আনুমানিক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে* যুক্তপ্রদেশের গাজিপুরে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবারে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—লক্ষ্মীনারায়ণ সেন ; আদি নিবাস—হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। লক্ষ্মীনারায়ণ দেশের মায়া কাটাইয়া গাজিপুর শহরে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথই জ্যেষ্ঠ। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যবসায়ে যেমন অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন, তেমনি আবার জনহিতকর অনুষ্ঠানেও অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিবারবর্গের জন্য বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই ; এই কারণে তাঁহার পত্নীকে দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু এই বুদ্ধিমতী মহিলা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পুত্র পাঁচটিকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শিক্ষা

দেবেন্দ্রনাথ কোন্ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে তাহার নির্দ্দেশ দিতেছি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে :

এনট্রান্স…পাটনা কলেজিয়েট স্কুল… প্রথম বিভাগ…ইং ১৮৭২

এফ্. এ…প্রেসিডেন্সী কলেজ ঐ (১১শ স্থানীয়)…১৮৭৪

বি. এ Teacher ইংরেজীতে অনার্স ২য় বিভাগ … ১৮৮৬

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে :

এম্. এ Private Student ইংরেজীতে (৬ষ্ঠ স্থানীয়)… ১৮৯৩

* দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ "আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট।" এই প্রবন্ধের অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

ওকালতি

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অপর চারি ভ্রাতা—সকলেই কৃতবিদ্য ছিলেন। কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহারা যুক্ত-প্রদেশের স্থানে স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতিতে প্রবৃত্ত হন (৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৪)।

শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় সামান্যভাবে 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' (পরে কমলা হাই স্কুল) নামে একটি বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্পর্কে তাঁহাকে মাঝে মাঝে কলিকাতা আসিতে হইত। বিদ্যালয়টির পুষ্টিকল্পে তাঁহাকে চাঁদার খাতা লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল।

সাহিত্য-সেবা

অল্প বয়স হইতেই সাহিত্যের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল। তিনি কবিতা লিখিতে ভালবাসিতেন। ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে গাজিপুরে অবস্থানকালে তাঁহার তিনখানি ছোট কাব্য—'ফুলবালা', 'ঊর্ম্মিলা' ও 'নির্ঝরিণী' প্রকাশিত হয়। এগুলি সাময়িক-পত্রে প্রশংসা-লাভ করিয়াছিল। উৎসাহিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় আত্ম-প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে—আমি তখন গাজিপুরে অবস্থান করি। একদিন শুনিলাম, কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে আসিয়াছেন। রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও ঊর্ম্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও

আমার নির্ঝরিণী কাব্যের "আঁখির মিলন" কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও পত্রের দ্বারায় পরিচয় ছিল। তিনি আমার উর্ম্মিলা কাব্যের সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি" ইত্যাদি। গাজিপুরে অবস্থানকালে রবিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সে এক মহা-আনন্দের—আমার জীবনের দোলপূর্ণিমার দিন ছিল। নিত্য উৎসব, নিত্য পার্বণ। আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতাম—তিনি আনন্দিত হইয়া শুনিতেন। তিনিও আপনার অপ্রকাশিত নূতন কবিতাগুলি আমাকে শুনাইতেন। আমি হর্ষবিহ্বল হইয়া শুনিতাম। তখনকার রবিবাবুর যেমন দেবকান্তি, তেমনই সুন্দর কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি। আমরা দুই জনে একপ্রকার **Mutual Adulation Society** করিয়া তুলিয়াছিলাম।

এক দিন রবিবাবু আমাকে বলিলেন, "ভারতীর সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এখানে আছেন। আপনার কতকগুলি কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইবার জন্য দিন।" অনুরোধ শুনিয়া আমিও কৃতার্থ হইলাম। কারণ ইতিপূর্বে আমার কোন কবিতা অথবা কোন প্রবন্ধ কোন প্রখ্যাত পত্রিকায় বাহির হয় নাই। তখন স্বর্ণকুমারী দেবীর খুব নাম—'ভারতী'র খুব নাম। সম্পাদিকা অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। যেমন তাঁহার নিজের রচনাপটুতা, তেমনি প্রবন্ধ-নির্বাচনে দক্ষতা। খুব খাঁটি জিনিস না হইলে পত্রিকায় স্থান পাইত না। আমি ভ্যাজাল্ চালাইতে পারি নাই।

সেই সময়ে আমার "অদ্ভুত সুখ", "অদ্ভুত দুঃখ", "অদ্ভুত বহুরূপী", "অপূর্ব্ব অভিসার", "নাগা সন্ন্যাসী", "গাজিপুর" ও "গোলাপসুন্দরী"

নামক কবিতাগুলি ভারতীতে স্থান পাইয়াছিল।”—“স্মৃতি,” ‘ভারতী,’ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

১২৯৫ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা (ইং ১৮৮৮) ‘ভারতী’তে প্রকাশিত “অদ্ভুত রোদন” ও “অদ্ভুত সুখ” কবিতা দুইটিই বোধ হয় মাসিকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দেবেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা। অতঃপর তাঁহার রচিত গদ্য-পদ্য বহু রচনা ‘ভারতী’র পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছিল। ১২৯৭ সালে (ইং ১৮৯০) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ প্রকাশিত হইলে তিনি তাহাতে নিয়মিতভাবে রচনা দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত রচনাগুলি তাঁহার কবি-খ্যাতি উজ্জ্বল করিয়াছিল। ১২৯৮ সালে ‘সাধনা’য় ও ১২৯৯ সালে ‘নব্যভারতে’ও তিনি কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের ‘অশোক-গুচ্ছ’ প্রকাশিত হয়; ইহা কবি-সমাজে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের বহু রচনা ‘প্রদীপ’ (১৩০৭), ‘পুণ্য’, ‘জাহ্নবী’, ‘বাণী’, ‘মানসী’, ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’, ‘সবুজ পত্র’ প্রভৃতি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে। ১৩০৮ সালে (ইং ১৯০১) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ হইতে ‘প্রবাসী’ প্রচার করিলে দেবেন্দ্রনাথ রচনা দিয়া উহার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি “কমলাকান্ত শর্ম্মা” —এই ছদ্ম নামে কয়েকটি রসরচনাও প্রথম বর্ষের ‘প্রবাসী’তে পরিবেশন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পাদিত নব পর্য্যায় ‘বঙ্গদর্শনে’ (বৈশাখ ১৩০৮) নবীন ‘প্রবাসী’র সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

“আমাদের প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাশ্রুজলে ইহার অভিষেককার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও ধন্য, প্রবাসী বাঙ্গালীর কবিও ধন্য। স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্ম্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে

ঘটাইল? মায়াবী তাঁহার নাম গোপন করিয়া ফাঁকি দিতে পারিবেন না—কবির লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোক-মঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য কথাটি চুরি করিয়া লইতে পারেন, তিনি যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পালাইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধিতে পারি, তবেই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে।"

প্রথম বর্ষের 'প্রবাসী'তে দেবেন্দ্রনাথ "কুম্ভীর" নামে একটি গল্পও লিখিয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

দেবেন্দ্রনাথের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **ফুলবালা** (গীতিকাব্য)। গাজিপুর, ১২৮৭ সাল (২৮ জুন ১৮৮০)। পৃ. ৩৯।

ইহাই কবির প্রকাশিত প্রথম কাব্য। ইহাতে এই কয়টি কবিতা আছে:—গোলাপ, কদম, রক্তজবা, সূর্য্যমুখী, কৃষ্ণকেলি, মল্লিকা, কেতকি, অপরাজিতা, দোপাটি, করবি, রজনীগন্ধা, কুন্দ, কামিনী, অশোক, ঝুম্‌কা, পদ্ম, সেফালিকা, বকুল।

২। **উর্ম্মিলা-কাব্য**। ১২৮৭ সাল (১০ জানুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৩৭।

সূচী:—সীতার প্রতি উর্ম্মিলা, ফুলবালাদিগের উক্তি।

৩। **নির্ঝরিণী** (গীতিকাব্য)। গাজিপুর, ১২৮৭ সাল (১৮ মে ১৮৮১)। পৃ. ৬৫।

স্থচী :—কল্পনা (কিট্‌স-বিরচিত ওড্‌ টু ফ্যান্সীর অনুকরণে লিখিত), ভালবেস না, আঁখির মিলন, একটি শুষ্ক গোলাপ ফুল দেখিয়া, কুসুমে কীট, ময়না (এমেরিকাদেশীয় এড্‌গার পো-কৃত রেভ্‌ন নামক কবিতার অনুকরণে বিরচিত), উদাসিনী, জবা কুসুম, মায়া-উদ্যান, আমার দেবতা, পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, দর্পণ-পার্শ্বে, শয়ন-মন্দিরে, ঈশ্বরের প্রতি (টমাস্ মুর্ হইতে অনুবাদিত), বুল্‌বুলের প্রতি।

৪। **অশোক-গুচ্ছ** (কাব্য)। ১৩০৭ সাল (১২ অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ১৪৪।

"প্রকাশকের নিবেদনে" প্রকাশ :—"নূতন ও পুরাতন কতকগুলি কবিতা একত্র করিয়া অশোক-গুচ্ছ প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশগুলিই 'ভারতী' 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে সঙ্কলন করা হইয়াছে। কেবল "অপূর্ব্ব কবিতাবলী" শীর্ষক কবিতার মধ্যে "লজ্জাবতী লতা" ও "হতাশের আক্ষেপ" নূতন সন্নিবিষ্ট হইল। "রাণীর বিয়ে" কবিতাটি গ্রন্থকারের লিখিত নহে। রাণীর বিবাহ উপলক্ষে প্রকাশক [প্রকাশচন্দ্র দত্ত] কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।"

স্থচী :—অশোক-গুচ্ছ, আমি কে ? নারী-মঙ্গল, সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান, দাও দাও একটি চুম্বন, ভুল, দুটি কথা, প্রিয়তমার প্রতি, খোঁপা-খোলা, নিরলঙ্কারা, আমি, মা, যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায়, রাধারাণী, তার পর, বিজয়া, বিধবার আরসী, এই নাও, দাও দাও, কৌটার সিন্দুর, রাণী, রাণীর চুমো, রাণীর আবদার, রাণীর জোড় হাত, রাণীর বিয়ে, নাগা-সন্ন্যাসী, স্বর্ণলতা, মলিন হাসি, উচ্চ হাসি, নীরব বিদায়, কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী, পাগলী বিধবার গান, গণিকা, কালিদাসের জয়, ঘোমটা-খোলা, লক্ষ্ণৌর আতা, আলতা মোছা, যাব না, যাব না ; গান শোনা, রাক্ষসী, দ্রৌপদী, সদ্যঃস্নাতা, আমার

প্রিয়তমার দশটি ভগিনী, ডায়মনকাটা মল, অদ্ভুত রোদন, অদ্ভুত সুখ, অদ্ভুত শান্তি, সধবা, সাবিত্রী, লক্ষ্মীপূজা, অলক্ষ্মীপূজা, অপূর্ব্ব কবিতাবলী, অশোক-তরু।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ 'অশোক-গুচ্ছে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে ১ম সংস্করণের এগারটি কবিতা যেমন বর্জ্জিত হইয়াছে, তেমনি আবার এগারটি নূতন কবিতাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই নূতন কবিতাগুলির মধ্যে "আঁখির মিলন" 'নির্ঝরিণী' হইতে, "অশোক" 'ফুলবালা' হইতে এবং "সীতার প্রতি উর্ম্মিলা" 'উর্ম্মিলা-কাব্য' হইতে গৃহীত। "বিংশ শতাব্দীর বর" ১ম বর্ষের 'প্রবাসী' (আষাঢ় ১৩০৮) হইতে পুনর্মুদ্রিত। ইহা ছাড়া এই সংস্করণে দেবেন্দ্রনাথের ১৫টি ইংরেজী কবিতাও স্থান পাইয়াছে।

৫। **হরিমঙ্গল** (কাব্য)। মাঘ ১৩১১ (ইং ১৯০৫)। পৃ. ৬২।

ইহা "প্রধানতঃ 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা'র বালকদিগের জন্য রচিত। ইহার অনেকগুলি কবিতা বালকেরা গান করিয়া থাকে।"

অন্য কবিদের কয়েকটি রচনা ছাড়া 'হরিমঙ্গলে' দেবেন্দ্রনাথের রচিত এই কবিতাগুলি আছে :—এস হে শ্রীহরি; বিজয়া, বহু দেখিয়ে শুনিয়ে বিপদের প্রতি, আমিত্ব নাশ, সাধনা, নিবেদন, কোথা ওগো শ্রীহরি, চাতকের গান, বিশ্বমনোহর দেব, হে শিবসুন্দর, ভুবনরঞ্জন বিশ্ববিমোহন ; ধর মালা ধর, পর মালা পর ; শুনেছি শুনেছি, হিরণ্যকশিপু-বধ, নবীন সন্ন্যাসী, মা অন্নপূর্ণার প্রতি, হরিনামামৃত, আত্মা-বধূর প্রার্থনা, ঈশ্বরের প্রতি, বিপদ মঙ্গল ; হে বিপদ, এস ; পুণ্য, প্রার্থনা, সম্পদের প্রতি, বিপদের প্রতি, সম্পদের প্রতি, আমার দেবতা, মা, জীবন-সঙ্গীত।

১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত এই পুস্তকের ২য় সংস্করণটি পরিবর্দ্ধিত। ইহাতে কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথের

সরস্বতী-স্তোত্র ও শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র এবং ৭টি ইংরেজী কবিতা স্থান পাইয়াছে।

৬। **দগ্ধ কচু** (রসরচনা)। ১৩১৯ সাল (২৩ মে ১৯১২)। পৃ. ১১৪।

এই অপূর্ব রসরচনাটি দেবেন্দ্রনাথ "মেঘনাদ শত্রু, এম-এ" নামে প্রথমে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় (আষাঢ়, অগ্রহায়ণ—মাঘ, ১৩০৩) পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই ছদ্ম নামে তিনি পরবর্ত্তী কালে 'ভারতী'তে একটি গল্পও লিখিয়াছিলেন ; উহা ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ামী লড্ড্ু ও পেড়া"।

৭। **শেফালীগুচ্ছ** (কাব্য)। ১৩১৯ সাল (১৬ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ. ১৩৮+১২।

ইহাতে ৬২টি কবিতা আছে। পুস্তকের শেষে ১৩টি ইংরেজী কবিতাও আছে। 'শেফালীগুচ্ছে' 'ফুলবালা' কাব্যের ১৪টি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। "বিপদের প্রতি" 'হরিমঙ্গল' হইতে গৃহীত এবং "বিংশ শতাব্দীর কেলুয়া" ১ম বর্ষের 'প্রবাসী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) হইতে পুনর্মুদ্রিত।

৮। **পারিজাত-গুচ্ছ** (কাব্য)। ১৩১৯ সাল (২০ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ. ১৬৩+৩৪।

ইহাতে ৫৮টি কবিতা আছে। পরিশিষ্টে কতকগুলি ইংরেজী কবিতাও মুদ্রিত হইয়াছে। 'ফুলবালা' কাব্যের "ঝুমকা" ও "পদ্ম", 'নির্ঝরিণী' কাব্যের দশটি কবিতা ও 'হরিমঙ্গলে'র "সম্পদের প্রতি" ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে।

৯। **জ্ঞানদা-মঙ্গল** (কাব্য)। ৯ কার্ত্তিক ১৩১৯ (২৬ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ. ১৩।

১০। **অপূর্ব্ব নৈবেদ্য** (কাব্য)। ১৩১৯ সাল (২৮ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ. ১৫১।

ইহাতে মুদ্রিত ৭২টি কবিতার মধ্যে "মা", "সাবিত্রী" ও "সধবা" ১ম সংস্করণের 'অশোক-গুচ্ছ' হইতে (২য় সংস্করণের 'অশোক-গুচ্ছে' এগুলি বর্জ্জিত), "ডাক্তার হারাণচন্দ্র দাসের প্রতি" 'উর্ম্মিলা-কাব্য' হইতে এবং "বঙ্গসাহিত্য-কণ্ঠহার শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব পালিত মহাশয়" 'নির্ঝরিণী' হইতে (এটি আবার "উপহার" নামে এই পুস্তকেরই অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে) গৃহীত।

১১। **অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল** (কাব্য) ১৩১৯ সাল (২৯ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ. ১০১।

ইহাতে ৪৪টি কবিতা আছে। ১ম সংস্করণ 'অশোক-গুচ্ছে'র যে ১১টি কবিতা ২য় সংস্করণের পুস্তকে বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহার ৮টি (৩-১০ সংখ্যক) এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

১২। **শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল** (কাব্য)। ১৫ কার্ত্তিক ১৩১৯ (ইং ১৯১২)। পৃ. ২৮।

১৩। **গৌরাঙ্গ-মঙ্গল** (কাব্য)। ১৬ কার্ত্তিক ১৩১৯ (২ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১৬।

১৪। **অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা** (কাব্য)। ১৩১৯ সাল (২ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৭১।

সূচী :—বন্দনা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলী, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জা, লক্ষ্মণের প্রতি উর্ম্মিলা।

১৫। **শ্যামা-মঙ্গল** (কাব্য)। ২৩ কার্ত্তিক ১৩১৯ (৯ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১৬।

১৬। **জগদ্ধাত্রী-মঙ্গল** (কাব্য)। ৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ (১৫ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১৬।

১৭। **গোলাপগুচ্ছ** (কাব্য)। ১৩১৯ সাল (১৫ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ২২৮।

ইহাতে ৭৩টি কবিতা আছে; তন্মধ্যে "ফুলবালাদিগের উক্তি" 'উর্ম্মিলা-কাব্য' হইতে; "গোলাপ" 'ফুলবালা' হইতে; "একটি শুষ্ক গোলাপ ফুল দেখিয়া," "কল্পনা," "ময়না" ও "ভালবেস না" 'নির্ঝরিণী' হইতে এবং "হে বিপদ, এস" 'হরিমঙ্গল' হইতে গৃহীত। "শ্রীহরির প্রতি" কবিতাটি 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' পুস্তকেও আছে। 'গোলাপগুচ্ছে' দেবেন্দ্রনাথের ১২টি ইংরেজী কবিতাও স্থান পাইয়াছে।

১৮। **কার্ত্তিক-মঙ্গল** (কাব্য)। ৩০ কার্ত্তিক ১৩১৯ (২৪ নবেম্বর ১৯১২) পৃ. ১৬।

১৯। **গণেশ-মঙ্গল** (কাব্য)। ২৮ কার্ত্তিক ১৩১৯ (২৪ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১৬+৯। ইংরেজী অনুবাদ সহ।

২০। **খৃষ্ট-মঙ্গল** (কাব্য)। ১০ পৌষ ১৩১৯ (২৫ ডিসেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১৯+১২। ইংরেজী অনুবাদ সহ।

২১। **অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা** (কাব্য)। ১৩১৯ সাল (৩০ মার্চ ১৯১৩)। পৃ. ৩২।

আটটি কবিতার সমষ্টি।

দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্মৃতিকথা

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রীপূজার ছুটিতে অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত গয়ায় বেড়াইতে যান। সেখানে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে প্রভাতকুমার বলিয়াছিলেন :—

"দেবেন্দ্রবাবু নিজেও একদিন আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সে ইতিহাসটাও আপনাকে বলি শুনুন। প্রথমে একটু ভূমিকা আবশ্যক। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন দেবেন্দ্র-বাবুর প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'ফুলবালা' ও 'নির্ঝরিণী' আমার হস্তগত হয়।...ভিন্ন ভিন্ন ফুলের উপর অনেকগুলি কবিতা তাহাতে ['ফুলবালা'য়] ছিল। 'নির্ঝরিণী'তে "ময়না" শীর্ষক একটি কবিতা ছিল, সেটি পোয়ের 'রেভ্ন্' কবিতার অনুবাদ। শেষোক্তটিই পড়িতে আমার বড় ভাল লাগিত।...

১৮৯০ কিংবা উহার কাছাকাছি 'ভারতী'তে [কার্ত্তিক ১২৯৭] দেবেন্দ্রবাবুর "হরশিঙ্গার" বাহির হইল। তাহার পর 'ভারতী'তে এবং 'সাহিত্যে' দেবেন্দ্রবাবুর কবিতার যেন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। কবিতাগুলি একেবারে নূতন ঢঙ্গের। কবির ঘর গৃহস্থালীর কথা, স্ত্রীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা পড়িয়া পড়িয়া তাঁহাকে যেন আমাদের নিতান্ত আত্মীয়ের মত মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মধুময় হৃদয়খানির নানা ভাবের ছবি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মাসে মাসে আমরা দেখিতে লাগিলাম —দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

কিছু দিন পরেই 'সোনার তরী' প্রকাশিত হইল [জানুয়ারি ১৮৯৪]। তাহার উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রবাবু ইঁহাকে "কবিভ্রাতা" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন।

১৮৯১ কিংবা ১৮৯২ সালে মাঝে মাঝে আমি গাজিপুরে যাইতাম। ......গাজিপুরে দেবেন্দ্রবাবুর মেসো মহাশয় থাকিতেন, সেই সূত্রে দেবেন্দ্রবাবুও অনেক দিন সেখানে ছিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রবাবু এক-বার গাজিপুরে গিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করেন,—তখন হইতেই দেবেন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব।......

তখনকার দিনে আমার মনে কবি হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল।...মাসিক পত্রে কবিতা ছাপাইয়া নিরীহ পাঠকগণের উপর সে কালে অনেক অত্যাচার করিয়াছি। গাজিপুরে গোলাপক্ষেত্র দেখিয়া একটি সনেট লিখিয়াছিলাম,—

"যেন হায় প্রেয়সীর প্রেমলিপিখানি,
ফুটিয়াছে ভাবপুষ্প মাধুরী হিল্লোলে।"

উপমাটির নূতনত্বে সাহিত্য-জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিবার অভিসন্ধি করিতেছি, এমন সময়ে এক দিন সদ্যপ্রাপ্ত 'ভারতী'র মোড়ক খুলিয়া দেখি, "গাজিপুর" নামক দেবেন্দ্রবাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে [আষাঢ় ১২৯৮]। তাহার প্রথম কয়েক লাইন এই,—

এবে, গোলাপে গোলাপে, ছাইয়া ফেলেছে,
এ মধু কানন দেশ ;
সখি, তুমিও আইস, গোলাপী অধরে,
ধরিয়া গোলাপী বেশ !

এই কবিতার পাশে আমার সনেটটি হংসের পার্শ্বে যেন বকটির মত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সুতরাং সে যাত্রা সাহিত্য-জগৎকে মার্জনা করিলাম। সেটি আর কাগজে পাঠাইলাম না।*

তাহার পর কত বৎসর গেল। ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে আমি রঙ্গপুরে প্রাকৃটিস করিতে যাই। ডাক-বাঙ্গলায় বাস করিতেছি, তখনও বাড়ী পাই নাই। দায়রার একটি মোকর্দ্দমায়, আমার মক্কেল কলিকাতা হইতে স্থইন্‌হো সাহেবকে (তিনি তখন ব্যারিষ্টারি করেন) লইয়া আসিয়াছে, আমার পাশের কামরাতেই স্থইন্‌হো আছেন। বেলা আন্দাজ নয়টা—আমি তাঁহার কাছে বসিয়া মোকর্দ্দমার কাগজপত্র

* কবিতাটি ১৩২৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ভারতীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

বুঝাইতেছি। এমন সময়, বগলে বৃহৎ খাতা লইয়া একজন ক্ষীণকায় প্রৌঢ় ব্যক্তিকে বারান্দায় দেখিতে পাইলাম। পর-মুহূর্ত্তেই খানসামা একখানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল। পড়িলাম **Babu Debendranath Sen, M. A., B. L. Vakil**······তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলাম। আদর অভ্যর্থনা করিয়া দেবেন্দ্রবাবুকে নিজ কামরায় আনিয়া বসাইলাম।

পরস্পরে এই প্রথম সাক্ষাৎ—অথচ যেন কত কালের পরিচয়, এইরূপ আগ্রহে, আনন্দে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। সেই দিন প্রাতেই দেবেন্দ্রবাবু রঙ্গপুরে পৌছিয়াছেন, আবার সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিয়া যাইবেন।

সময় অতি সংক্ষেপ, ১১টায় কাছারি।

মধ্যে দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আমি কলিকাতায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' বলে একটি স্কুল খুলেছি। সেই স্কুলের জন্য চাঁদার খাতা নিয়ে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি।"

খাতাখানি লইয়া, নাম সহি করিয়া আমি পাঁচটি টাকা দিলাম। সবিনয়ে বলিলাম, "আমার সবে এই নূতন আরম্ভ, বেশী কিছু দিতে পারলাম না—আপনি কিছু মনে করবেন না।" দেবেন্দ্রবাবু মহা-সমাদরে তাহাই গ্রহণ করিলেন। আবার কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

কিন্তু কাছারির বেলা হইয়া যায়।···দেবেন্দ্রবাবু উঠিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় গেলাম। বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে হঠাৎ তিনি বলিলেন, "আচ্ছা প্রভাতবাবু, আমার কবিতা আপনার কেমন লাগে? চক্ষুলজ্জার খাতিরে বাড়িয়ে বলবেন না, ঠিক খাঁটি কথাটী বলুন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"খাঁটি কথাটিই বলি, তবে শুনুন। প্রথম,

রবীন্দ্রবাবুর transcendental প্রতিভা আপনার মধ্যে আছে বলে আমি মনে করিনে। দ্বিতীয় কথা এই, রবিবাবুর পর আর যে সমস্ত কবি আছেন, তাঁদের মধ্যে আপনাকে খুব উচ্চ আসনই দিই। তাঁদের অনেকের কাব্যেই রবিবাবুর সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, আপনার কাব্যে সেটি নাই, আপনার কাব্যের মধ্যে আপনার নিজের কণ্ঠস্বরটি বেশ স্পষ্ট—আর, সে স্বরটি বড় মিষ্ট, বড় পবিত্র।"

শুনিয়া, দেবেন্দ্রবাবু আমার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন,—"এই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশী কিছুই আমি আশা করিনে।" বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।—"মনীষা-মন্দিরে" : কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ. ৪৮১-৮৩।

* * * *

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পূজার ছুটিতে অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত জব্বলপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যলাভের আশায় দেবেন্দ্রনাথও সপরিবারে তখন সেখানে ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...যথাসময়ে আমি দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। তিনি নিজের আরামকেদারাটিতে বসিয়াছিলেন। চা-পানের পর গল্প আরম্ভ হইল।

আমি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার পূর্বে তিনি আমাকে বলিলেন,—"আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, অকপটভাবে তাহার উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আপনারা কি এখন আমার কবিত্ব-শক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিতেছেন? কোন কোন মাসিকপত্র যেন সেই রকম কথা বলিতেছে। আমি অবশ্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ নহি। কারণ আমাদের গণ্ডারের চামড়া,—ওরকম সমালোচনায় গায়ে একটি আঁচড়ও

পড়ে না। সে যাই হউক, আপনার আন্তরিক মতটা কি, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।"

আমি বলিলাম,—"আপনার প্রতিভা সত্য সত্যই ম্লান হইয়া যাইতেছে, এমন কথা কি করিয়া বলি? তবে একটা পরিবর্তন যে হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়, আর সে পরিবর্তন কবিত্বহিসাবে ভালর দিকে, কি মন্দের দিকে, তাহার বিচার করিবার সময় বোধ হয় এখনও হয় নাই। আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতাটা এখন খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যদি সর্বগ্রাসিনী হইত, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কবিতা ছাড়া যদি অন্য কবিতা আপনি আর না লিখিতেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম না; কিন্তু সম্প্রতি 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় আপনার যেরূপ বিভিন্নবিষয়িণী কবিতা বাহির হইয়াছে তাহাতে আমাদের আশঙ্কা করিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, আধ্যাত্মিক বলিয়াই কি সে সকল কবিতা মন্দ?"

আমি বলিলাম,—"তাহা কেন হইবে? আপনার এমন অনেক আধ্যাত্মিক কবিতা আছে, যাহা সৌন্দর্য্যে ও লালিত্যে—'অশোক-গুচ্ছে'র কোন কবিতা হইতে অপকৃষ্ট নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আপনার 'পেঁপে-সুন্দরী'র আধ্যাত্মিকতা আমরা ঠিক উপভোগ করিতে পারি না।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আরও একটি কারণে বোধ হয় লোকে আমার বর্তমান কবিতা অপছন্দ করে, তাহা আমার কোন কোন কবিতার ব্যক্তিগত ভাব। আমি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছি ও লিখিতেছি বটে; কিন্তু লোকে সেগুলি নিছক ব্যক্তিগত বলিয়া লয় কেন? আমি যে সকল মহিলা,

কি বালিকার স্তুতিবাদ করিয়াছি, তাঁহারাই আমার কবিতার মুখ্য বিষয় মনে করা ভুল। আমি তাঁহাদের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দিক্ হইতে একটা ideal womanhood,—নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই জন্য এই সকল কবিতাতেও মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিকতা আসিয়া পড়িয়াছে ; কারণ নারীজাতিকে আমি জগন্মাতার অংশরূপিণী,—ভগবানের সৌন্দর্য্যবিকাশ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। আমার শিশুসম্বন্ধীয় কবিতাগুলিও এই senseএ ব্যক্তিগত হইয়াও সার্বজনীন। এখানেও, আমি শিশু-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন ভাবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একটা আদর্শ শিশু-জীবন, যাহার বিকাশ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক, ইহাই আমার শিশু-কবিতাগুলির বিষয়। শিশুদের মধ্যে এই অভিন্নতা স্মরণ করিয়াই ত লিখিয়াছিলাম :—

"ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে
ওরে, ছেলেদের কি জাত্ আছে ?"

দেবেন্দ্রবাবু একটু চুপ করিলেন। পরে বলিলেন, "দেখুন, আমি পুরাতন 'স্কুলের'—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি। এই রবীন্দ্রের যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত।"

আমি বলিলাম,—"আপনার এই রবীন্দ্রপ্রভাবশূন্যতা আপনাকে যে বিশেষত্ব দিয়াছে, তাহাতেই আপনি বর্তমান যুগে বাঙ্গলার বরেণ্য কবি হইয়াছেন।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক, মাইকেলই আমার গুরু। ইংরাজী কবিদের মধ্যে Wordsworthকে আমি বড় পছন্দ করি। সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবও আমার কবিতায় বোধ হয় আপনারা

লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারেন। আমি ইংরাজীতে এম্-এ পাশ করিয়া আবার সংস্কৃতে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম; কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই, ফলে কিন্তু আমার সংস্কৃত সাহিত্যটা পড়া হইয়া গেল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম. "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ?"

তিনি বলিলেন, "রবিবাবু আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমার কোন মন্তব্য প্রকাশ চলে না। আমি তাঁকে খুব admire করি। তিনিও আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন এবং আমার কবিতারও পক্ষপাতী। আপনি ত জানেনই যে, রবিবাবু তাঁর 'সোনার তরী' আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট হইবেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স হওয়াতে একটা খুব বড় রকমের আনন্দোৎসবের আয়োজন হইতেছে। আমি এই উৎসব উপলক্ষে একটি কবিতা লিখিব মনে করিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অপবাদ সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

তিনি বলিলেন, "এ অপবাদ সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসঙ্গত এবং যাঁহারা তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।"—

আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দাসী একটি দেড় কি দুই বৎসরের মেয়েকে কোলে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন, "আপনি আমার 'দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ' পড়িয়াছেন? আমার এই ছোট মেয়েটির জন্মের

সময়ই আমি সেই কবিতাটি লিখিয়াছিলাম; দেখুন দেখি, আমাদের সমাজে কি নির্ম্মম প্রথা!—ছেলে হইলে মহানন্দে শাঁখ বাজাইবে, আর মেয়ে হইলে সব চুপচাপ। যেন মেয়েরা সমাজের কেউ নয়, তাদের কোন মূল্য নাই। যত দিন না আমাদের সমাজ নারীজাতির সমুচিত মর্য্যাদা করিতে শিখিবে, তত দিন আমাদের প্রকৃত উন্নতির আশা বড় কম।”
“মনীষা-মন্দিরে”: কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—‘সঙ্কল্প’, অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

মৃত্যু

স্বাস্থ্যহানি ঘটায় দেবেন্দ্রনাথ দেরাদুনে বাস করিতেছিলেন। তথায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ নবেম্বর তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’ (পৌষ ১৩২৭) লিখিয়াছিলেন:—

“আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেরাদুন শৈলাবাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, ইদানী কয়েক বৎসর হইতে ওকালতী ত্যাগ করিয়া, স্বাস্থ্যলাভের আশায় নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে পর্য্যায়ক্রমে বসতি করিতেছিলেন। দেরাদুনে অনেক দিন ছিলেন। কলিকাতায় ‘শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা’ নামক বিদ্যালয় তাঁহারই স্থাপিত; ঐ বিদ্যালয়ে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, কলিকাতায় আসিয়া বৎসরাধিক কাল অবস্থান করেন। পীড়িত হইয়া, পূজার পূর্ব্বে তিনি দেরাদুন চলিয়া যান, সেইখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছে।”

দেবেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

দেবেন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যখন সকলেই মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত, সেই যুগেও দেবেন্দ্রনাথ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য

সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। বহু বিচিত্র ভাবের প্রবাহে তাঁহার কাব্য ওতপ্রোত, তবুও তিনি বিশেষ করিয়া মানুষের কবি, গৃহস্থ-সমাজের কবি। তাঁহার বিশিষ্টতা তাঁহার কাব্যকে বাঁচাইয়া রাখিবে। কবিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাঁহার কয়েকটি কবিতা আমরা নিম্নে সঙ্কলিত করিলাম।—

'অশোক-গুচ্ছ' ঃ

প্রিয়তমার প্রতি

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,
আধ গ্ল্যাস জল যেন নিদাঘের কালে;
চারি ধারে গুরুজন; চল অন্তরালে;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে!
কে যেন গো কাণে কাণে কহিছে সোহাগে,
"আন থালা; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়
এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়?"
স্বধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে।
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে
মনোদুঃখে; ঘোমটার জলদ-আঁধারে
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে!
ছাদে চল; মুক্ত বায়ু; বহিছে তটিনী;
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী!

আমি

ফেলিয়া দিয়াছি বাসী মালতীর মালা—
চম্পক-অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,

গাঁথিছ বকুল-হার বিনায়ে বিনায়ে !
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বালা,
তোমার অলক-গুচ্ছ হয়েছে উতলা !
মালা গাঁথা হ'লে শেষ, পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ,
সরসে নলিনী সম হয়েছে চঞ্চলা ?
আমিও কুসুম, সখি ; সারাটি যামিনী
সঞ্চিয়াছি তব লাগি রূপ ও সৌরভ !
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব গৌরব,
হৃদে দেখ, কি উতলা হয়েছি সজনি !
চিকনিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা ;
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা !

ডায়মনকাটা মল

[সে দিন শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছি। রাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি ; এমন সময়ে, নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ীর তিন বধূ ও বাড়ীর কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, "নাতজামাই, বুঝিব, তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি কোন্‌টি কে।" তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।]

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল !
উঠিছে পড়িছে কি রে, নামিছে উঠিছে কি রে,
রূপ-হর্ম্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল ?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতির শান্ত গৃহে খুলিয়ে অর্গল ?

সুন্দরীর উচ্চ-হাসি, পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিরল ছুটে কি রে আনন্দে চঞ্চল ?
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্,
কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল ?
মল বলে,—'আমি যার 'বধূ' সে গো নহে আর,
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল !'
বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে ;
চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল !
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে ? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে ?
মুখর বিরহ বলে, "চল্ চল্ চল্"—
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল !

২

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !
হ'ল না রে ঘুরাইতে, প্রেম-চাবি ছুঁতে ছুঁতে
না ছুঁইতে বাজে কেন সোহাগের কল ?
ঝিল্লি সাথে নিশি বায় ঝাঁপ্‌তালে গীত গায় ;
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল !
রাজহংস কি কহিল, প্রাণ-কর্ণে কি গাহিল,
লজ্জা গেল ;—দময়ন্তী তনু টল্‌মল্ !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্,
তেমনি বধূর পায়ে বাজে ওই মল !
মল বলে,—'আমি যার, বধূ সে গো নহে আর,
ভগ্নীভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল !'

'খোকার ঝিনুক কই ?' মেজ বউ বলে ওই,
অধরে গরল তার নয়নে অনল !
কুহু-কুহু কুহরিত, অলিপুঞ্জ-মুখরিত,
বধূর যৌবন-কুঞ্জ মরি কি শ্যামল !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !

৩

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্, বাজে ওই মল !
পদ্মদলে পরবেশি, হারাইয়া দশ দিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে কি রে হইয়ে পাগল ?
অতনু কি মৃদু ভাষে, লুকায় উমার বাসে ?
পাছে ভাঙ্গে তপ, জ্বলে হর-কোপানল !
কেন, কেন ম্রিয়মাণ, হেমন্তে পাখীর প্রাণ
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল ?
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুর ঝুমর ঝুম্, বাজে ওই মল !
মল বলে, "আমি যার, চির-লজ্জা সখী তার ;
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ হলাহল !
চুম্বিয়ে চরণ তার জাগাই গো বার বার ;
বধূর কেমন পণ, সকলি বিফল !"
ঘোমটা টানি মাথায়, সেজো বউ চলি যায় ;
পদ্ম-দলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল !
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্, বাজে ওই মল !

৪

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্, বাজে ওই মল !
জল পড়ে ঝর ঝর, শীতে তনু থর থর,
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার সঙ্গীত তরল !

শুনে শ্যামা নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছল ছল আঁখি রাধা চাহে ধরাতল।
মিলন লজ্জার বুকে, মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরে, 'হেতা হ'তে চল্ সখী চল্!'
প্রগল্‌ভা হাসিতে চায়; গুরুজন!—এ কি দায়।
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল!
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্
মল বলে, 'বল, ওরে সরে যেতে বল';
কবি বলে, আসে ওই, আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু ভরমে বিকল;
যামিনীতে দেখা হ'লে, সুধাব সোহাগ-ছলে,
তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্বরী, সখি, তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায়? বল সখি বল?
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্
ওই বাজে মল।

মা

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে,
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে;
হেরিনু বিন্ধ্য-বাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি, ভৈরবে বেড়িয়া,

করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জমালা।
তবু ভরিল না চিত্ত ! সর্ব্ব-তীর্থ সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার !

লক্ষ্ণৌর আতা

চাহি না-ক 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর !
চাহি না-ক 'সেউ'—খেল বিরহ-বিধুর
জানকীর চির-পাণ্ডু বদন-রুচির !
একটুকু রসে ভরা, চাহি না আংগুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব-বধূটির !
চাহি না গন্নার*স্বাদ ! কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ়-দম্পতীর !
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া ;
চঞ্চলা বেগম কোন হয়ে উল্লাসিতা
ভাঙ্গিত ; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া !
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু ! আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকার রসনা উপরি !

* লক্ষ্ণৌ সহরে ইক্ষুকে 'গন্না' বলে।

অশোক-তরু

হে অশোক, কোন্ রাংগা-চরণ-চুম্বনে
মর্মে মর্মে শিহরিয়া হলি লালে-লাল ?
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি-দুলাল ?
কোন্ চির-সধবার ব্রত-উদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দূর-বরণ ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ?
বৃথা চেষ্টা—হায় ! এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু-জীব প্রাণী !
পরাণে লাগিয়া ধাঁধাঁ আলোক আঁধারে,
তবুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা' ;
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা !

'শেফালীগুচ্ছ' ঃ

শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী

১

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ওই রূপসী ?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে !
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ করি,
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝর্ঝরি ।

২

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা !
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি ;
এ যে সেই সতত-সরসা,
ভুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা ।

৩

শ্যামাঙ্গী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি,
এলায়ে দিয়াছে তার মসীবর্ণ কালো কালো চুল ;
শ্রীকণ্ঠে প'রেছে বালা, অপরাজিতার মালা ,
দু'কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল !
নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি,
অপূর্ব্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী !
স্রস্ত কেশরাশি হতে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে ;
কালো রূপ ফাটিয়া পড়িছে !
যাই বলিহারি !
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী ?

'গোলাপগুচ্ছ' ঃ

অদ্ভুত অভিসার

মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
ধ্বনিল রাধার চিত্ত-নিকুঞ্জ-মোহনে ;—
অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী-যমুনা-সদনে !
গেল রাধা ; তবে ওই মন্থর গমনে
মঞ্জুল-বকুল-কুঞ্জে, কে যায় গো চলি ?
আকুল দুকূল ; ম্লান কুন্তল, কাঁচলি ;

ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে !
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া !   টানে তরুদল
লুণ্ঠিত অঞ্চল ধরি !   মুখ-পদ্মোপরি
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি ;
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল !
আগে আত্মা, পরে দেহ, যাইছে তুহার,
রাধিকা রে, বলিহারি তোর অভিসার !

প্রকৃতি

১

চিরদিন, চিরদিন, রূপের পূজারি আমি,
রূপের পূজারি !
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি, রূপ-বৃন্দাবনে বসি,
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস, বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী !
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি-রাধিকা রাজে,
চরণে ঘুঙ্ঘুর বাজে, আনন্দে ঝঙ্কারি,—
নগনা, দোলনা-কোলে, মগনা রাধিকা দোলে,
কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উঘারি !
আমি সে অমৃত বিষ, পান করি অহর্নিশ,
সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী !
গীতের ঝঙ্কারে তোর, মাধুর্য্যের নাহি ওর ;
কি যাদু মাখান আছে, যাই বলিহারি,
(তোর) কঙ্কণ-তাড়না-মাঝে, অয়ি বরনারি !

২

অয়ি বরনারি,

চিরদিন, চিরদিন, তুহারি পূজারি আমি,

তুহারি পূজারি!

ত্রিদিব-আনন্দময়ী, ষোড়শী রূপসী তুই,

তোরে হেরি দুঃস্বপন গিয়াছি বিসারি!

দুষ্ট ফণী পেয়ে ক্ষোভ, হলাহল মোহ লোভ

ভুলিয়াছে! মুক্তকর, ছিলাম প্রসারি,—

কি আশ্চর্য্য! এ কি হেরি, নয়ন বিস্ফারি?

জ্বল্ জ্বল্ দীপ্তি ভায়! দু চক্ষু ঝলসি যায়,—

মুগ্ধ ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহারি।

আঁধার হইল দূর, বিশ্বে এল সুরপুর,

উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ফুল্ল ফুলনারী,

যৌবনের ফুলদানী শোভে সারি সারি!

৩

সঙ্গলিপ্সা, ভোগ-ইচ্ছা, মায়া-মোহ সব,—

তুমি মম ঐশ্বর্য্য-বিভব!

অকূলে পেয়েছি কূল, তুমি এবে অনুকূল,

জলধি-গর্জ্জন এবে হয়েছে নীরব!

প্রশান্ত এ বেলা মাঝে, তোমার সুমূর্ত্তি রাজে

পঙ্কজবাসিনী যেন বারিধি-কুমারী!

কর দেবী এ আশীষ,-- মহানন্দে, অহর্নিশ,

হে কবি-চির-বাঞ্ছিত, তোমারি, তোমারি,

পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারি!

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

বংশ-পরিচয়; শৈশব-শিক্ষা

৩০ মার্চ ১৮৭০ (১৮ চৈত্র ১২৭৬) তারিখে কলিকাতায় সুরেশ-চন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি; মাতা—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী। সুরেশচন্দ্রের অগ্রজপ্রতিম পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "সুরেশচন্দ্রের পৈতামহ বাসস্থান নদীয়া কৃষ্ণনগর জেলার আংশমালী গ্রামে ছিল। উঁহারা বাৎস্য গোত্রের ঘোষাল, শ্রোত্রিয়; সমাজপতি উপাধি···। সুরেশচন্দ্রের জনক ৺গোপালচন্দ্র সমাজপতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া করিতেন; সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গোপালচন্দ্রকে দেখিয়া পছন্দ করেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এই পাত্রেই দান করেন। তখন বিধবা-বিবাহের জোর হুজুগ চলিতেছিল, গোপালচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জামাতা হইয়া সামাজিক হিসাবে একটু গোলে পড়িয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে অধিকাংশ সময়ে শ্বশুরগৃহে বাস করিতে হইত।···অতি অল্প বয়সে গোপালচন্দ্র কাশী যাইয়া ওলাউঠা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুরেশ-যতীশ দুই ভাই, মাতামহের গৃহেই মানুষ হইয়াছিলেন।···সুরেশ আকারে অবয়বে তাঁহার জনকের অনুরূপই ছিলেন। নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ গোপালচন্দ্রের মতন খুব কম যুবকই তখনকার সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। সুরেশ তাহার জনকের এই গুণ পাইয়াছিল।" ('সাহিত্য', পৌষ-মাঘ ১৩২৭, পৃ. ৬৫৪-৫৫)।

সুরেশচন্দ্রের শৈশব-শিক্ষা হয় গৃহে মাতামহের নিকট। বিদ্যাসাগর মহাশয় দৌহিত্রকে সংস্কৃত কাব্য, ছন্দ, অলঙ্কারাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং সুরেশচন্দ্র, ১৮৯০ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকারের স্মৃতিকথায়, এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"আমি এক দিন মুন্নীকে [জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আই. সি. এস] বলিলাম, "চল, বঙ্কিম বাবুর কাছে যাই।"...

'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' ও 'সাহিত্যে'র কয়েক সংখ্যা লইয়া আমরা শঙ্কিতচিত্তে বঙ্কিম-দর্শনে যাত্রা করিলাম।...

বঙ্কিম বাবু 'সাহিত্য' সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন। মুন্নী বলিল, "সুরেশকে আমরা সম্পাদক করিয়াছি।"

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার দাদা-ম'শায় জানেন?"

আমি বড় বিপদে পড়িলাম! দাদা-ম'শায় জানেন কি না, তাহা আমিও ঠিক জানিতাম না।...মুন্নী বলিল, "বোধ হয়, তিনি জানেন।" বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "সে কি? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না ব'লে কাগজ বার ক'রে ফেল্লে। তিনি শুনলে রাগ করবেন না?"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় শুনেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি নি।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "দেখ, লেখা টেখা মন্দ নয়। কিন্তু তোমাদের এখন পড়বার সময়—এতে অনেক সময় নষ্ট হয়।..."

মুন্নী আমাকে উদ্ধার করিল। সে বলিল, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ওদের দু'ভাইকে স্কুলে দেন নি। বাড়ীতে পড়ান।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "কেন? তাঁর নিজের স্কুল কলেজ রয়েছে, নাতীদের স্কুলে পড়ান না? এর মানে কি?"

মুন্নী বলিল, "তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত, আগে সংস্কৃত প'ড়ে, পরে ইংরেজী পড়লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়ীতে পড়ে। তিনি বলেন, ভাল ক'রে পড়াশুনা করে ওরা বাঙ্গলা লিখবে।

তিনি নিজে সময় পান নি, যা সাধ ছিল, লিখতে পারেন নি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।"—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩১২, ৩১৮-১৯।

বিবাহ

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) তারিখে ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা নলিনী দেবীর সহিত সুরেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁহার "সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি"তে ('সাহিত্য', শ্রাবণ ১৩১০) এই বিবাহের বিশদ উল্লেখ করিয়াছেন।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

সুরেশচন্দ্র ১৪-১৫ বৎসর বয়স হইতেই বাংলা রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। 'পতাকা', 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সুরভি ও পতাকা'র পৃষ্ঠাগুলিতে তাঁহার অনেক প্রাথমিক রচনার সন্ধান মিলিবে। তিনি কবিতাও লিখিতেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি মাসিকপত্র সম্পাদনে ব্রতী হন।

'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' :- ১২৯৬ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৮৯) মাসে শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিকপত্র ও সমালোচন প্রকাশিত হয়। ইহা ৩নং বীডন স্কোয়ার, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। প্রকাশক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সুরেশচন্দ্র ইহার ৭ম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৬) হইতে সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, পত্রিকার সহিত তাঁহার কোন আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না। ৯ম সংখ্যায় (চৈত্র) 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র বর্ষ শেষ হইলে "সম্পাদকের নিবেদনে" সুরেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"এই পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন অন্য ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন। বিগত মাঘ মাসে, আমি প্রকাশক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করি।...

পূর্ব্বতন সম্পাদক মহাশয় যে পথে গিয়াছিলেন, আমি, নানা কারণে একেবারে সে পথ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ, সকল বিষয়ে, তাঁহার অনুসৃত পথেও চলিতে পারি নাই। এই উভয় সঙ্কট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, নবম সংখ্যায় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র প্রথম বৎসর শেষ করিতে হইল।...

বহুদিন হইতে আমাদের ইচ্ছা ছিল, একখানি মাসিকপত্র সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত করিব।...যখন আমরা মাসিকপত্র প্রকাশিত করিব, সঙ্কল্প করি, তখন তাহার উদ্দেশ্য ও সম্পাদন প্রণালী অবধারিত, এবং নাম পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, মথুর বাবু [মথুরানাথ সিংহ, বি. এ.] এই বিষয়ের অগ্রণী ছিলেন। আমরা, আমাদের সঙ্কল্পিত মাসিকপত্রের, 'সাহিত্য' এই নাম নির্ব্বাচিত করি।

আগামী বৈশাখ হইতে 'সাহিত্য' প্রচারিত হইবে, অবধারিত ছিল। কিন্তু, ইতিপূর্ব্বেই, আমি 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং মথুর বাবু প্রভৃতিকে, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত 'সাহিত্যে'র পরিবর্ত্তে, 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু, এ জন্য একটি পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে যিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন, তিনি ইহাকে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম'—নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। আমাদের অতদূর উচ্চ আশা নাই। জগতে

সাহিত্যের অন্তর্গত নয় কি ? অতএব 'কল্পদ্রুমে'র ন্যায়, যিনি যাহা চাহিবেন, তাঁহাকে সেইরূপ 'সাহিত্য' দিয়া তৃপ্ত করিব, আমাদের এমন দুরাশা নাই। বিশেষতঃ, 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র পূর্ব্ব উদ্দেশ্যও এখন ভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছে। অতএব, নির্দ্ধারিত হইল যে, অতঃপর 'সাহিত্য' ঠিক প্রচারের মত আকারে, প্রতি মাসে ৫ পাঁচ ফর্ম্মা হিসাবে প্রকাশিত হইবে। কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে ও কি প্রণালীতে, এই অভিনব **'সাহিত্য'** সম্পাদিত হইবে, তাহা দ্বিতীয় কল্পের প্রথম সংখ্যায় নিবেদিত হইবে।"

'সাহিত্য' ঃ—১২৯৭ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৯০) মাস হইতে সুরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'কল্পদ্রুম'-কাটা 'সাহিত্য' প্রকাশিত হইল। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ রহিলেন। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার "সূচনা"য় সম্পাদক লিখিলেন :—

"বাঙ্গলা-সাহিত্যের সেবার জন্য 'সাহিত্যে'র জন্ম হইল। জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, আমাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

এদেশে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব, দিন দিন অধিকতররূপে বিস্তারিত হইতেছে। এই শিক্ষার ফলে, আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ, নানাবিধ নূতন ভাব ও অভিনব চিন্তার সহিত পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই, আমাদের বাঙ্গলা-সাহিত্য, তাঁহাদের সেই চিন্তাশক্তি ও ভাবুকতার ফললাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এখন যাঁহারা ইংরাজী শেখেন, তাঁহারা প্রায় বাঙ্গলা পড়েন না ; বাঙ্গলা লেখেন না। বাঙ্গলা-সাহিত্যের শৈশব-দশায়, যাঁহারা বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন, এখনও প্রায়

তাঁহারাই বাঙ্গলা-লেখক। তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কে তাহাতে জল সেচন করিবে? তাঁহারা যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, কে তাহাকে পূর্ণ পরিণতির পথে লইয়া যাইবে? কারণ, তাঁহাদের পরে যাঁহারা বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কৃতকার্য্য লেখকের সংখ্যা আবার তদপেক্ষা আরও অল্প।

অথচ, সেকালের অপেক্ষা একালে, দেশে চিন্তাশীলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, জ্ঞানের জ্যোতিঃ অধিকতর বিকীর্ণ হইতেছে। তথাপি, শিক্ষার অনুপাত অনুসারে ধরিতে গেলে, সে কালের তুলনায়, এ কালের বাঙ্গলা-সাহিত্যকে অনেক দরিদ্র বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষিত যুবকগণের বাঙ্গলা-সাহিত্যে সেরূপ মনোযোগ ও অনুরাগ নাই, এই জন্যই সাহিত্যের এমন দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।

এখন চিন্তার স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের লেখকগণের মতের সহিত, প্রায়ই বর্ত্তমান নবীন যুগের শিক্ষিত যুবকগণের মতবিরোধ উপস্থিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সাহিত্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে তাহার মীমাংসা হয় না। সুতরাং, প্রাচীন ও নবীন মতের বিরোধে যে শুভ ফল প্রত্যাশা করা যায়, আমাদের সাহিত্যে, সে শুভ ফলের সম্ভাবনা নাই।

এই জন্য, আমরা শিক্ষিত যুবকগণকে এই নূতন 'সাহিত্যে'র আসরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের পদবীর অনুসরণ করুন, আপনাদের শিক্ষার ফল, যাহাতে আমাদের জাতীয়-জীবনে অনুপ্রাণিত হয়, তাহার চেষ্টা করুন।

জাতীয়-জীবনের উন্নতি, সাহিত্য-সাপেক্ষ, এ কথা

সর্ব্ববাদিসম্মত। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যদি সেই জাতীয়জীবন-গঠনের জন্য প্রাণপাত না করেন, তবে আর কে করিবে?

আমরা দেশের অনেক গণ্য ও মান্য ব্যক্তির নিকট উৎসাহ পাইয়াছি, সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত, অনেক শ্রদ্ধেয় লেখকের সাহায্য পাইয়াছি। এক্ষণে, শিক্ষিত যুবকগণ, 'সাহিত্যে'র আসরে অবতীর্ণ হইলে, আমাদের আশা উদ্যোগ সফল হয়। আমাদের সে আশা কি বিফল হইবে?"

প্রথম বর্ষের 'সাহিত্য' যাঁহাদের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের কয়েক জনের নাম:—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কবিতা ও "রৈবতক কাব্য" সমালোচনা), নবীনচন্দ্র সেন (কবিতা ও "প্রবাসের পত্র"), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবিতা), প্রিয়নাথ সেন (কবিতা), নিত্যকৃষ্ণ বসু (কবিতা ও গল্প), গোবিন্দচন্দ্র দাস, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (উপন্যাস), নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় (হায়নের Reisbilder হইতে), গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী, নীহারিকা-রচয়িত্রী—প্রসন্নময়ী দেবী (কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী ও সমালোচনা), সরোজকুমারী দেবী, কামিনী সেন, প্রমীলা নাগ (বসু)।

'সাহিত্য' দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইল। সুরেশচন্দ্র 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথও ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ২য় বর্ষের 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদকত্বে প্রচার করিলেন; "নববর্ষে নূতন কথা"য় লিখিত হইল:—"আমাদের 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমেরও' একটি বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে, 'সাহিত্য' আসিয়া, ইহার ছায়ায়

আশ্রয় প্রার্থনা করিল। বটবৃক্ষ, যেমন ছেদককেও ছায়া দান করে, তেমনই 'কল্পদ্রুম'ও, নিজ জীবনের দ্বিতীয় বর্ষটি উদ্‌যাপন করিয়াছে। গত ১২৯৭ সালে 'সাহিত্য,' 'কল্পদ্রুমের' ছায়ায় প্রতিপালিত হইয়া, এ বৎসরে বেশ শক্ত সমর্থ হইয়াছে, নিজে চলিতে ফিরিতে পারে, দু কথা বলিতে কহিতে ও পথ চিনিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে; তাই, এবার আর "আওতায়" না থাকিয়া, উপযুক্ত মালীদ্বারা সাহিত্য-উদ্যানের অপর এক পরিষ্কৃত স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।"

'সাহিত্য'-সম্পাদক নবোদ্যমে পত্রিকা-সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। তিনি ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ ১২৯৮) সম্পাদন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি লেখেন :—

"আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য,—প্রাচীন ও নবীন মতের সম্মিলন। এ সম্বন্ধে, কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা বিদায় হইব। কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে হয়। সামাজিক বা অন্য কোনও বিষয়ের আলোচনা স্থলে যদি কেহ স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধ মতবাদ দেখিতে পান, আশা করি, সে জন্য আমাদের অপরাধী করিবেন না। নিরপেক্ষ-ভাবে সকলের মতামত প্রকাশ করাই সম্পাদকের কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কোনও সম্পাদকই সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিশেষের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, সম্পাদকের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, যে কোনও আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা, 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইবে। যাহাতে সত্যের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে, যাহাতে সমাজের বা সাহিত্যের উপকার আশা করা যায়, সাধারণের অপ্রীতিকর বা আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, তাহার প্রচার করিতে আমরা কখনও কুণ্ঠিত হইব না। এ জন্য যদি আমরা কাহারও

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করি, আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, আমাদের ক্ষমা করেন।

বাঙ্গালার প্রতিভাশালী প্রবীণ আচার্য্যগণের পদবীর অনুসরণ করিয়া, আমরা সাহিত্যসেবাব্রত গ্রহণ করিতেছি। সে কালের লেখক মহাশয়গণের অনুগ্রহে ও এ কালের নবীন লেখকগণের উৎসাহে, 'সাহিত্য' আমাদের জাতীয় ভাব-প্রবাহের সঙ্গম হউক। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুকম্পায়, এ কালের নবীন ভাব ও মত, সে কালের ভাব ও মতের কিরণে বিকশিত হইতে থাকুক, সকলের সমবেত চেষ্টায়, আমাদের জাতীয় সাহিত্য, সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রভায় পূর্ণ ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক।"

'সাহিত্য' দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া অচিরাৎ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকার গৌরব অর্জ্জন করিল। বাংলা-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এমন অল্প লেখকই আছেন, যাঁহাদের কোন-না-কোন রচনা 'সাহিত্যে'র পৃষ্ঠায় স্থানলাভ না করিয়াছিল। 'সাহিত্যে' রচনা প্রকাশ করিতে পারিলে অনেক লেখকই নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন,— 'সাহিত্যে'র এমনই সুনাম ছিল।

সমাজপতি সত্যই সাহিত্য-সমাজের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার দ্বার সমালোচনা-সাহিত্য বহুল পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'সাহিত্যে'র মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা পাঠ করিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন।

সংবাদপত্র সম্পাদন :—সুরেশচন্দ্র 'কল্পদ্রুম' ও 'সাহিত্য' ছাড়া অনেকগুলি সংবাদপত্রও সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে 'বসুমতী,' 'সন্ধ্যা,' 'নায়ক,' 'বাঙ্গালী' প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থাবলী

সুরেশচন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **কল্কিপুরাণ** (অনুবাদ) কার্ত্তিক ১২৯৩ (ইং ১৮৮৬)। পৃ. ১২৬।

"মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত"। অনুবাদকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :— "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে কল্কিপুরাণের যে হস্তলিপি আছে, প্রধানতঃ তদবলম্বনে এই অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে এবং পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে স্থানে স্থানে টীকা সঙ্কলিত হইয়াছে।"

২। **সাজি** (গল্প)। আষাঢ় ১৩০৭ (১৫ জুন ১৯০০)। পৃ. ১৫৬।

'সাহিত্য' হইতে পুনর্মুদ্রিত আটটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি—প্রাইভেট টিউটার (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯), প্রভা (আষাঢ় ১২৯৯), বাঘের নখ (শ্রাবণ ১৩০১), কমলা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩), প্রতিশোধ (আশ্বিন ১৩০৬), তীর্থের পথে (মাঘ ১৩০৬), শোকবিজয় এবং লালসা ও সংযম (কার্ত্তিক ১২৯৮)।

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন :—"গল্পগুলি ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে একত্র সংগৃহীত হইল। 'শোকবিজয়' ও 'লালসা ও সংযম' বাল্যকালে রচিত। নবীনবাবু 'অমিতাভে' 'শোকবিজয়ে'র আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; এবং রবীন্দ্রবাবু 'কথা'য় 'লালসা ও সংযমে'র কাহিনী দিয়াছেন। ইহাঁদের রচনা প্রকাশিত হইবার পর পূর্ব্বোক্ত গল্প দুটির পুনঃপ্রকাশের আবশ্যকতা ছিল না ; তবু বাল্য-রচনার মায়া অতিক্রম করিতে পারিলাম না।"

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে (ভাদ্র ১৩২২) Olive Schreiner-র রূপকের অনুবাদ—'শিকারী' ('সাহিত্য', ভাদ্র ১৩০০) ও 'বন্য মধুপের

স্বপ্ন' ('সাহিত্য', কার্ত্তিক ১৩০০) নামে আর দুইটি রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'সাজি' "শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রিয়বরেষু"কে উৎসর্গীকৃত। এই সংস্করণে গ্রন্থকার পরলোকগত বন্ধুর মৃত্যুতে লিখিত একটি রচনা ১৩১৮ সালের ১৩ই শ্রাবণের 'বসুমতী' হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

৩। **রণ-ভেরী**। ইং ১৯১৪ (২০ জানুয়ারি ১৯১৫)। পৃ. ৩০।

সার্ আর্থার কোনান্‌ডয়েলের *To Arms*-এর বাঙ্গালানুবাদ। সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস কর্ত্তৃক বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত।

৪। **ইউরোপের মহাসমর** (ইতিহাস)। ইং ১৯১৫ পৃ. ২১১।

ইহা ডবলিউ. এল. কোর্টনি ও জে. এম. কেনেডি প্রণীত *How the War Began*-এর অনুবাদ। "শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত" ও "হড্ডার এণ্ড ষ্টাউটন" কোম্পানীর পক্ষ হইতে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস কর্ত্তৃক বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত।

৫। **ছিন্নহস্ত** (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)। কার্ত্তিক ১৩২২ (ইং ১৯১৫)। পৃ. ৩৭৫।

সুরেশচন্দ্র কর্ত্তৃক "সম্পাদিত" এই উপন্যাসখানি প্রথমে ১ম-২য় বর্ষের 'ভারতবর্ষে' (১৩২০-২১) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, পরে বর্দ্ধিতাকারে পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

৬। **আগমনী** (সম্পাদিত)। মহালয়া ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ২০৩।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত এই পূজাবার্ষিকীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেন্দ্র-

কুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতির রচনা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে সুরেশচন্দ্রের "পেস্তার বরফী" নামে একটি গল্প মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। **কবিতাপাঠ** (সঙ্কলিত পাঠ্য পুস্তক)।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৮। **বঙ্কিম-প্রসঙ্গ** (সঙ্কলিত)। ? (ইং ১৯২১)। পৃ. ৩৫৮+১৭।

এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ দত্ত প্রভৃতির কতকগুলি পুরাতন রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্রের স্মৃতিকথা চারিটি প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে; এগুলি ১৩২১ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

* * *

সুরেশচন্দ্র কোন কোন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১২৯৯ সালে প্রকাশিত নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্রে'র ও ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর ২য় সংস্করণ 'বিনোদমালা'র "বিজ্ঞাপন" এবং ১৩১৯ সালে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার বড়ালের ৩য় সংস্করণ 'প্রদীপে' "প্রস্তুতি" অংশ উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

সুরেশচন্দ্রের অনেক রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে তাঁহার

স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

ক্ষমা (বৌদ্ধ কাহিনী)	'সাহিত্য-কল্পদ্রুম'	১২৯৬,	ভাদ্র-আশ্বিন
বড় কে (গল্প)	'সাহিত্য'	১২৯৮,	জ্যৈষ্ঠ
দোল (কবিতা)	...		জ্যৈষ্ঠ
মেঘদূত (সমালোচনা)	...		ভাদ্র
উপাধি-উৎপাতে বঙ্কিম বাবু	...	১২৯৯,	ভাদ্র
মলয়ের আক্ষেপ ; তবু কাঁদে হৃদয় (কবিতা)	...	১৩০০,	ভাদ্র
উপহার (কবিতা)	...		পৌষ
এ মাসের বহি ;—সঞ্জীবনী সুধা (সমালোচনা)	...		মাঘ
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	...	১৩০১,	জ্যৈষ্ঠ
ভগবতী দেবী	'মুকুল'	১৩০২,	পৌষ
গঙ্গা-ঘড়িং	...	১৩০৫,	ভাদ্র
শিশুপাঠ্য সাহিত্য (সমালোচনা)	'সাহিত্য'	১৩০৬,	ভাদ্র
শোকসংবাদ : নিত্যকৃষ্ণ বসু	...	১৩০৭,	আষাঢ়
সাহিত্য-পরিষদ্	...	১৩১৫,	অগ্রহায়ণ
নবীনচন্দ্র	...	১৩১৬,	বৈশাখ
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	...	১৩১৮,	ভাদ্র
ঝরা ফুল (সমালোচনা)	'বঙ্গদর্শন'	১৩১৮,	আশ্বিন
গিরিশচন্দ্র	'সাহিত্য'	১৩১৯,	বৈশাখ
মহামতি ষ্টেড্	...		বৈশাখ
স্বর্গীয় দেউস্কর	...		মাঘ
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর	...		মাঘ
প্রদীপ (সমালোচনা)	'বঙ্গদর্শন'	১৩২০,	বৈশাখ

পঞ্চরাত্রম্	'নাট্য-মন্দির'	১৩২০, শ্রাবণ-ভাদ্র
'পিপল্‌কা পেড়' (গল্প)	'সাহিত্য'	১৩২১, শ্রাবণ
তাগা (গল্প)	...	১৩২৩, বৈশাখ
মহাকবি মধুসূদন	...	আষাঢ়
'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ !'	...	শ্রাবণ
ওঁ স্বস্তি !	...	শ্রাবণ
বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব	...	১৩২৪, পৌষ
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১৩২৬, বৈশাখ
রামেন্দ্রসুন্দর	...	আশ্বিন
'সে কাল এ কাল' (সমালোচনা)	...	১৩২৭, ভাদ্র

সুরেশচন্দ্র সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালন-কার্য্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ১৩০৫-১৮ ও ১৩২৪-২৭ সালে তাঁহাকে আমরা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে দেখিতে পাই। পরিষদের নিজস্ব মন্দির নির্ম্মিত হইলে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা ছিল না। ১৩১৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ (৬ ডিসেম্বর ১৯০৮) গৃহপ্রবেশ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-সভায় সুরেশচন্দ্র যে হৃদয়গ্রাহী রচনাটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আজ ২১শে অগ্রহায়ণ বাঙ্গালীর স্মরণীয় দিন।—বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে, জাগরণের উজ্জ্বল পরিচ্ছদে, ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ সুবর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। বাঙ্গালীর এই

মাতৃমন্দিরে,—নবনির্ম্মিত সারস্বত-নিকেতন,—মার পবিত্র দেউল আমাদের জাতীয় তীর্থ, কে তাহা অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ এই মহাতীর্থে সাহিত্য-সাধনায় অক্ষয় সিদ্ধি ও কাম্য ফল লাভ করিবে। আজ বাঙ্গালী যে কল্যাণকল্পতরুর প্রতিষ্ঠা করিলেন, ভবিষ্যতের কোনও মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে তাহার ফল ফলিবে। নবভাবে অনুপ্রাণিত,—নূতন আশায় উদ্দীপিত,—মনুষ্যত্বে প্রভাবিত,—নিষ্কাম-কর্ম্মের ও স্বদেশ-ধর্ম্মের পুণ্যমহিমায় সমুদ্ভাসিত ভবিষ্যতের বাঙ্গালী সেই অমৃত ফলের অধিকারী হইয়া মর-জগতে অমরতা লাভ করিবে। আজ সাধনার তপোবনে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যসাধকগণ যে 'অগ্নিশরণে'র প্রতিষ্ঠা করিলেন,—এক দিন সেই পবিত্র সারস্বত আশ্রমে ভারতের ভারতী আবির্ভূত হইয়া বরাভয়ে বাঙ্গালীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন। বাঙ্গালী এই সারস্বত মন্দিরে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করুন,—সারস্বত সাধনায় ধন্য ও কৃতার্থ হউন। এই ক্ষুদ্র মন্দির নব-ভারতের ভাবকেন্দ্রে—হোমশালায় পরিণত হউক। এই পবিত্র মন্দিরে ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক বাঙ্গালী সেই মহাভাবের সাধনা করুন,—কন্যাকুমারী হইতে তুষারকিরীটী হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত, উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক।

বাঙ্গালা সাহিত্য নব-ভারতের ভাবগঙ্গার পবিত্র উৎস—গোমুখীর অমর নির্ঝর। মাতৃমন্ত্রের ঋষি অমর বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রে আজ ভারতভূমি মুখরিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালীর 'আনন্দমঠ' তাহার মূল প্রস্রবণ; বাঙ্গালী সে জন্য আত্মপ্রসাদ, গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতে পারে।—হে বঙ্গের সাধক! বাণীর উপাসক! সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ

রাখিবার বিপুল দায়িত্বও তোমার। তুমি যদি এই সাধনমন্দিরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার,—তাহা হইলে, বাঙ্গালীর এই গৌরব যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর জাজ্বল্যমান থাকিবে। আর্য্যাবর্ত্ত আবার নব-গৌরবে উদ্ভাসিত, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রভাবিত, সত্য ও সুন্দরের মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা লাভ করিবে। কর্ম্মহীন, ধর্ম্মহীন, সত্যহীন ভারতবাসী জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও সত্যের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আবার বিশ্বের বিরাট্-সভায় আপনার স্থান অধিকার করিবে।

উনিশ বৎসর পূর্ব্বে যৌবনের প্রারম্ভে 'সাহিত্যে'র সূচনায় লিখিয়াছিলাম,—"জাতীয় জীবনের উন্নতি সাহিত্য-সাপেক্ষ।" যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ। আজ যৌবনের শেষে নবভারতের স্বদেশী যুগে প্রত্যক্ষ প্রমাণে বুঝিয়াছি, সাহিত্য ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জাতির জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।—রাজনীতির রণক্ষেত্রে জাতীয়তার স্থান নাই। স্বার্থের সংঘর্ষ ও বিজেতা ও বিজিতের বিষম দ্বন্দ্বও জাতীয়তার উৎস নহে। বিশাল ও বিপুল উদার ও পবিত্র সাহিত্যই মানবকে উদ্বুদ্ধ, উন্নত ও জাতীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সাহিত্যই মানবের উন্নতির সোপান, মুক্তির পথ ;—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

যাহা সত্য ও সুন্দর, সাহিত্য তাহার রত্নাকর। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের উপাসক। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের একনিষ্ঠ সাধক। সাহিত্যের সাধনা, সৃষ্টি ও পুষ্টি জাতীয়তার, মানবতার ও মনুষ্যত্বের কামধেনু। যাহা সত্য ও সুন্দর নহে, তাহা কখনও 'শিব' হইতে পারে না। আমরা সত্য ও সুন্দরের উপাসনায় বিরত হইয়া, সত্য ও সুন্দরের মহিমা বিস্মৃত হইয়া, অধঃপাতের অন্ধকূপে পতিত হইয়াছি,

—অবসাদে মুমূর্ষু হইয়াছি। যাহা সত্য নহে, তাহা সুন্দর হইতে পারে না। যাহা সুন্দর নহে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। যাহা একাধারে সত্য ও সুন্দর—তাহাই 'শিব'। সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরং' ভারতের বরেণ্য দেবতা ;—এবং সাহিত্যই সেই দেবতার স্বর্ণ-দেউল, আমরা যেন কখনও তাহা বিস্মৃত না হই। বাঙ্গালী! আবার সাহিত্যের তপোবনে সত্য ও সুন্দরের উপাসনায়, সাধনায় প্রবৃত্ত হও,—সাহিত্যকে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' বলিয়া বরণ কর, অসত্যের কুহেলিকা ভেদ করিয়া, ভারতে সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হউক,—কুৎসিতের চিতাগ্নিশিখার উজ্জ্বল প্রভায় সুন্দরের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।...

এই সাহিত্য-মন্দিরে আপনাদের প্রসাদে আমরা অতীত ইতিহাসের জীর্ণ সমাধি হইতে জাতীয় গৌরবের কঙ্কাল সংগ্রহ করি।—ভবিষ্যতে কোনও পুণ্যবান্—যার প্রসাদে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র লাভ করিয়া, মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ হইয়া, সেই কঙ্কালে সুন্দর দেহের সৃষ্টি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।—তখন সেই নবপ্রাণবলে বলীয়ান্, মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ জাতীয় গৌরবের উদ্বোধনে ও আহ্বানে জাগরূক হইয়া নূতন বাঙ্গালী বাঙ্গালার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিবে, তখন তাহারা কোটী কণ্ঠে এই পুণ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও কমলার বরপুত্রগণের গৌরব-গাথা গান করিবে। সেই শুভদিন স্মরণ করিয়া, হে বাঙ্গালী, হে পতিত বিধ্বস্ত আত্মবিস্মৃত, সুপ্তোত্থিত বাঙ্গালী! তুমি আজ জগতের আদি জ্ঞানসিন্ধু ঋগ্বেদের ভাষায় গাও—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানি হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

পত্রাবলী

[১। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত]

২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,
কলিকাতা।

সুহৃদ্বরেষু—

একটি শুভসংবাদ আছে। নিত্যকৃষ্ণ ভায়া শুক্রবার প্রাতে ৮টার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার কলেরা হয়। ক'দিন রোগভোগের পর বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আনা হয়। তখন সংজ্ঞাহীন, বিকারের অবস্থা; আর কোনও আশা ছিল না। শুক্রবার সকল যাতনার অবসান।

শুক্রবার (অসুখের পর দিন) খবর পাইয়া যাই। সেদিন রাত্রিতে ছিলাম। তারপর প্রত্যহই যাইতাম, কিন্তু অকারণ। চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। প্রতিকার করিতে পারিলাম না। কখনও এলোপ্যাথি, কখনও হোমিওপ্যাথি—হাতুড়ের হাতে। আমাদের অদৃষ্ট! দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ অনেক পাইয়াছি, কিন্তু এবার সেটা শেলসম বিঁধিয়াছে।

আপনারা সব কেমন?

সুরেশ

১৫।৭।১৯০০

[২। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিককে লিখিত]

প্রিয়বরেষু—

রবিবাবুর গানে আছে, "বঁধু তোমায় করব রাজা তরুতলে।" আমরা দরিদ্র, রাজপ্রাসাদে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি আপনাকে তরুতলেই আমাদের রাজা করিয়াছি। "বনফুলের বিনোদ-মালাও দিব গলে" এবং "সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দিব পেতে" কেন, হৃদয়সিংহাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া "নয়নজলে" আপনার অভিষেক করিতেছি। হে শ্রদ্ধাস্পদ রাজা! চিন্ময়ী মা ও মৃণ্ময়ী মা আপনার মঙ্গল করুন। আপনার লক্ষ টাকা মা লক্ষ্মীর কৌটার মঙ্গলসংস্থান। তোমাদের [আমাদের]—মঙ্গলসংস্থান, এ দান সফল হউক—হে ভগবান, আমাদের মুখ রাখো।

আমি ব্রাহ্মণ,—আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত প্রজা, আশীর্ব্বাদ করি, আপনার হিমালয়ের মত উন্নত ও ভারতমহাসাগরের মত বিশাল হৃদয় চিরনির্ম্মল ও এইরূপ নিঃস্বার্থ হউক। অন্য আশীর্ব্বাদ আমি জানি না। ইতি সন ১০।১১।০৫।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করিলে দেশের লোকে উহাকে "রাজা" উপাধি দেয়। সেই উপলক্ষে উপরের পত্রখানি লিখিত।] 'সন্ধ্যা' ১ম বর্ষ ২৫৫ সংখ্যা ২রা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩১২ সাল

বাগ্মিতা

সুরেশচন্দ্র বাগ্মী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি কখনও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতেন না, বরং এরূপ করাকে অপরাধ বলিয়াই মনে করিতেন। সাধু ভাষায়, স্বল্প সময়ে বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া তিনি শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করিতে পারিতেন।

মৃত্যু

সুরেশচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। তিনি ১লা জানুয়ারি ১৯২১ (১৭ পৌষ ১৩২৭) তারিখে, ৫১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যে "সুরেশ-স্মৃতি" লিখিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> 'সাহিত্যে'র একটা আসর ছিল। সুর ছিল বলিয়াই আসর ছিল। অর্থ ছিল না, প্রভুত্ব ছিল না, নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইবার সামর্থ্য ছিল না। তথাপি 'সাহিত্যে'র আদর ছিল, কদর ছিল, সমজদার ছিল। তাহার কারণ ঐ সুর। তাহা দেশের সুর, দশের সুর, ঐকতান বাদ্যের সম্মিলিত সুর। তাহাতে অপূর্ণতা ছিল না, অবসাদ ছিল না, 'হা হতোঽস্মি' ছিল না, প্রাণপূর্ণতা ছিল।
>
> কি ছিল, এক কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কি ছিল না, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করা যায়, ছিল না—ভণ্ডামি। তাহা অশেষ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিত।

প্রবন্ধনির্ব্বাচনের কড়াকড়ি 'সাহিত্য'কে এই অসাধারণ গৌরব দান করিয়াছিল। এখন লেখকের সংখ্যা অসংখ্য, বুঝি বা পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। এমন দিনে যে কেহ লিখিতেছেন, যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন, বিষয়-বিন্যাসে ও বচনবিন্যাসে স্বেচ্ছাচার সমান ভাবে প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। এমন দিনে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করা যে কত কঠিন, তাহা 'সাহিত্য'-সম্পাদককে সর্ব্বদা স্বীকার করিতে হইত। তথাপি দৃঢ়তা তাঁহার রক্ষাকবচ ছিল।

এই দৃঢ়তা কেবল প্রবন্ধবর্জ্জনেই ব্যক্ত হইত না, প্রবন্ধসৃষ্টিতেও ইহা আর এক আকারে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা আব্দার। সম্পাদক অনেক সময়ে নিজেই বিষয় নির্ব্বাচন করিতেন, লেখক নির্ব্বাচন করিতেন এবং লেখার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এই দৃঢ়তা 'সাহিত্যে'র আসরে যাঁহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত টানাটানিতে না পড়িলে লেখনী ধারণ করিতেন না। ইহাতে অনেক নূতন পুরাতন লেখক জড়তা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার জন্য যে তাড়না ছিল, সে বড় মধুর স্নেহের তাড়না, তাহা কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, সমাজপতিই তাহা জানিতেন।

'সাহিত্যে' ভণ্ডামি ছিল না বলিয়াই গোঁড়ামি তাহাকে সঙ্কীর্ণ নীতিতে গণ্ডীবদ্ধ করিতে পারে নাই। এই উদারতা না থাকিলে প্রকৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। বিদেশের সাহিত্যে যাহা কিছু ভাল বাহির হইত, বিদেশী বর্জ্জনের তুমুল আন্দোলনের দিনেও, তাহা সাদরে সাহিত্যে স্থান লাভ করিত।

সাহিত্যের সমালোচনা 'সাহিত্যে'র বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে অকুণ্ঠিতভাবে তিরস্কার পুরস্কার

বিতরিত হইত। সাহিত্যকে অনাবিল রসের আধার করিবার আন্তরিক আকুলতাই 'সাহিত্য'-সম্পাদককে সমালোচনায় সীমাশূন্য, ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মমত্ববোধ যত আন্তরিক হয়, অনধিকার চর্চ্চাকে সুশাসিত করিবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া থাকে। আমার দেশ, আমার ভাষা, আমার সাহিত্য, এই মমত্ববোধ প্রবল হইলে, তাহার প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার নিবারণের জন্য স্বতই সীমাশূন্য ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই,—লাভবান্ হইয়াছে।

সুরেশ শক্তিধর ছিল। বক্তৃতায় ও রচনায় তাহার অনেক পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মূল আন্তরিকতা। এই গুণ তাহার অনেক দোষ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, এই গুণে অনেক সময়ে তাহাকে তিরস্কার করিতে গিয়া ক্ষমা করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। সুরেশ চলিয়া যাইবে, আমাকে তাহার কথা লিখিতে হইবে, এমন কথা এক দিনও মনে হয় নাই। ইহাই আমার প্রধান শোক।—'সাহিত্য', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৭।

সুরেশচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

অপেক্ষাকৃত সামান্য আয়োজন লইয়া বাংলা-সাহিত্যে যাঁহারা প্রভূত খ্যাতি ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগই প্রধানতঃ এই খ্যাতির কারণ। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সরস বাক্যবাণের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী অর্জন

করিয়াছিল এবং উত্তর কালে তাঁহার অন্য সকলবিধ রচনার স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও এই সমালোচনার জন্য রসিক-সমাজ তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। সাহিত্যিক-গোষ্ঠীকে একত্র করিয়া প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রতিভা অনুযায়ী সৃষ্টিকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার ছিল; তিনি নিজে যতটুকু সাহিত্যসৃষ্টিই করিয়া থাকুন, সাহিত্যিক সৃষ্টির কাজে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মোটের উপর এই কারণে আমরা সমাজপতিকে শুধু এক জন সাহিত্যিকরূপে গণ্য না করিয়া যুগ-হিসাবে গণ্য করিয়া থাকি। তাঁহার সম্পাদিত 'সাহিত্যে' এই যুগের পরিচয় অক্ষয় হইয়া আছে।

সুরেশচন্দ্রের অনবদ্য রচনার নিদর্শনস্বরূপ আমরা তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি :—

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার গ্রন্থিস্বরূপ, মিলনবিন্দুস্বরূপ, ভূদেব এ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ভক্তিযুক্ত হিন্দু, জ্ঞানে উদার সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক, শাস্ত্রে প্রগাঢ় চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজে বহুদর্শী ধীর সংস্কারক, পরিবারে প্রীতিপরায়ণ কর্ত্তব্য-শরণ কর্ম্মযোগী, স্বয়ং শত সহস্রের শিক্ষক অথচ আজীবন শিক্ষার্থী শিষ্য, ভূদেব, স্বীয় জীবিতকাল কর্ম্মযোগে অতিবাহিত করিয়াছিলন। ভূদেবের জীবিতকালে তাঁহাকে বিষয়ী সংসারী বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার দেহাত্যয়ের পর দেখা গেল, ভূদেবের শাস্ত্রশর্চ্চা নিষ্ফল নহে; গীতার উপদেশে তিনি নিজ জীবনযাত্রা, সংসারপ্রণালী নিয়মিত করিয়াছিলেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষক ও শিষ্য, নিষ্কাম ভাবে চিরজীবনসঞ্চিত প্রচুর অর্থ দান করিয়া বঙ্গে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

ভূদেব-চরিত্রের মূল সূত্র, তাঁহার মৌলিকতা। তিনি ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আত্ম-

বিসর্জ্জন করিয়া, পাশ্চাত্য পথের পথিক হন নাই। স্বদেশের ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে, তাঁহার প্রভূত আস্থা, অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এক দিকে বিলাতী শিক্ষার নয়নান্ধকারী উজ্জ্বল চাক্‌চিক্য, অন্য দিকে স্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ব্বাণোন্মুখ বিকৃত বহিরালোক, ভূদেব উভয়ের একটিকেও নিজের লক্ষ্য করেন নাই। বিচারকুশল প্রাচীন-কালের প্রবীণ আর্য্যের ন্যায়, নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তির সাহায্যে, উভয়ের অন্তর্নিহিত সার্ব্বভৌম উদার অলোকে উভয়কে বুঝিয়াছিলেন, —চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা নিজের গন্তব্য পথের নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় এক দিকে প্রধাবিত বাঙ্গালী সমাজে এ দৃশ্য আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

ভূদেব না ভাবিয়া কিছু করিতেন না,—নিজের চিন্তা ও বিচার-শক্তির সাহায্যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিতেন। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি,—কেবল সাহিত্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না, এই সকল গ্রন্থে, তিনি নিজের হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

এ দেশে আন্তরিকতা বড় অল্প। কিন্তু ভূদেবে এই আন্তরিকতা বড় প্রবল ও প্রভাবপূর্ণ ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী সাহিত্যবিলাসের উদাহরণ-মাত্র নহে, তাঁহার আন্তরিকতার ফল। তিনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, স্বদেশ ও সমাজকেও সেই কর্ত্তব্যপথে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্কারকের আড়ম্বর ছিল না। পারিবারিক প্রবন্ধে যে হিন্দু পরিবারের চিত্র দেখিতে পাও, ভূদেব নিজের পরিবারটি তদনুরূপ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। তাঁহার সমাজিক প্রবন্ধের আদর্শেই তিনি সমাজের সহিত ব্যবহার

করিয়া গিয়াছেন। আচার প্রবন্ধে তিনি যাহা সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিজে সেই আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। জীবন ও জীবনের কার্য্যে এমন ঐক্য, বাঙ্গালীজীবনে দুর্লভ।

ভূদেব বাবুর সকল মত সকলের অনুমোদিত বা স্বীকার্য্য হইবে, এমন মনে করা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, ভূদেব কেবল উপদেশ দিয়া বিরত হন নাই, নিজে আজীবন স্বকীয় অভিমতকে ভিত্তি করিয়া, আত্মপরিবার গঠন করিয়াছেন, সমাজের সহিত ব্যবহারে আসিয়াছেন, সদাচারপূত হইয়া শাস্ত্রানুশীলনে, ধর্ম্মচিন্তায় এবং স্বদেশের ও সমাজের মঙ্গলানুধ্যানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এবং সেই জীবন, জীবনযাত্রার প্রণালী ও তাহার পরিণাম, বাঙ্গালীর উত্তম আদর্শ;—তাঁহার চরিত্র, পরার্থপর অথচ আত্মস্থ,—সংসারলিপ্ত অথচ নিষ্কাম বীরের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁহার চরিত্র ও সামাজিক ব্যবহার হইতে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

ভূদেব নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিলাতী শিক্ষায় ও ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও, স্বদেশীয় শাস্ত্রে আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি আজীবন অধ্যাপকশ্রেণীর ভক্ত ছিলেন,—মৃত্যুকালে সেই হৃদয়ের ভক্তি কার্য্যে পরিণত ও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ভূদেব যে অর্থরাশি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন,—এবং তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধে" "অর্থসঞ্চয়" ও মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিজের জীবনে তাহার অনুশীলন করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন,—তাহার প্রায় সমুদায়—দেড় লক্ষেরও অধিক টাকা, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার, হিন্দু শাস্ত্রের ও অধ্যাপকবর্গের উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। মনে করিয়া দেখ, গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান,—চিরজীবনের কঠোরপরিশ্রমলব্ধ অর্থ কিরূপে ব্যয়িত করিলেন।

ভূদেব যদি আর কিছুও না করিতেন,—কেবল এই এক সাত্ত্বিক নিষ্কাম দানে তাঁহার নাম বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।

বদান্য ভূদেবের দানশীলতা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া থাকুক। ভূদেবের জীবন-তত্ত্বের অনুশীলনে ও অনুসরণে, বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবন প্রশস্ত ও পবিত্র হউক।—('সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

রামেন্দ্রসুন্দর।—গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি দশটার সময় মনীষী, মনস্বী, যশস্বী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মার মন্দিরের ঘৃত-প্রদীপ সহসা নিবিয়া গেল! দেশবাসীর মনে শোকের অন্ধকার; সাহিত্যের তপোবনে বিষাদের ছায়া। সাহিত্য-দেবতার পবিত্র মন্দিরে যে কয়টি দীপে পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আমরা মায়ের আরতি করিতাম, সেই পঞ্চপ্রদীপের উজ্জ্বল মধ্য-দীপ রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালার সারস্বত মন্দির অন্ধকার করিয়া অকালে আলোর সাগরে অস্তমিত হইলেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য শোচনীয়। আমাদের দুর্ভাগ্য আরও শোচনীয়। রামেন্দ্রসুন্দর সমগ্র বাঙ্গালার ও সমগ্র বাঙ্গালীর আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে যে কয় জন ভাগ্যবানের মধ্যে তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। আমার প্রথম পরিচয়ের প্রীতি ভক্তিতে, এবং সেই ভক্তি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। জীবন-প্রভাতে যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি আমার অগ্রজের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহাকে হারাইয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য আরও শোচনীয়।

রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক, তিনি সাহিত্যিক। কর্ম্মী রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার

জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সে বিশেষত্ব—তাঁহার দেশাত্মবোধ। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত ভাবের সুবর্ণে কোনও খাদ ছিল না।

রামেন্দ্রসুন্দর শৈশবে, কৈশোরে স্বীয় জনকের নিকট এই স্বাদেশিকতার দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ছিল বিদেশী, কিন্তু দীক্ষা ছিল স্বদেশী। বিদেশের জ্ঞানে বিজ্ঞানে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও রামেন্দ্রসুন্দর কখনও স্বাদেশিকতায় বঞ্চিত হন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।

আমার মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও-যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার। প্রতীচ্য শিক্ষা তাঁহাকে প্রাচ্য ভাবে, প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর, প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর 'আহেলে বিলাতী' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া সে কালের বাঙ্গালার সাবেক চণ্ডী-মণ্ডপের খাঁটী বাঙ্গালী থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে শিক্ষায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত ও উদ্ভটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মত বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-সম্ভূত হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া,তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। বাল্য-জীবনের পারিবারিক দীক্ষা তাঁহাকে রক্ষাকবচের মত রক্ষা করিয়াছিল। ডিরোজিও-যুগের দেশহিতৈষণা, 'গণে'র কল্যাণকামনা, দেশহিত-ব্রতে অদম্য উৎসাহ রামেন্দ্রসুন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে যুগের কোনও অসংযম, কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার জীবন ও চরিত্র

দূরে থাক, তাঁহার চিন্তা বা তাঁহার কোনও সঙ্কল্পকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি ভাবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ। ভবিষ্যতের বাঙ্গালী মধুকরের মত বিশ্ব-নন্দনের নানা ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করিবে, কিন্তু সে চক্রে, সে মধুতে তাহার নিজত্ব থাকিবে। রামেন্দ্রসুন্দর স্বীয় জীবনে, চরিত্রে ও জীবনের কর্ম্ম-সমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজত্বের পরিচয় ও প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবী বাঙ্গালীর অগ্রদূত। নিজত্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন হইলে যাহা হয়, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে 'গোঁড়ামী'র স্থান নাই, কিন্তু নিজত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে, রামেন্দ্রসুন্দর নিজের জীবনে বাঙ্গালীর-উত্তর-পুরুষের জন্য এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি পঁচিশ বৎসর রিপণ কলেজে অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতা করিয়া শিক্ষাবিভাগে যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচয়, প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা সাহিত্যে। সংক্ষেপে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ পরিচয়দান সম্ভব নহে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা,—মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত-সাধনার ত্রিবেণীসঙ্গম বহু দিন বাঙ্গালীর তীর্থ হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালীর সাহিত্য তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। তিনি সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাঁহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরস ভাষা তাঁহার নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাঙ্গালী লেখকের লোভনীয় হইয়া থাকিবে।

তাঁহাকে শুধু লেখক বা সাহিত্যিক ভাবিলে আমরা ভুল করিব। তিনি শক্তিশালী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাতা ছিলেন। দুরূহ বিষয়ের বিশদ আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে; ভবিষ্যতেও তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব তিনি জলের মত বুঝাইয়া দিতেন; নিজে আত্মসাৎ করিয়া, তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া, সমগ্রের স্বরূপ দর্শন করিতেন; তাহার পর সমাহারে স্বীয় চিন্তার অভিব্যক্তির ফল দেশবাসীকে দান করিতেন। আলোচ্য বিষয়ের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না; তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যেও নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের সকল কর্ম্মের মূল—দেশাত্মবোধ। তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার পূজা করিয়া গিয়াছেন। 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা'ই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষদ্ রামেন্দ্রসুন্দরের কীর্ত্তিস্তম্ভ। রামেন্দ্রসুন্দরের বুকের রক্তে পরিষদ্-মন্দিরের ইটের পর ইট গাঁথা হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে পরিষদে আত্মদান, ইহার মূলও তাঁহার দেশাত্মবোধ। দেশাত্মবোধের সাধনার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর এই দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়াছিলেন। কলেজে, পরিষদে, সাহিত্যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাতৃপূজাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনিও বলিতে পারিতেন,—'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!' তিনি তাঁহার দেবতার জন্য মন্দির গড়িতেন, এবং মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এমন আন্তরিক চেষ্টা কি বাঙ্গালীর ভাগ্যেও নিষ্ফল হইতে পারে?

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার পুরাবস্তু, বাঙ্গালার অবদান,—এক কথায় বাঙ্গালীর প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক আমি জীবনে অতি অল্প দেখিয়াছি। 'যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গা-জলে', রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনই বাঙ্গালার উপকরণে বাঙ্গালার পূজা করিতেন, বাঙ্গালার ভাবে বাঙ্গালার সাধনা করিতেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধুতী চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন। তিনি দুই বার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক-রূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কেন জানেন? রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্র-সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয় বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন,—'ইংরাজী রচনায় আমি অভ্যস্ত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি "বেদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইস্‌চ্যান্সেলার সার ডাক্তার দেবপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা কেতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা বলিব, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শুভ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কোনও স্থান ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরই তাহার সূচনা করিয়া বাঙ্গালা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় অদূর-ভবিষ্যতে যাহা হইতে বাধ্য, রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিভার, মনস্বিতার, স্বাদেশিকতার ও মাতৃভাষা-ভক্তির নিক্রয়ে

বাঙ্গালীকে তাহার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'যজ্ঞ' শুধু সাহিত্যের হিসাবেই চিরস্মরণীয় নয়, এই হিসাবেও তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের আন্তরিক দেশভক্তি ও স্বাদেশিকতারও জয়স্তম্ভ বটে। রামেন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি,—'নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতো-হন্তরেষু সঃ।'

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মাধুর্য্য, হৃদয়ের ঔদার্য্য, চরিত্রের শুচিতা, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তার পরিচয় দিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। তাঁহার শ্রদ্ধাবুদ্ধির তুলনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আকর্ষণ করিবার শক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং কর্ম্মী ছিলেন ; এবং চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি তেমনই কর্ম্মী-দিগকে আকর্ষণ করিতেন। তিনি ভাবুক ও ভাবের প্রস্রবণ ছিলেন। যে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি বাঙ্গালার পূজায় মজিয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর করিয়া তিনি অনেক শক্তিশালী লেখককে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর অদ্ভুত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কলেজে কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু উত্তর-জীবনে দর্শন, উপনিষদ্, বেদে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার সহিত ত্রিশ বৎসরের পরিচয়ে আমি তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কখনও গুরুকরণ করিতে দেখি নাই। কালিদাসের উমার শিক্ষার সেই বর্ণনা মনে পড়ে—

'প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।'

লর্ড হার্ডিঞ্জ যাঁহাকে 'এসিয়ার রাজকবি' বলিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আমরা যাঁহাকে 'এসিয়ার গণতন্ত্রের কবি' বলিয়া জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত ভাব-যজ্ঞে তাঁহার সাহচর্য্য ছিল।

স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালে পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনায় অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,—'সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।' কে অস্বীকার করিবে, এই সুন্দর অভিনন্দনের প্রত্যেক অক্ষর সত্য। আর তখন কে জানিত, যাঁহার জীবন এমন সুন্দর, তাঁহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,—কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েক দিন পূর্ব্বে "নাইট" উপাধি বর্জ্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর আর এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। দেশভক্তিই যাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেরণা ছিল, দেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ মিশিয়া গেল। কবি সত্যই বলিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর! তোমার সকলই সুন্দর, তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর, তোমার জীবনের আদর্শ আরও সুন্দর। যদি নিষ্কাম ধর্ম্মে ও নিষ্কাম কর্ম্মে স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ তোমার। সেই স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর—তোমার দেশ সুন্দর হউক, বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষ সুন্দর হউক, হে সুন্দর! তোমার চিরসুন্দর আদর্শ সফল হউক, সার্থক হউক। ('সাহিত্য', ১৩২৬ আশ্বিন)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬৩

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮৮২—১৯২২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৩০ মাঘ ১২৮৮) শনিবার* মাতুলালয় নিমতা গ্রামে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—রজনীনাথ দত্ত; পিতামহ—জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ পিতার আদরের সন্তান। পুত্রকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য পিতা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কৃতী ছাত্র হিসাবে বিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সুনাম ছিল না। পাঠে তাঁহার যেরূপ অনুরাগ ছিল, পাঠ্য পুস্তকে সেরূপ ছিল না। তিনি ১৮৯৯ সনে কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৯০১ সনে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে এফ-এ পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বি-এ পরীক্ষা-দানের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হয়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবার পর আর তিনি বিদ্যালয়ে যান নাই; মাতুলের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে-ও অতি অল্প দিনের জন্য। তিনি বলিতেন, "ব্যবসায় ত অর্থোপার্জ্জনের জন্য, অর্থে আমার এমন কি প্রয়োজন?" সত্যেন্দ্রনাথ সোৎসাহে সাহিত্য-সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি শৈশবাবধি কবিতাপ্রিয় ছিলেন। কৈশোরেই তাঁহার কবিতা রচনার সূত্রপাত। ছাত্রাবস্থায় ১৯০০ সনে তাহার প্রথম পুস্তক 'সবিতা' গোপনে মুদ্রিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি মাসিকপত্রে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ' করেন; সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে'

* মাতুল শ্রীকালীচরণ মিত্রের মতে, সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়—১২৮৮ সালের ২৯এ মাঘ, শনিবার, দ্বিপ্রহর রাত্রে ('প্রবাসী' শ্রাবণ ১৩২৯)। কিন্তু ২৯এ মাঘ শুক্রবার হয়. এই কারণে আমরা কবির জন্ম তারিখ ৩০এ মাঘ ধরিলাম।

(ফাল্গুন ১৩০৮) তাঁহার 'দেখিবে কি (ভল্টেয়ার হইতে)' কবিতাটি মুদ্রিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার আসন সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ৪১ বৎসর বয়সে ২৫ জুন ১৯২২ (১০ আষাঢ় ১৩২৯, রাত্রি ২৷৷টা) তাঁহার অকাল-বিয়োগে বাংলা-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

এই সে দিন সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল নির্দ্ধারণ গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশকাল মুদ্রিত না হওয়ায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর গ্রন্থাবলীর সঠিক ক্রম-নির্দ্ধারণে ভুল করিয়াছেন।* 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-কার ডক্টর সুকুমার সেনও সত্যেন্দ্রনাথের সকল গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল জানেন না।† আমরা তাঁহার গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সযত্নে সঙ্কলন করিয়াছি, তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **সবিতা** (কাব্য)। ইং ১৯০০ (১৩ জুন)। পৃ. ২৬।

সবিতা (কাব্য)।—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। "For I doubt not through the ages one increasing purpose runs, And the thoughts of men are widened by the

* "কবি-পরিচয়" : 'অভ্র-আবীর', ২য় সংস্করণ। 'রঙ্গমল্লী' ও 'চীনের ধূপে'র ক্রম তুলনীয়।

† 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ডে (পৃ. ৫০৪) 'সন্ধিক্ষণ', 'হোমশিখা', 'অভ্র-আবীর' ও 'রঙ্গমল্লী'র প্রকাশকাল তুলনীয়।

process of the Suns."—Tennyson. কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৯০০। মূল্য ৵০ দুই আনা।

"ইহা একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাব্য। কবি নবীন—'সবিতা' তাঁহার প্রথম উদ্যম।"—প্রকাশক। 'সবিতা' সত্যেন্দ্রনাথের পঠদ্দশায় ১৩০৫ সালে রচিত। 'সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু (উকীল) শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যয়ে গোপনে 'সবিতা' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।' পুস্তিকার "সূচনা"য় সত্যেন্দ্রনাথ এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার। এত উৎসাহ—এত তেজ আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মানবের এমন গুরু আর নাই। তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্ত্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্ম্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে—আর নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় শত শত লোক বর্ষে বর্ষে অনশনে প্রাণ হারাইতেছে, এমন করিয়া কত দিন চলিবে? দুই শত—চারি শত, দুই সহস্র—চারি সহস্র বৎসর, তার পর? জগৎ হইতে ভারতবাসীর নাম মুছিয়া যাইবে। জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরই সমাদর—প্রকৃতির নিয়ম। তাই যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয়, তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্ত্তব্য। সত্য বটে, দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাই

উৎসাহ চাই—বল চাই—জ্ঞান ও সত্যের সমাদর চাই। তৃষ্ণার সময় কঠোর সংযম প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই আমাদের দুর্দ্দশা। এখন কিসে সকল সময় শীতল সলিল সুলভ হয়—অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তাহাই দেখিতে হইবে। পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইব না—প্রতিযোগিতায় জগতের সমকক্ষ হইব—ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। সবিতার মত অদম্য উৎসাহ, অনন্ত তেজ, অশ্রান্ত গতি চাই। তবেই দেশের কল্যাণ—জাতির কল্যাণ—প্রতি অধিবাসীর কল্যাণ। এখনও সময় আছে। পূর্ব্বপ্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না? ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন? শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।"

'সবিতা' আর স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; 'হোমশিখা'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২। **সন্ধিক্ষণ** (কাব্য)। ? (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৫)। পৃ. ১৩।

সন্ধিক্ষণ। যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একতার, তাঁহাদেরি তরে এই ক্ষুদ্র উপহার। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া 'সন্ধিক্ষণ' লিখিত। 'সন্ধিক্ষণ' আর স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পরে প্রকাশিত 'বেণু ও বীণা'র ২য় সংস্করণে (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২২) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। **বেণু ও বীণা** (কাব্য)। আশ্বিন ১৩১৩ (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ১৫০।

" 'বেণু ও বীণা'র অধিকাংশ কবিতা এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

এই কবিতাগুলি ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।”
—ভূমিকা।

৪। **হোমশিখা** (কাব্য)। আশ্বিন ১৩১৪ (১২ অক্টোবর ১৯০৭)।
পৃ. ১৫৭।

“‘হোমশিখা’র প্রথম কবিতাটি [সবিতা] ভিন্ন সমস্ত কবিতাই এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলি ১৩০৫ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।”—ভূমিকা।

৫। **তীর্থ-সলিল** (কাব্য)। আশ্বিন ১৩১৫ (২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮)।
পৃ. ১৭৫+।৵০।

“তীর্থসলিলের প্রায় ত্রিশটি কবিতা ‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট নূতন। ‘তীর্থসলিল’ জগতের সমস্ত সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই নানা দেশের, বিভিন্ন যুগের, বিচিত্র কবিতার পদ্যানুবাদ; ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদের অনুবাদ। সকল স্থলে মূলের ছন্দ রাখিতে পারি নাই; তবে, মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্ত্তি ও নানা ভাবের সহিত পরিচয় সাধনই এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য।”—ভূমিকা।

৬। **তীর্থরেণু** (কাব্য)। ললিতা সপ্তমী, ১৩১৭ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। পৃ. ২০১+৸০।

“‘তীর্থরেণু’র কয়েকটি কবিতা ‘ভারতী’ ও ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকী নূতন।

‘তীর্থসলিলে’র ভূমিকায় যে সমস্ত কথা লেখা হইয়াছিল, ‘তীর্থরেণু’ সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য;…।”—ভূমিকা।

৭। **ফুলের ফসল** (কাব্য)। ভাদ্র পূর্ণিমা, ১৩১৮ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃ. ১০৫।

"এই গ্রন্থের দশ বারটি কবিতা ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকী নূতন। এই কবিতাগুলি ১৩১৩ সাল হইতে ১৩১৭ সালের মধ্যে রচিত।"—ভূমিকা।

৮। **জন্মদুঃখী** (উপন্যাস)। দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি, ১৩১৯ (২০ জুলাই ১৯১২)। পৃ. ১৬২।

"নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক Jonas Lie রচিত Livsslaven নামক উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে 'জন্মদুঃখী' রচিত হইল।...ইহা ধারাবাহিকরূপে এক বৎসর-কাল 'প্রবাসী'তে [১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র] প্রকাশিত হয়। এখন একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল।"

৯। **কুহু ও কেকা** (কাব্য)। রাখীপূর্ণিমা, ১৩১৯ (১০ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১৯৭।

"এই গ্রন্থের অল্প কয়েকটি কবিতা ভারতী, প্রবাসী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন এবং আরও দুই একখানি কাগজে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বেশীর ভাগ নূতন।"

১০। **চীনের ধূপ** (নিবন্ধ)। ? (৫ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ. ৬৪।

"চীনদেশের ঋষি ও মনীষীদিগের ভাব-সম্পুট।"

১১। **রঙ্গমল্লী** (নাট্য)। ? (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩)। পৃ. ১৩৯।

সূচী :—আয়ুষ্মতী (ষ্টিফেন ফিলিপ্স), সবুজ সমাধি (চীনা নাটক), দৃষ্টিহারা (মেটারলিঙ্ক), নিদিধ্যাসন (জাপানী নাটক)।

১২। **তুলির লিখন** (কাব্য)। শ্রাবণ ১৩২১ (২২ আগষ্ট ১৯১৪)। পৃ ১৮০+১।

"এই কবিতাগুলি ১৩১৬ সালের বর্ষাকালে রচিত। সম্প্রতি একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এগুলি একাত্মিকা পদ বা একোক্তি-গাথা।"

১৩। **মণি-মঞ্জুষা** (কাব্য)। মধ্য-শরৎ বাইশ সাল (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ২৩৮।

"মণি-মঞ্জুষার অনেকগুলি কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, অনেকগুলি নূতন।"

১৪। **অভ্র-আবীর** (কাব্য)। বাসন্তী পূর্ণিমা বাইশ সাল (১৬ মার্চ ১৯১৬)। পৃ. ২৪০।

১৫। **হসন্তিকা** (ব্যঙ্গ কবিতা)। পৌষ-পার্ব্বণ তের-শ' তেইশ (জানুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ৮৮।

"শ্রীনবকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-দ্বারা ফুৎকৃত।"

বারোয়ারি (উপন্যাস)। ইং ১৯২১ (২ মে)।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই বারোয়ারি উপন্যাসের ২৯-৩২ পরিচ্ছেদ (পৃ. ২০০-২৩৪) সত্যেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১৬। **বেলা শেষের গান** (কাব্য)। ? (১৯ অক্টোবর ১৯২৩)। পৃ. ১৭৩।

১৭। **বিদায় আরতি** (কাব্য))। ? (২ মার্চ ১৯২৪)। পৃ. ১৯১।

১৮। **ধুপের ধোঁয়ায়** (নাটিকা)। শ্রাবণ ১৩৩৬ (১২ ১৯২৯)। পৃ. ১০০।

১৯। **কাব্য-সঞ্চয়ন** (নির্ব্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ)। ? (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। পৃ. ২৬৪+৩।

২০। **সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা**। বৈশাখ ১৩৫২ (ইং ১৯৪৫)। পৃ. ৭৮।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

'প্রবাসী', 'ভারতী' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় জীবদ্দশায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য বহু রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তিনি "ডঙ্কানিশান" নামে একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রবাসী'তে (আষাঢ়-কার্ত্তিক ১৩৩০) প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনা 'প্রবাসী' (১৩৩০), 'ভারতী' (১৩২৯-৩০), 'বিচিত্রা' (১৩৩৭), 'বঙ্গলক্ষ্মী' (১৩৩৮) প্রভৃতিতে মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্রাবলী

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষক বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র ১৩৪৯ সালের অগ্রহায়ণ ও মাঘ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পত্রের মধ্যে দুইখানি আমরা নিম্নে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—

বন্দে মাতরম্

১৩১৪ মাঘ

সুহৃদ্বরেষু,—যখন তুমি এই চিঠি পাইবে তখন আমার জীবনের পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জীবনকালের পরিমাণ পূর্ণ এক শত বৎসর ধরিলেও তাহার তিন ভাগ মাত্র রহিল। কিন্তু জীবনের আদর্শ এখনও বহু দূরে। Keats এ বয়সে তাঁহার অন্তরের সমস্ত রসসৌন্দর্য্য ঢালিয়া একটি অপূর্ব্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মৃত্যু-খণ্ডিত অসম্পূর্ণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। আর আমি?—?—?—?—?

আমার কথা যাক। তোমার সংবাদ কি? তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহার অন্তরে যে কতখানি মহৎ শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা উপলব্ধি করিবার জিনিস বটে। বিকাশোন্মুখ তরুণ মনকে তোমার মনের অনুকূল হাওয়ার মধ্যে এক একটি করিয়া পাপড়ি খুলিতে অবসর দেওয়া যে কতখানি আনন্দের ব্যাপার তাহা আমি অনুমান করিয়া লইতে পারি।

সে দিন পরেশনাথের মন্দির হইতে ফিরিবার সময় একটা অপরিচ্ছন্ন পল্লীর মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম, একটা দুর্গন্ধের উত্তেজনায় মনটা এই পল্লীর অধিবাসীদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাবে বাঁকিয়া বসিতেছিল। পচা আমানির গন্ধ, পচা ডিমের গন্ধ, পাঁকের গন্ধ এবং গোহাটার অকথ্য দুর্গন্ধ বাতাসটাকে একেবারে ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর কলের ধোঁয়া, গাড়ীর ধূলা, গাভী-বিক্রেতাদের বাক্‌বিতণ্ডা, ঋণকারী বৃদ্ধ চাচার শ্মশ্রু উৎপাটনকারিণী ভোজপুরবাসিনীর বীররসাত্মক গ্রাম্য ভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর ও পল্লীর মিঞা মহলে উত্তেজনা। ইহারই মধ্যে,—তুমি কি মনে করিতেছ? রূপের ঝলক?

—না, একটি সদ্যঃজাত নিতান্ত শিশুর ক্রন্দনশব্দ! এক মুহূর্ত্তে—আমার সমস্ত অবজ্ঞা সমস্ত বিরাগ অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই আবর্জনার মধ্যে যে ক্ষুদ্র মানবসন্তানটির কণ্ঠস্বর শুনিলাম, সে স্বর আমাদের নিতান্ত পরিচিত সে আমার কিংবা তোমার ঘরে যে মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া থাকে এখানেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। সে স্বর মনের যে পর্দ্দায় আঘাত করে এবং যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যের সঙ্গীত রচনা করে তাহা স্থান ও কালের একেবারে অতীত হইয়া মনের রাজ্যে সনাতন হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবশিশু! মানবের সমস্ত আশা ভরসা! মানবের ভবিষ্যৎ! মানবের সর্ব্বস্ব! তুমি সেই শিশুদের অপূর্ব্ব এবং অপরিণত জীবনের পথপ্রদর্শক, সহচর এবং গুরু একাধারে। তোমার জীবন ধন্য। এইমাত্র পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর পত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া আনন্দিত যে হইয়াছি তাহা বোধ হয় লিখিয়া জানাইতে হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"হোমশিখা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। নামটি সার্থক হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা পুণ্য তেজস্বিতা আছে—যাহা পূর্ব্বতন ঋষিদের হোমশিখাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে উচ্চ চিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বাক্য আছে যাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য। সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যেই সাম্যরসের একটা স্রোত বহিতেছে। শেষ কবিতাটিতে ইহার চরম বিকাশ হইয়াছে। আমার মতে "সাম্যসাম" কবিতাটাই প্রচ্ছন্ন শ্রেষ্ঠ অংশ, যেন একটি সমগ্র বৃন্ত বাড়িতে বাড়িতে একটি সুন্দর পুষ্পে পরিণত হইয়াছে। আমার রাশি রাশি আশীর্ব্বাদ।" তুমি কি মনে করিতেছ জানি না, আমার পক্ষে এই সমগ্র চিঠিটা তোমাকে না পড়াইয়া থাকিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। আমার বই হয়ত এতটা

ভাল না হইতে পারে। কিন্তু এই চিঠি আমার দেহে যতটা জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে সেই পরিমাণে যদি লিখিয়া উঠিতে পারিতাম তাহা হইলে আর একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠিত। মানুষ মিষ্ট কথার একান্ত কাঙাল। এই ফাল্গুনের প্রথম দিনে তুমি পূজনীয় রবীন্দ্রবাবুর "বসন্ত-যাপন" মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে এবং বোলপুরের শাল এবং মহুয়া গাছের আকস্মিক কিশলয় এবং মুকুল অঙ্কুরিত হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়া কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের পক্ষে "বসন্ত-যাপন" নিতান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কারণ সহরে যে বসন্ত বিকাশ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা দাগ রাখিয়া যাইতে ভুল করে না। অতএব তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার। তুমি ডাক্তারবাবুকে যে চিঠি লিখিয়াছ তাহা পড়িলাম। যাহারা নিজে না লিখিয়া কেবল অন্যের লেখা সমালোচনা করিয়া বেড়ায় তাহাদের সঙ্গে যাহারা নিজে বিবাহ না করিয়া অন্যের বিবাহের কথা আলোচনা করে তাহাদের প্রভেদ কি? লিখিও। আমার মনে যাঁহারা নিজে সুলেখক (যেমন Goethe এবং রবীন্দ্রনাথ) তাঁহারাই সুসমালোচক। এবং যিনি নিজে সুবিবাহিত, তিনিই নিজে সুঘটক। তুমি কি বল?

কলিকাতা, ৪৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট — তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু

মাঘ সংক্রান্তি — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

তোমার চিঠি এবং পোষ্টকার্ড যথাসময়ে পৌঁছেছে। ব্যোমকেশ দাদার মুখে শুনিলাম ৭ই বৈশাখ তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ হইবে সেই জন্য আর উত্তর লেখা হয় নি। তাছাড়া আমাদের বাড়ীশুদ্ধ অসুখ। আমার ছেলেটি বিয়াল্লিশ দিন টাইফয়েড জ্বরে ভুগছে। সকলের ছোট মেয়েটি বার দিন ভুগছে। ইত্যাদি ইত্যাদি

আমি নববর্ষের প্রথম দিনে শয্যা ত্যাগ করেই অনেক দিনের পর

একটু ডাম্বেল স্পর্শ করেছিলাম। তারপর একটু ফরাসী ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। Ruskin-এর Elements of Drawing এবং Cowell সাহেবের সম্পাদিত বৌদ্ধ জাতক পড়েছিলাম। বাড়ীতে অসুখ বলে ইচ্ছা সত্ত্বেও হার্মোনিয়ম সম্বন্ধে নূতন খাতা করা হয় নি।

নূতন বর্ষ সম্বন্ধে সম্রাট্ বাবর যা লিখেছিলেন, তার অনুবাদের অনুবাদ পাঠালুম—

হাসি ভরা বসন্ত সুন্দর।
সুন্দর সে বৎসর প্রবেশ
রসে ভরা আঙুর মধুর,
মিষ্টতর প্রেমের আবেশ!
ধর, ধর, জীবনের সুখ না পালায়
একবার গেলে সেও, ফিরিবে না হায়।

এই কবিতাটি তিনি কাবুলের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উপর একটি লাল পাথরের চৌবাচ্চা গাঁথিয়ে তারই গায়ে খোদিত করে নিয়েছিলেন। ঐ লাল পাথরের চৌবাচ্চা লাল রঙ্গের মদিরায় পরিপূর্ণ করে রাখা হ'ত। এবং ঐ চৌবাচ্চার সিঁড়িতে বসে সুন্দরীদের নৃত্যগীত উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে তিনি লাল পাথরের চৌবাচ্চাটায় লাল মদিরার পাত্র ভরে নিতেন। আমার এই চৌবাচ্চাটা দেখবার ভারি ইচ্ছা হচ্ছে। তোমার হচ্ছে কি?

দ্বিজু রায়ের নূতন গান আমার ভালই লেগেচে অবশ্য একটা লাইন ছাড়া; সেটা হচ্চে—"মানুষ আমরা, নহি ত মেষ"। ও গানটি আমার গানের* দ্বারা suggested মনে হবার কারণ কি? বুঝিতে পারিলাম না। পূজনীয় রবীন্দ্রবাবু কি এখন বোলপুরে অবস্থান কর্চ্চেন?

* "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।"

অজিতবাবুর খবর কি? তাঁহার বিবাহের কি হল? তোমার শুভেচ্ছার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ইতিঃ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২সরা বৈশাখ ১৩১৫।

সত্যেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

কবি সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হইয়াও তাঁহার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর লিখিত কবিতায় কবিগুরু কবিশিষ্যকে জয়যুক্ত ও চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। তিনি সার্থকনামা ছিলেন, সত্যের খাতিরে কাব্যশিল্পকেও মাঝে মাঝে খণ্ডিত করিয়াছেন।

সুসাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই বাংলা-সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের দানের কথা পরিস্ফুট হইবে। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দ-সরস্বতী, নানাবিধ ছন্দ-রচনায় ও উদ্‌ভাবনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবায় একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল। সেই সত্যের অনুরোধে তিনি স্পষ্টবাদী বীর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান-সম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা ভাষায় ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অতি উচ্চ সূক্ষ্ম কল্পনা অথবা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই বাস্তব হইতে কখনো দূরে সরিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার ছন্দ-সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীন প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর-একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃভাষার প্রতি অসীম প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত তিনি খাঁটি বাংলা বুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাঁহার রচনার মধ্যে দিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সেই বাংলাদেশের নিজস্ব বাগ্‌ধারাকে ও সেই ভাষার ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দ-ঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিয়া নূতন ছন্দ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্ত্তি। খাঁটি বাংলা ভাষা ও সেই ভাষার ছন্দকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সমৃদ্ধ করিয়া তোলাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল। বর্ত্তমানের যাহা কিছু অধর্ম্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল, তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত। আবার অতীত ও বর্ত্তমানে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর, ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিত, এবং তাহার বন্দনা-গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে, এমন কি, প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়াও দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দ্দশা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁহার একটি বিশেষ অনন্যসাধারণ নিপুণতা ছিল। এইরূপে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহাদের

অন্তরালে কবির হৃদয়-বেদনা অথবা আনন্দ ও আশা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।"*

রচনার নিদর্শনস্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথের বিবিধ কাব্য হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম :—

'বেণু ও বীণা' :

কিশলয়ের জন্মকথা

চোখ দিয়ে ব'সে আছি, কথন অঙ্কুর ফাটি'
বাহিরিবে প্রথম পল্লব ;
এক মনে আছি চেয়ে, ধরা যদি পড়ে তাহে—
নিখিলের আদি কথা সব।

সারাদিন ব'সে, ব'সে, তন্দ্রা চোখে এল শেষে ;
চরাচর ডুবিল তিমিরে ;
প্রভাতে দেখিনু জেগে, নয়নে কিরণ লেগে—
কচি পাতা কাঁপিছে সমীরে।

কোন্ দেশে

(বাউলের সুর)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দ'ল্‌তে হয় রে দুর্ব্বা কোমল ?

* "কবি-পরিচয়" : 'অভ্র-আবীর' (২য় সং)।

কোথায় ফলে সোণার ফসল,—
সোণার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পা'ব—
বাউল স্থরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ ?

কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

'ফুলের ফসল' ঃ

চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর ;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি' ;
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা' সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, ঊষার আতপ্ত কর ধরি' ;
মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব !

সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্য্যেরি সৌরভ ।

'কুহু ও কেকা' :

পাল্কীর গান

পাল্কী চলে !
পাল্কী চলে !
গগন-তলে
আগুন জ্বলে !
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় ব'সে
ঢুল্‌ছে ক'সে !
দুধের চাঁছি
শুষ্‌ছে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভন্‌ভনিয়ে ।—
আস্‌ছে কারা
হনহনিয়ে ?

হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক দু'পুরে
ধায় হাটুরে !

কুকুর গুলো
শুঁক্‌ছে ধূলো,—
ধুঁক্‌ছে কেহ
ক্লান্ত দেহ ।
ঢুক্‌ছে গরু
দোকান-ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে !

পাল্কী চলে,
পাল্কী চলে—
দুল্‌কি চালে
নৃত্য তালে !
ছয় বেহারা,—

জোয়ান তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে
তামার টাটে !
তপ্ত তামা,—
যায় না থামা,—
উঠ্‌ছে আলে
নাম্‌ছে গাড়ায়
পাল্কী দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায় !
ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে !
মেঠো জাহাজ
সাম্‌নে বাড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে !

কাজ্‌লা সবুজ
কাজল প'রে
পাটের জমী
ঝিমায় দূরে !
ধানের জমী
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া !

'সামাল্' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মর্দ্দ তারা !
জোর হাঁটুনি
খাটুনি ভারি ;
মাঠের শেষে
তালের সারি ।

তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে
চিল্ ফুকারে
মাঠের পারে ।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,—
ওই গো ! গাঁয়ের
ওই সীমানা !
বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপ্‌ছে কাদা ;

মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে!—
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

পর্‌জাপতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখ্‌ছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায়!

পাল্কী দেখে
আস্‌ছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে!

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা!
পাঠশালাটি
দোকান ঘরে
গুরু মশাই
দোকান-করে!

পোড়ো ভিটের
পোতার 'পরে
শালিক নাচে,
ছাগল চরে।
গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জ্বলে;
টাট্‌কা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্কী মাঠে
নাম্‌ল ধীরে ;
আবার মাঠে,—
তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,
পাল্কী মাতে
আপন নাটে !

শঙ্খ চিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে !
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে !
গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে ;
বাঁধের দিকে
সূর্য্য ঢলে।

পাল্কী চলে রে !
অঙ্গ ঢলে রে !
আর দেরী কত ?
আরো কত দূর ?
"আর দূর কি গো ?
বুড়ো শিবপুর
ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

পাল্কী চলে রে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য্য ঢলে,
পাল্কী চলে !

রিক্তা

(মালিনী ছন্দের অনুকরণে)

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্‌,
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে ?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?

রাগিণী সে আজি মন্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্ত্তি চূর্ণ,
বেলা চলে গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ।

যক্ষের নিবেদন

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও ;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম।

বৃক্ষের গর্ত্তেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্‌ ;
গ্রীষ্মের হোক্‌ শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃক্ষের কর হে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্চ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস !
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন !

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজ্য ! লও মোর পূজার ফুল,
পুস্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান্ দুজনকেই !
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিও কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্ম্মল হোক্ পথ—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক্ ;
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ !

পুষ্পের তৃষ্ণার কর হে অবসান, হোক্ বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ ;
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক্" বন্ধু ! বন্ধুর আশিষ লও ।

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী !'
চমকি চাহিনু,—স্বর্গ-সুষমা মর্ত্ত্যে পড়েছে খসি' !
এ পারে সবুজ বজ্‌ড়ার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি ;
শারদ দিনের কনক-আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম-চম্পকদল !
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে ।
জয় জয় বারাণসী !
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী ।

অগ্নিহোত্রী মিলিছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে ;
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যার নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যার রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বার বার
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার ।

এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায় আনি'!
এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর,—
—কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ম্বর।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইল আপনায়।
তেজের মূর্ত্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়—
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা,—সৃষ্টি, পালন, লয়;
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার,—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।
শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিল প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতমুখ!
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়!
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।

জয়! জয়! জয় কাশী!

তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতি রাশি!

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দুহুঁ হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
যার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব;
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলন-ধর্ম্মী মানুষ মিলিবে; এ নহে স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়।
স্ফটিক শিলার বিপুল বিলাস মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দ-ধাম ছুঁয়ে আছ মরভূমি;
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে;
তৃষিত জগত খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসী!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি'?
মধু-বিদ্যায় বিশ্বমানবে দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হোক্ সকল মানব, জয়ী হোক্ ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পচুক কর্ম্মনাশা।
ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হবেনাকো একেবারে
সবারেই দিতে হবে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।

তুমি কি কখন করিতে পার গো শুচি অশুচির ভেদ ?
তুমি যে জেনেছ চরাচরব্যাপী চির জনমের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী ভূমি !
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ ;—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায় ? কেবলি পুষিবে দেহ ?
দাও সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চির-নিবৃত্ত হোক্,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো ;
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক পাশাপাশি মিলেজুলে ;
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত জনের করে।
জয়! বারাণসী জয় !
অভেদ মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

সিংহল

("Young Lochinvar"এর ছন্দে)

ওই সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ !
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস !
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায় ;
এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
আজো বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়।

ওই বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
কাঠ্ শঙ্কর যার বল্কল-বাস, সিংহল যার নাম।
যার মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
যার পুষ্কর-মেঘ পুষ্করণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড়।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার ঘর,
হায় লুব্ধের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর ;
ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কন্যার হয় বর।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্ম্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার লঙ্গ'র ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ
সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্ব্বাণ।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি!
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে;—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।

নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল!
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ;
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

আমরা

মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে;—
বাম হাতে যার কম্‌লার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।

আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙ্‌লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।

বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান ,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশ-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে ;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে ;

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

'অভ্র-আবীর' ঃ

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল ?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।

টুক্ টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আল্তার মূল্য।
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলীর বোঁট
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
নয় বসরাই গুল।

ঝিল্‌মিল্ ঝিক্‌মিক্
ঝিক্‌মিক্ ঝিল্‌মিল্
পুষ্পের মঞ্জীল্
তার তন্ তার দিল্

তার তন্ তার মন
ফাল্গুন্-ফুল্-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন।

চোখ তার চঞ্চল ;—
এই চোখ উৎসুক
এই চোখ বিহ্বল
ঘুম্-ঘুম্-সুখ-সুখ !
এই চোখ জ্বল্-জ্বল্
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
নাই তীর নাই তল,
এই চোখ ছল্ ছল্ !

জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মন
এই মন উন্মন
তন্ময় এই চাঁদ।

এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
কোন্ বায় ফুর ফুর
কোন্ স্বপ্নের পুর !

গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুণ্ রুণ্
বোল্ তার ফিস্ ফিস্
চুল তার মিশ্ মিশ্।
সেই মোর বুল্‌বুল্,—
নাই তার পিঞ্জর,—
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভর।

পাখনায় নাই ফাঁস
মন তার নয় দাস,
নীড় তার মোর বুক,—
এই মোর এই সুখ।
প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য।

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ ?
তার তুল্ কোন্ ফুল ?
বিল্‌কুল্ তুল্ তুল্
টুক্ টুক্ বিল্‌কুল্
এল্-বসরাই গুল্ !
দেল্-রোশনাই-ফুল !

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে মরি কত নির্মোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'

জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
 উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি' ;
উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
 যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা,
চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
 রচিয়া মনের পান্থশালা ;
কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
 গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
 চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি'।
জগৎ হয়েছে হস্তামলক
 জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদের বেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—
 মানস-আভাস জাগিয়া উঠে !
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
 আমরা সবাই নয়ন মাজি,
সেই অমৃতের ধারা পান করি'
 অমেয় শকতি মোদের আজি।
আজি নির্ম্মোক-মোচনের দিন
 নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
 সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।
পরিবর্ত্তন চলে তিলে তিলে
 চলে পলে পলে এমনি ক'রে,

মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে !
গোত্র-দেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,
আর তুই মহাদেশের মানুষে
কোন মহাজন মিলাল শুনি !
আসিছে সে দিন আসিছে সে দিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।
ভোর হ'য়ে এল আর দেরী নাই
ভাঁটা সুরু হ'ল তিমির স্তরে,
জগতের যত তূর্য্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে !
মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।
ভোর হ'য়ে এল ওগো ! আঁখি মেল
পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণা রাতি।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহ রে জয়—

বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।
বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর্-বনেদী
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।
রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা শুধু রাজার ভৃত,
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষেত্রে
বনেদ হয়েছে অমজবুত।
নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু
সকল রথীর সেরা সে রথী।
বঙ্গে ঘরানা কৈবর্ত্তেরা,
বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত্ত রাজার
যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।
এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয় ;
হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
পটু যারা করে গঙ্গাজলী ;
তার চেয়ে ভাল গুহক চাঁড়াল,
তার চেয়ে ভাল বলাই হাঁড়ী,—

যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি,'
ধর্ম্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে
পৈতা তো সিকি পয়সার স্থতা
পারিজাত-মালা তাহার ভালে।
রইদাস মুচি, স্থদীন কসাই,—
গণি শুকদেব-সনক-সাথে,
মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে।
চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
নহে গো এ নহে উপন্যাস।
নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
ডোম আর যুগী হেলার নহে,
মগধের রাজা ডোম্‌নি রায়ের
কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।
মদের তৃষ্ণা শুঁড়িরে গড়েছে
মিছে তারে হায় গণিছ হেয়,
তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী
তা হ'লে সবাই অপাংক্তেয়।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই,
আদিজননীর পুত্র সবে,

মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
জাতির তর্ক কেন গো তবে ?
বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমার,
তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো ;
বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তাম্বূলী, বারুই তুচ্ছ নয় ;
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময় !
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে—লাগিবে দু'দিন পরে,
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকর তার মাল্য জোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
বণিকেরা তারে করিছে ধনী,
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি

জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।
ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
জাতির পাঁতির মালা সে গাঁথিয়া
পরেছে গলায় সগৌরবে।
সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে,
সহজ সবল সরস ঐক্যে
মিলুক মানুষ অবনীতলে।
ডঙ্কা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,
মনে কুণ্ঠার কুষ্ঠ যাদের
তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া।
তুষার গলিয়া ঝোরা দুরন্ত
চলে তুরন্ত অকূল পানে
কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা
দিকে দিগন্তে পাগল গানে;
গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বন্ধুরা আসে
মাতে রে হৃদয় পরাণ মাতে,
গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে
জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে,

সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।
যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,
প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে
এসেছে সহসা গহন রাতে।
পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোনো কল্লোল বন্যাজলে!
জমা হ'য়ে ছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
মানুষে মানুষে নাই যে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়॥

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ—নিশ্বাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুনতে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চল্‌ছে কিবা!

দেখ্‌ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

*   *   *

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্‌-পা নহিস্‌ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুট্‌লে ভারত-নন্দনে;
চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।
শিবানী তুই তুই করালী আলেয়া তোর খর্পরে!
শত্রু-ভীতি জ্বল্‌ছে চিতা তুল্‌ছে ফণা সর্প রে!
বাঘিনী তুই বাঘ-বাহিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জ্বলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জ্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,
ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা অন্তরে তোর রাজধানী!

*   *   *

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চের-পুঞ্জিতে।
তোমার চেলী বুন্‌বে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাতি,

পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনিস্‌সূতার হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ায় ছাতা তোর মাথে।
তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুণ্ডলা,
ইভ-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুন্তলা!
ভাণ্ডারে তোর নাইক চাবী, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে, কে আছে বল্ তোর মত?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার বেথায় থিতিয়ে রয়,
ছুট্‌বে কে পারস্য সাগর? মুক্তা সে তোর ঝিলেই হয়;
ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্‌সা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ।
তুঁষের ভিতর পীযূষ তোমার জম্‌ছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগায় জল-রুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো!
ধূপ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুকে পিঠে দিছিস্ বেড়,
গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সান্ত্রী তোমার গগন-ভেড়।
গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল? নাগাল না পায় কেউ হাতে।
তিস্তা তোমার ঝাপ্টা সীঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক, কর্ণফুলী বাম কানে।
বিশ্ব-বাণীর মৌচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি' গো,—
দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।
নানান্ ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ! তোমার গৌরবে,
ভার্জ্জিল্ এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে।

কহ্লনে তোর শৌর্য্য-বাখান্, বীর্য্য মহাবংশময়,
দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্ত্তি তোমার মৃত্যুঞ্জয়।
যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
জিৎলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে।
শত্রুজয়ের খেল্‌লে গো শত্রুঞ্জ' খেলা উল্লাসে,
কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিণী গৌড়-সেনার জয় ভাষে।

* * *

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি! ছিলে তুমি সুদুর্জ্জয়,
অঞ্জনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয়;
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেক্‌জান্দারী
ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।
তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
তখনো যে কীর্ত্তি খ্যাতি জাগ্‌ছে তোমার আসিংহল,
তখন যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র
সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র।
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।

* * *

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
সাতখানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয়;
রাম যা' স্বয়ং পারেন্ নি গো, তাও যে দেখি করলে সে-
লঙ্কাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্র দণ্ড ধরলে সে।
দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ! মহালক্ষ্মীরূপা! জননী! রাজলক্ষ্মী গো!

'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদ্‌কোষে ;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাক্‌ছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপ্‌ছে "মাভৈঃ" মন্ত্রে গো ;
রাঢ়ের ময়ূরাক্ষী তুমি, বঙ্গে কপোতাক্ষী তুই,
সাপের ভীতি রমার প্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস দুই।

* * *

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
ঘুচিয়ে দেছে চরিতগুণে বেনে নামের অগৌরব ;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠী নামটি কিন্‌লে গো,
সাধু হ'ল উপাধি—যাই সাধুত্বে মন জিন্‌লে গো :
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি, শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত।
কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী, দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা ! শক্তিরূপা ! নও তুমি নও দীনহীনা !

* * *

চৌরাশী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভুটান তিব্বতে,
চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লঙ্ঘি' সাগর পর্ব্বতে ;
হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্ত্তিকা,
সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা।
শিষ্য সেবক ভক্ত এদের হয়নিক লোপ নিঃশেষে,
অনেক দেশের মুগ্ধ চক্ষু নিবদ্ধ সে এই দেশে ;
যেথাই আশা আশার ভাষা জাগ্‌ছে আবার সেইখানে—
ফল্গুতে ফের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে।

জাগছে সুপ্ত জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয়-বটে
কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে।
অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জ্বলে,
অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ব্রিষ্টলে ;
বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা !
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জ্বালিয়ে আঁখির স্থিরশিখা !

মরণ-কাঠি জীয়ন্-কাঠি দেখছি গো তোর হাতেই দুই,—
ভাঙন দিয়ে ভাঙিস্ আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই ;
নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
পলি দিয়ে পল্লী গড়িস ভাঙন-তিমির দাঁত ভাঙা ;
'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহৃদি নাম্‌টি গো,
গতির ভুখে চলিস্ রুখে, বাংলা ! সোনার তুই মৃগ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁক্‌ড়েছিস্,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাক্‌ড়েছিস্।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
চির-যুবন-মন্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিনী,
শিরীষ ফুলে পান্-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী !
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্ নে।

কীর্ত্তিনাশা স্ফূর্ত্তি তোমার, জানিস্ নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্‌রাজিতা কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল চোখ

* * *

কে বলে রে নেই কিছু তোর ? নেইক সাক্ষী গৌরবের ?
কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের ?
চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধজনে দেখবে কি ?
ঊষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেক্‌বে কি ?
যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো।
আছ তুমি, থাক্‌বে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস ;
গরুড়ধ্বজে ঊষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো !
জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
জাগছে জ্ঞানে আলোর পানে মেল্‌ছে পাখা স্বচ্ছন্দে,
জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
আশার স্বসার জাগছে ঊষার স্বর্ণকেশের সৌরভে।
ধাত্রী ! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ !

'বিদায়-আরতি' ঃ

ঝর্ণা

ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা !

অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!
পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!
এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা;
ঝর্ণা!
শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে সুপর্ণা!
ঝর্ণা!
মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে!

মোতিয়া মতির কুঁড়ি মুরছে ও-অলকে ;
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
ঝর্ণা !

'বেলা শেষের গান' ঃ

ছন্দ-হিন্দোল

মেঘ্‌লা থম্‌থম্‌, সূর্য্য-ইন্দু
ডুব্‌ল বাদ্‌লায়, দুল্‌ল সিন্ধু !
হেম্‌-কদম্বে তৃণ-স্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু !

মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন !
দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

গ্রীষ্ম নিঃশেষ। জাগ্‌ছে আশ্বাস !
লাগ্‌ছে গায়—কার গৈবী নিঃশ্বাস !
চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন
ঝর্‌ছে, বিশ্বের ভাস্‌ছে দিশ্‌পাশ !

ভাস্‌ছে বিল খাল্‌ ভাসছে বিল্‌কুল্‌ !
ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌টায় হাস্‌ছে জুঁইফুল !
ধান্য শীষ্‌ তার কর্‌ছে বিস্তার—
তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুল্‌জুল্‌ !

বাজছে শূন্যে অভ্র-কম্বু ;
কাঁপছে অম্বর কাঁপছে অম্বু ;
লক্ষ ঝর্ণায় উঠছে ঝঙ্কার
"ওম্ স্বয়ম্ভু !" "ওম্ স্বয়ম্ভু !"

ঝর্‌ছে ঝর্ঝর্, ঝম্‌ঝম্,
বজ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌গম্,
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিন লোক "বম্ ববম্ বম্" !

'বম ববম্ বম্' শব্দ গম্ভীর !
বৃন্তে ছম্ ছম্ স্তব্ধ জম্বীর !
মেঘ্-মৃদঙ্গে প্রাণ সারঙ্গে
স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন হাম্বীর !

সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল !
ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল !
মূর্চ্ছে বীণ্ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার—
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিন্দোল !

কয়েকটি গান

(১)

(গুজরাটি গর্‌বার সুরে গেয়)

পার্‌ব না একলাটি আজ ঘরে পার্‌ব না রইতে !
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে ছুটো কথা কইতে !

নিরালার কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুন্‌সুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।

(২)

শোন্ সখী! গায় কারা আজ রাতে গুজরাতী গর্‌বা।
খঞ্জন-নর্ত্তন হিল্লোল-গর্ভা।
প্রিয়া গন্ধর্ব্বের হিয়া কন্দর্পের
হার মানে ঠুংরী কাহার্‌বা!
দুনিয়ার আদরের, ফুর্‌তির আতরের—
মনোহারী বেলোয়ারী কার্‌বা!

(৩)

চল্‌ল রে দখিনার হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ!
কোন্ বনে চন্দন, কোন্ বনে গন্ধ!
মল্লিকা উল্লাসে স্বপ্নেরি হাসি হাসে
সৌরভে সাঁতারে আনন্দ!
আন্‌কো কী সুখ-ভরে আকুলি-বিকুলি করে
খুল্‌ছে যে পাপড়িটি বন্ধ!

(৪)

খিল্-খোলা ফর্দ্দাতে যাব চল্, সাধ জেগেছে!
রইবে কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে!
আলো হোথা চুপিচুপি নিয়ে পাউডার-থুপি
ফুল দিয়ে ফুল ঢেকেছে!

দিল-দরিয়ার জলে উথ্‌লিয়ে ঢেউ চলে
নিস্থৃতির বাঁধ ভেঙেছে !

(৫)

খিল এঁটে ঘরে থাক, হোস্‌নে চাঁদের নাটে সঙ্গী !
জান্‌লা ভেজিয়ে দে রে, ও চাঁদ কলঙ্কী !
যে জানে লো রীত্‌ ওর যে জানে চরিত ওর
যাবে না সে মানা মোর লঙ্ঘি' :
সাতাশের ঘর করে সাতালি-বাসর-ঘরে
বাতাসে মাতাল করে রঙ্গী !

(৬)

শুন্‌ব না ! কোনো মানা মান্‌ব না ! জ্ব'লে যায় অঙ্গ !
চাঁদকে চেনেনি, শুধু চিনেছে কলঙ্ক !
আঁধার যে ভুলিয়েছে, পাথার যে দুলিয়েছে,
উথ্‌লিয়ে হৃদয়ে তরঙ্গ,
একা হয়ে একশ' যে—শত তারা যারে ভজে,
ধূলির তবু যে চায় সঙ্গ !

(৭)

জাগ্‌ল রে নিদ্‌-ঘরে পাখী, আজ নারে নিদ্‌ সইতে !
আঁখি হ'ল অনিমেষ আলো-থইথইতে !
শোন্‌ সখী শোন্‌ মুহু কুহু কুহু কুহু কুহু
বুক-ভরা সুখ নারে বইতে !
সে স্বরের মনোহরে জোছনার সরোবরে—
শত তারা এলো জল-সইতে !

(৮)

কোন্ বনে নিরজনে কাজ-ভোলা কার বাঁশী বাজ্‌ল!
হিয়ার গহনে ফুল যৌবনে সাজ্‌ল!
হাওয়া ভুর্‌ভুর্ তাই মহুয়া ফুলের হাই!
রূপহীনে রূপটানে মাজ্‌ল!
মউএর ঝাপটি দিয়ে উলসিয়ে বিলসিয়ে
মানিনীর মান-মণি যাচ্‌ল!

(৯)

কার পাশে কে ও নাচে, কার পানে চেয়ে ও কে হাসে!
উল্লাসে কারা ভাসে অনুভব-রাসে!
যত তারা তত সাধ যত সাধ তত চাঁদ
মণ্ডলে নাচে নীলাকাশে!
যত চাঁদমুখ আছে চাঁদ আছে কাছে কাছে
মনোভব মঞ্জু বিলাসে!

(১০)

আসমানে রাস-লীলা গোপনের যবনিকা টুট্‌ল!
আলোক-লতারে ঘিরে হাসি-মুখ ফুট্‌ল!
স্বপনেরি ঝরোকায় তারা উঁকি দিয়ে চায়,
কাতারে কাতারে তারা জুট্‌ল,
স্মরণ সরণি 'পরে ফুল ফোটে থরে থরে,
পুলকে আঁখির ধারা ছুট্‌ল।

(১১)

লজ্জিত আঁখি নত অনুখন সঞ্চরে তারা!
উন্মদ মধুকর গুঞ্জন-হারা!
মৌন মুরতি ধ'রে মৌনে আরতি করে
স্বপন-রভস মাতুয়ারা!
মনোহর!—হরে মন—অবচন নিবেদন
বরিষণ চন্দন-ধারা!

(১২)

চন্দ্রের চিত্ত ভরি কে গো আজ কে গো তুমি, চিত্রা!
চোখে চোখ! কি পুলক! পুষ্প-পবিত্রা!
পরিচয় চাউনিতে জোছনার ছাউনীতে
সুন্দরী! সুদূর-সুমিত্রা!
তুহুঁ চির দূরে দূরে আঁখি থির, মন ঝুরে,
জাগরণ সাগর-বহিত্রা!

(১৩)

কী ফুল ফোটায় হায় দুনিয়ায় চোখের চাওয়া!
চোখের চাওয়ায় কত হারানো, পাওয়া!
চোখে চোখে দেয়া নেয়া চোখে পাড়ি চোখে খেয়া
চাহনিতে চৈতী হাওয়া!
চাহনির উড়ো পাখী মন হরে দিয়ে ফাঁকি!
চোখে-চেয়ে চামেলী-ছাওয়া!

(১৪)

মন হরে অজানার নয়নের-অচেনা চোরে !
কে কারে কখন্ বাঁধে কিসের ডোরে !
ভ্রমর আঁখির মেলা ! ভালোবাসা-বাসি খেলা
চোখে চোখে আরতি ক'রে !
নয়নে নাগর-দোলা এই ফ্যালা এই তোলা
ঢেউ-বাওয়া জনম ভ'রে !

(১৫)

অম্বরে জাগে চাঁদ তারকার ফুল-শেষে রাত-ভোর !
কি কথা বলিতে চায় ঘুম হারা ঘুম-চোর !
গগনের নিরালায় মন কোথা ভেসে যায়
জোছনায় মাখা আঁখি-লোর !
তারকার রূপ-শিখা মরতের মল্লিকা
কারে বেশী চায় মন ওর !

(১৬)

আকাশ-কুসুম চাষ করে চাঁদ তারার ক্ষেতে !
পাগল সে, আছে শুনি ওতেই মেতে !
খুঁজে খুঁজে হাসি-মুখ ভ'রে শুধু রাখে বুক
আলোকেরি মালিকা গেঁথে !
যুগে যুগে নিশি জাগে রূপের নিছনি মাগে
নাহি জানি কি ধন পেতে !

(১৭)

চাঁদমুখে আছে ভ'রে, বলে চাঁদ, হৃদয়ের আয়না !
ভালবাসা ভালোবাসি আর কিছু চাই না !
আকাশ-কুসুম বনে তাই ফিরি আনমনে,
কাজের বাটে তো মন ধায় না !
আঁখি দিয়ে পিয়ে সুধা মিটাইব হিয়ার ক্ষুধা
ধনের মানের নেই বায়না ।

(১৮)

চাই কারে জানি না রে আমি শুধু ফিরি স্বপনে !
ভালোবাসা ভালোবাসি, মন, গোপনে !
আকাশ-কুসুম তুলি কুমুদের ফুলে বুলি,
দিক্ ভুলি, ফিরি ভুবনে !
জোছনার জাল পেতে জোনাকীর হার গেঁথে
কার ছবি জপি গো মনে !

(১৯)

নিশি নিশি জাগো চাঁদ ! নিরালায় নিতি নিরখি !
হারানো ছবির মালা জপ কর কি ?
কত আঁখি কত যুগে কত দুখে কত সুখে !
আঁখি তব গেছে পুলকি,'
ছাই হ'য়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা,
একাকী তাদের স্মর কি ?

(২০)

কার কথা কবেকার কার কানে দিলে আজ পৌঁছে !
আলুথালু হল চাঁদ ঢুলুঢুলু মৌজে !
জোনাকী সে জোছনায় মোহ পায় মুরছায়
পারুলী-পিয়ালফুলী কৌচে !
হাওয়া ডোবে বিহ্বলে কিরণের থির জলে
অবগাহি' বাদ্‌শাহী হৌজে !

(২১)

কার হাসি কার ঠোঁটে কার ভোলা দিঠি কার চক্ষে !
স্বপনের রাসলীলা মরমের কক্ষে !
কার "কথা কও" স্বরে মন কে উদাস করে
ইসারায় বলে কি অলক্ষ্যে !
মন করে চিনি চিনি হৃদয়ের স্বদেশিনী
বসতি বা ছিল এই বক্ষে !

(২২)

কে সে ভরেছিল মন, মনে পড়ে তারে ? সেই ভরণী ?
বিরহিণী যে রোহিণী নিয়েছিল ধরণী ?
কোথা রে চাঁদের রাধা কোথা সেই অনুরাধা ?
শ্রবণা শ্রবণ-মন-হরণী ?
কোথা অতীতের সাথী মুক্ত-হাসিনী স্বাতী ?
স্বপন-গাঙে কি বায় তরণী ?

(২৩)

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্টা সে অশ্বিনী হায় রে ?
আর্দ্রহৃদয়া হায় আর্দ্রা কোথায় রে ?
ভদ্রা দু'বোন তারা কোন্ মেঘে হ'ল হারা ?
কে বাঁধিল মৃগ-নয়নায় রে ?
ফল্গু-প্রেমের সোঁতা ফল্গুনী গেল কোথা ?
বিশাখা কি নীহারিকা-ছায় রে ?

(২৪)

চৈত্রী এ জোছনায় এ কি হায় কুয়াশার কান্না !
কান্নার হাহা হাওয়া, গান না রে গান না !
আকাশের পরকোলা কাদের নিশাসে ঘোলা ?
তারালোকে খোলা যত জাল্না !
ভরা নয়নের কোলে মুকুতার মুখ দোলে,
ঠোঁটে চুনি, চুলে তার পান্না !

(২৫)

কর্পূরে ফাগ ক'রে জ্যোৎস্নাতে চাঁদ হোলি খেল্ছে !
কর্পূরী কুঙ্কুম ফুলে ফুলে ফেল্ছে !
হিল্লোলি' উল্লাসে মাতি অনুভব-রাসে
মল্লিকা হাসি হেনে হেল্ছে !
ডুবে-যাওয়া রূপ কত তারা-ফুলে অবিরত
হীরার লাবণি—মণি মেল্ছে !

(২৬)

রং বিনা দোল খেলা, প্রাণে স্রেফ্ জোছনারি রঞ্জন!
স্মৃতির মূরতি-হারে রাস রমে কোন্ জন!
আজ পরাণের পুটে সরোজ-কুমুদ ফুটে—
একসাথে রস ভুঞ্জন!
আকাশে ঝরোকা খোলা, তারা আঁকে, পথ-ভোলা—
স্বপনেরি চোখে অঞ্জন!

(২৭)

প্রেম মানে প্রাণ পাওয়া, প্রাণে মরা প্রেম-হারাণো ;
এই ধারা দুনিয়ার মানো না-মানো।
নিশি নিশি অনিবার— মরে বাঁচে বারে বার—
তাই চাঁদ ; জানো না জানো!
ভালোবাসা-রং-ছুট্ ফুল হয় ধূলো মুঠ,
প্রেমে ফিরে পায় পরাণ ও!

(২৮)

ম'রে গিয়েছিলে চাঁদ! বেঁচে ফিরে, ফিরে এয়েছ!
আঁখির আলোতে কার প্রাণ পেয়েছ!
কোন্ পুণ্যের বলে এমন নতুন হ'লে,
কোন্ গাঙে তুমি নেয়েছে!
কোন্ সুধা পিয়ে এলে, কোন্ আশা নিয়ে এলে!
রূপে ত্রিভুবন ছেয়েছ!

(২৯)

ফুটে ঝ'রে ফোটে ফুল বারেবার আকুল বনে !
কত মরা কত বাঁচা একই জীবনে !
কত না বিরতি-রতি পীরিতির গতায়তি
হাসা-কাঁদা মন-গোপনে !
মলয়া মরুর হাওয়া কত করে আসা-যাওয়া
চাঁদেরও সাধের স্বপনে !

(৩০)

ঝঙ্কারে রিম্‌ঝিম্ ঝিঁঝি গায়, আজ না রে আজ না !
তবু ভরি' মরি মরি নূপুরেরি বাজনা !
আজ নয় আজ নয় আজ কোন কাজ নয়,—
অপরূপ ! ভোর না, এ সাঁঝ না !
যে দূরে, যে আছে কাছে সবারি হৃদয় যাচে
জোছনায় অলখেরি সাজনা !

পৃ. ৫ পাদটীকা :—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র লিখিয়াছেন ('প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩২৯):—"পিতৃদেবের প্রবন্ধে জন্ম তারিখ ২৯ মাঘ লিখিত আছে; উহা ছাপার ভুল। কোষ্ঠিপত্রের সহিত মিলাইয়া দেখা হইল, জন্ম তারিখ ৩০শে মাঘ শনিবার ১২৮৮।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬৪

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১৮৬১—১৯৩০

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

আত্মকথা

"জেলা নদীয়া থানা নওয়াপাড়ার অধীন সিমলা গ্রামে ইংরাজী ১৮৬১ সালের ১লা মাঘ* [মার্চ] শুক্রবার অপরাহ্ণে আমি জন্মগ্রহণ করি। প্রসবান্তে আমার মাতা আমাকে মৃত বলিয়া ত্যাগ করেন। পোড়াদহর সন্নিকট মীরপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট একটা পুরাতন কুঠী দেখিতে পাওয়া যায়। এই কুঠীর সাহেবদের এক বিলাতী ধাত্রী ছিলেন। তিনি নানারূপ প্রক্রিয়াদ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত করেন।

আমার পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়। মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। আমরা বারেন্দ্রশ্রেণীর রোহিলা পটির কুলীন। রাজসাহীর বৈদ্যনাথ বাগচী নামে একজন প্রধান লোক ছিলেন। সংস্কৃত এবং পারসী ভাষায় তাঁহার সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। আমার মাতা তাঁহারই কন্যা। আমরা রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামের মৈত্রেয় বংশ। আমাদের মধ্যে কামদেব মৈত্রেয় ফরিদপুর জেলার নিকটবর্ত্তী মেঘনা গ্রামের জমিদার-বংশে বিবাহ করেন। সেই হইতে রাজসাহীর বাসস্থলী পরিত্যক্ত হয়। ফরিদপুর জেলায় রুক্মিণী গ্রামে কামদেবের বংশধরগণ বাস করিতে আরম্ভ করেন। পিতামহ গোপীকৃষ্ণ চট্টগ্রামে ওকালতী

* "মাঘ" মুদ্রাকরপ্রমাদ—"মার্চ" হইবে। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বিবরণ)' পুস্তকে অক্ষয়কুমারের লিখিত নিজ বংশ-পরিচয় দ্রষ্টব্য। 'বিশ্বকোষ', 'মহাকোষ' প্রভৃতিতে ভুলক্রমে অক্ষয়কুমারের জন্মতারিখ "১লা মাঘ ১২৬৮" (ইং ১৮৬২) বলা হইয়াছে।

করিতেন। পিতামহ উমাকান্ত কোন বিষয়কর্ম্ম করিতেন না। তিনি তিন বিবাহ করেন। মথুরানাথ তাঁহার প্রথম পক্ষের সন্তান। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যে রুক্মিণী গ্রাম হইতে পিতামহী পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহার পিত্রালয় কুমারখালি গ্রামে পলায়ন করেন। সেই হইতে আমরা কুমারখালিতে আসি। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও আমার পিতা মথুরানাথ বাল্য-সুহৃদ্ এবং কুমারখালির অধিকাংশ উন্নতির মূল। নীল-বিদ্রোহের সময়ে এই দুই জনের নিকট হইতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 'প্রভাকর'-সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—মফস্বলের অনেক সংবাদ পাইতেন।

এই সময় মথুরানাথ কুমারখালি ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তখন হরিনাথ, মথুরানাথ এবং তাঁহাদের সমবয়স্ক কুমারখালির যুবকগণ অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা পাঠ করিতেন। এবং তাঁহাকে আদর্শ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্য তাঁহারা একটি বঙ্গবিদ্যালয় এবং একটি বালিকা-বিদ্যালয় কুমারখালিতে স্থাপিত করেন। হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত' গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর, 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সূচনা হয়।

এই সকল বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে মথুরানাথের প্রথম সন্তান আমি। আমি ইহাদের সকলের স্নেহের পাত্র হই। "এই বালক বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি করে, এইরূপ শিক্ষাই ইহাকে দিতে হইবে," এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম স্মরণে আমার নামও অক্ষয়কুমার রাখা হয়। হরিনাথই আমার এই নামকরণ করেন এবং তিনিই আমার সাহিত্য-পথের গুরু।

আমার জন্মের পর পিতা ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য রাজসাহী গমন করেন। সে বৎসর পরীক্ষা গৃহীত হয় না। পিতা রাজসাহীতে

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া রাজসাহীবাসী হন। গত অর্দ্ধোদয়ের পূর্ব্ব অর্দ্ধোদয় যোগের সময় আমি রাজসাহীতে নীত হই।

বাল্যকালে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি কখন কুমারখালিতে কখন বা রাজসাহীতে থাকিতাম। হরিনাথের বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত জলধর সেন এবং আমি এক সঙ্গে বিদ্যারম্ভ করি। আমরা তিন জনেই হরিনাথের নিকট বিদ্যা ও রচনা শিক্ষার উপদেশ পাইয়াছি।

১৮৭১ সালে বোয়ালিয়া-গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে আমার ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ। ১৮৭৪ সাল হইতে সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, পণ্ডিত শিবচন্দ্রের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশের নিকট, আর রামকুমার বিদ্যারত্নের (স্বামী রামানন্দ ভারতী) নিকট এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করি।...

১৮৭৮ সালে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজসাহী বিভাগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হই এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে পনর টাকার বৃত্তি পাই। তখন বোয়ালিয়া-গবর্ণমেণ্ট-স্কুল রাজসাহী কলেজে পরিণত হইয়াছে। ঐ কলেজে এফ-এ পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া, গবর্ণমেণ্ট হইতে কুড়ি টাকা বৃত্তি পাই। এই সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দ-নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা হৃদ্‌কমল দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, কলেজে রসায়ন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠ সমাপ্ত করি। অধ্যয়নশ্রমে ক্রমে অসুস্থ হইতেছি বলিয়া, পিতা আমাকে এম-এ পরীক্ষা হইতে নিরস্ত করিয়া, ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠার্থ রাজসাহীতে লইয়া যান। রাজসাহী কলেজ হইতে

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া,* ১৮৮৫ সাল হইতে রাজসাহীতে ওকালতী করিতেছি। শৈশবে যে পাঠানুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমে বাল্যকাল হইতেই বিকশিত হইয়াছে।

প্রথম আমি কবিতা লিখি; বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ের প্রচলিত বিবরণ যে সর্ব্বথা কাল্পনিক, এই ধারণায় 'বঙ্গবিজয়' নামে আমি প্রথম কাব্য লিখি। ঐ গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। গৃহদাহে অপ্রকাশিত বাল্য-রচনা পুড়িয়া গিয়াছে। বাল্যকালের অনেকগুলি রচনা রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড লিটন প্রেস এক্ট পাস করায় বৃদ্ধ হরিনাথকে অবসর দিয়া, আমি, জলধর ও প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক হরিনাথের জনৈক ছাত্র 'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি। এই কালের মধ্যে স্বদেশের নানা ঐতিহাসিক বিবরণ ঐতিহাসিক চিত্র নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার কল্পনা করি। বঙ্গাব্দ ১২৯০ সনে 'সমর সিংহ' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করি। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে অতি অল্প সময়েই বিক্রীত হইয়া যায়। ইহার লভ্য জাতীয় ধনভাণ্ডারে উৎসর্গীকৃত হয়। এফ-এ পড়িবার সময়ে মেকলের ক্লাইব এবং হেষ্টিংসের গ্রন্থ আমাদের পাঠ্য ছিল। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাউডিং সাহেবের সহিত প্রত্যহ আমার বচসা হইত। মেকলের

* বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হইতে জানা যায়, অক্ষয়কুমার ১৮৭৮ সনে বোয়ালিয়া স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স, ১৮৮০ সনে রাজসাহী কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ, ১৮৮৩ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তৃতীয় বিভাগে বি-এ, এবং ১৮৮৫ সনে রাজসাহী কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে বি-এল পাস করেন।

বর্ণনা যে প্রকৃত নহে, তাহা সাহেবকে বুঝাইবার জন্য আমি নানা প্রমাণের অনুসন্ধান করিতাম। এই অনুসন্ধানকার্য্য দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়। তদুপলক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাসের আমি বহু বিবরণ সংগ্রহ করি, তদবলম্বনে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে উপদেশ দান করেন। ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই বলিয়া, রাণী ভবানীর জীবনচরিত উপলক্ষ করিয়া, ঐ সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করি। কতকগুলি বিশেষ ঘটনায় "রাণী ভবানী" প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়, "সিরাজ-উদ্দৌলার" ঐতিহাসিক চিত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রেরিত হয়। কিয়দংশ প্রকাশিত হইবার পর 'সাধনা' বন্ধ হইয়া যায়। "সিরাজ-উদ্দৌলার" অবশিষ্টাংশ 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'সাহিত্যে' সীতারামের ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে 'সাহিত্যে' রাণী ভবানীর প্রথমাংশ ও 'ভারতী'তে "মীরকাসিম" সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। মীরকাসিমের কিয়দংশ মীরজাফর নামে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলে, তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রস্তাবে, 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করি। ঐ পত্র এক বৎসরের অধিক চলে নাই।

বড়লাট লর্ড কর্জ্জন যখন গৌড় দেখিতে যান, তখন তিনি হিন্দুদের সময়ে গৌড় কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর অনুরোধে লর্ড কর্জ্জনের পাঠের জন্য আমি *Gauda, under the Hindus* [Rajshahi, 20 Feb. 1902, pp. 24] নামক এক ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা করি। এ গ্রন্থ কেবল বিতরণার্থ মুদ্রিত হয়। আমি এশিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর,

এবং এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে আমি লক্ষ্মণ সেনের তাম্রলিপি প্রকাশ করিয়াছি।

বাল্যকাল হইতে স্বদেশ-হিতের জন্য নানারূপ সভা-সমিতির সহিত আমার যোগ ছিল।* আমি রাজসাহী ছাত্র-সভা, কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন নামক ছাত্রসভা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং রাজসাহী এসোসিয়েশনের সভ্য। সাত বৎসর কাল রাজসাহী এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলাম। রাজসাহীর মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যরূপে দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছি। আমি কখন নির্ব্বাচক হইবার জন্য প্রার্থী হই নাই। প্রতি বারই গবর্ণমেণ্ট আমায় মনোনীত করিয়াছেন।"

'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে ১৩১১ সালে (ইং ১৯০৪) প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে এই আত্মকথা স্থান পাইয়াছে। ইহার সহিত 'বঙ্গভাষার লেখক'-সম্পাদক অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা এই :—

"ডায়মণ্ড জুবিলির সময়ে (১৩০৪ সাল) বক্তৃতায় বত্রিশ হাজার টাকা উঠে। এই টাকায় রেশম-শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ইনি পাঁচ

* ১৮৯০ সনে অক্ষয়কুমার 'শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি'র সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সমিতি "শিক্ষা-পরিচর্য্যা এবং জাতীয় সাহিত্য-বিস্তার প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যে স্থাপিত" হয়। ১২৯৭ সালের পৌষ-সংখ্যা 'শিক্ষা-পরিচয়' পত্রে প্রকাশ : "পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন শিক্ষা-পরিচয়ের পরিচালন এবং উন্নতি-বিধানে সম্পাদককে [শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ] সাহায্য করিবার জন্য এখন হইতে কয়েক জন কৃতবিদ্য হিতৈষী বন্ধু সমবেত হইয়া শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন।... শিক্ষা-পরিচয়-সমিতির অধিবেশন-স্থান বোয়ালিয়া, রাজসাহী. বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি-এল।"

বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কলিকাতায় যে-বার কংগ্রেসের অধিবেশন হয় [ইং ১৯০১], সে-বার ইনি স্বয়ং বহু লোকের সমক্ষে প্রদর্শনীতে রেশম-শিল্পের নানা অঙ্গের প্রদর্শন করেন।

রাজসাহীতে সংস্কৃত নাটক—যথা শকুন্তলা, বেণীসংহার প্রভৃতির অভিনয়ের ইনি সূত্রপাত করেন। ইহাঁর উদ্যোগে রাজসাহীতে যে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়, তাহা দেখিয়া পরলোকগত ছোট লাট বাহাদুর পরম প্রীতি লাভ করেন। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত,—যথা মদনগোপাল গোস্বামী, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, বর্দ্ধমান-রাজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হরিনাথ বেদান্তবাগীশ,—এই অভিনয় দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক-নিবদ্ধ অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন।

ক্রিকেট-খেলা এবং চিত্রাঙ্কনে ইনি সুপটু। রেশম-শিল্পের সকল বিষয়েই ইনি অভিজ্ঞ। প্রত্যহ স্নানের পর ইনি মাতৃ-প্রণাম না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। গবর্ণমেণ্ট দুইটি বিষয়ে ইহাঁর প্রতি সুবিবেচনা করিয়াছেন। বে-সরকারী বহু লোকে গবর্ণমেণ্টের জন্য খাটিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই সরকারী রিপোর্টে তাঁহাদের সুস্পষ্ট নামোল্লেখ করেন না। কিন্তু ইনি রেশম-শিল্প সম্বন্ধে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় রিপোর্টে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় ইনি তুল্যরূপ ব্যুৎপন্ন।”

১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ‘জন্মভূমি’তে প্রকাশিত “বাঙ্গালা ভাষার লেখক” প্রবন্ধে অক্ষয়কুমারের স্বলিখিত আর একটি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে ; উহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

“নদীয়া জেলায় মীরপুর রেলষ্টেশনের সংলগ্ন সিমলা গ্রামে ১৮৬১। ১লা মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ণে আমার জন্ম হয়।·· ১৮৬২ সালের পর হইতে মথুরানাথ রাজসাহী প্রবাসী হন ;···অতি অল্প বয়সেই

বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও মাসিক-পত্রের সহিত সংযুক্ত হই। বাল্য-কালে কবিতা রচনা করিতাম। লর্ড লিটনের অত্যাচারে বাঙ্গালা সংবাদপত্র বিপর্য্যস্ত হইলে,—বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, দরিদ্র হরিনাথকে অবসর দিয়া, আমি আর জলধর বন্ধুবান্ধবদিগের সহায়তায় 'গ্রামবার্ত্তা'র কার্য্যভার গ্রহণ করি। আমার প্রথম গদ্য প্রবন্ধ হরিনাথের তাড়না-প্রসূত ;—তাহা ফরাশি-বিপ্লবের ইতিহাস। ইতিহাসের প্রতি, পিতার ন্যায় আমারও কেমন আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, অবসর পাইলেই ইতিহাস পড়িতাম ; কেহ প্রবন্ধ লিখিবার জন্য তাড়না করিলেও তাহাই লিখিতাম। জাতীয় ধন ভাণ্ডারে সাহায্যার্থ ১৮৮৪ সালে 'সমর সিংহ' নামক আমার বাল্যসংকল্পানুযায়ী প্রথম ঐতিহাসিক চিত্র মুদ্রিত হয়, তাহা আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইবার পর ধর্ম্মবন্ধু, শিক্ষা-পরিচর, সাধনা, ভারতী, সাহিত্যে লিখিয়াছি, ও লিখিতেছি।"

'ঐতিহাসিক চিত্র' সম্পাদন

১৩০৫ সালে রাজসাহী হইতে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশের সঙ্কল্প অক্ষয়কুমারের মনে উদিত হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাবনাপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তৎ-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রে ("প্রসঙ্গ কথা," ভাদ্র ১৩০৫) এই প্রস্তাবনাপত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই সহায়তায় এবং তাঁহারই প্রস্তাবে 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র জন্ম হয়। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"জানুয়ারি ১৮৯৯" (পৌষ ১৩০৫)। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের "সূচনা" লিখিয়া দিয়াছিলেন ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র

১৩৫৩ দ্রষ্টব্য)। "সম্পাদকের নিবেদনে" অক্ষয়কুমার পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষবিষয়ক উপদেশযুক্ত পূর্ব্ববৃত্ত কথার নাম ইতিহাস,—ইহাই অস্মদ্দেশের প্রাচীন সংস্কার। তদনুসারে রামায়ণ মহাভারত কাব্য হইলেও ইতিহাস-মধ্যে পরিগণিত। তদ্রূপ—সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত কীর্ত্তনের জন্য যে সকল পুরাণ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও ইতিহাস। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে যে কেবল বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তই বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে;—পুরাণবক্তাকে সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে কথা আরম্ভ করিতে হইয়াছে; যে যুগের সংবাদ মানবজ্ঞানের অনধিগম্য, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া পদে পদে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পরবর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলী নানা সময়ে নানারূপ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদি সংযোগ করায় এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি ইহাতে যে আমাদের ইতিহাসের উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

সকল দেশেই আদিযুগের ইতিহাস যেরূপ নিরতিশয় অন্ধতমসাচ্ছন্ন, আমাদের দেশেও তাহাই। আমাদের ইতিহাসের "আদি যুগ" "বৈদিক যুগ" এবং "পৌরাণিক যুগ" নামে অধুনাতন পণ্ডিতসমাজে পরিচিত। তাহার ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস সংকলন করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিবার উপায় না থাকিলেও, তৎসাময়িক আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস সংকলন করা একেবারে অসম্ভব নহে। তজ্জন্য

বেদাদি প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র এবং পুরাণাদি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী পুস্তকাবলীর কালনির্ণয় করা আবশ্যক।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সকলের শীর্ষস্থানীয়। তিনি শীর্ণশরীরে জীর্ণস্বাস্থ্যে বহু দিবসের অধ্যবসায়বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজের যুক্তি-তর্কের সমালোচনা করিয়া যে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইতিহাসানুরাগের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি যেরূপ স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত অনুসন্ধান-পদ্ধতির অবতারণা করিয়াছিলেন,—বাঙ্গালী না হইলে অথবা উপেক্ষিত বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা না করিলে,—তাহাতেই তাঁহার নাম পাশ্চাত্য-সমাজে চিরস্মরণীয় হইত।

আর্য্যসভ্যতা কত পুরাতন নিঃসংশয়ে তাহার কালনির্দ্দেশ করা যায় না। আর্য্যসাহিত্যের ধ্বংসাবশিষ্ট পুস্তকাবলী যে বহু পুরাতন, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু প্রাচীন হইলেও এই সকল গ্রন্থের সকল অংশ তুল্যরূপ প্রাচীন নহে;—কালসহকারে অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাবলী তন্মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রক্ষিপ্তাপবাদ অধুনা নূতন আবিষ্কৃত হয় নাই। রামানুজকৃত রামায়ণের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার এবং তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণের সময়েও রামায়ণের বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্তাপবাদে অনাদৃত হইত। এই সকল গ্রন্থের কোন্ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্তদোষদুষ্ট এবং কোন্ কোন্ অংশ যথার্থই প্রাচীন, তাহার নির্ণয় করিতে না পারিলে ইতিহাসের উপকরণের সন্ধান লাভ করিলেও উপকারলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে তথ্যনির্ণয়ের উৎকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উদাহরণচ্ছলে যে দুই চারিটি কথার উল্লেখ

করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়া রহিয়াছে ; আমরা এ পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থের সমগ্র প্রক্ষিপ্তাংশের নির্ণয় করিবার আয়োজন করি নাই। ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

আর্য্যাধিকৃত ভারত-সাম্রাজ্যে যে বৌদ্ধযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে ভারতেতিহাসের গৌরবের যুগ বলিয়া পরিচিত। তাহার আদ্যন্তের ইতিহাস বহু ভাষায় সঙ্কলিত হইতেছে। এই যুগে এশিয়া খণ্ডের অধিকাংশ সভ্য জনপদ ভারতবর্ষের পাদমূলে শিষ্যরূপে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভারতবৃত্তান্ত সংকলন করিয়াছিল। এই যুগে গ্রীক জাতির সহিত ভারতবাসীর প্রথম পরিচয় ; এই যুগে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ জলে স্থলে দ্বীপে উপদ্বীপে নানা দিগ্দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বহির্গত ; এই যুগে ভূমধ্যসাগর-তীরস্থ সিরিয়ারাজ্য হইতে পূর্ব্বোপসাগরমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বৌদ্ধমন্ত্র বিঘোষিত ; এই যুগে তিব্বত ব্রহ্ম শ্যাম সিংহল মহাচীন প্রভৃতি অনার্য্যজনপদের ধর্ম্মাচার্য্যগণ শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে সমাগত ; এবং এই যুগে দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত ও অহিংসা পরমোধর্ম্মের বিশ্বপ্রেমমহিমা স্তম্ভগাত্রে সযত্নে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ইহার অবসানে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে পুনরায় অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালেও আরব্য বণিগ্বর্গ ভারতবৃত্তান্ত সংকলন করিতে যত্নশীল ছিলেন ;—নবোদ্গত মোসলমান-সাম্রাজ্যেশ্বর বোগদাদাধিপতির আগ্রহে ভারতবর্ষীয় বহু শাস্ত্র অনুবাদিত হইয়া এশিয়া হইতে আফ্রিকা এবং তথা হইতে ইউরোপে নীত হইয়াছিল।

পরাক্রান্ত মোসলমান-সেনা ভারতসীমান্তে সমুপস্থিত হইলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বহু বৎসর বাহুবলের পরীক্ষা হইয়াছিল। সে পরীক্ষায়

কত বীর সন্তান অকাতরে আত্মোৎসর্গ করিবার পর মোসলমান-সেনা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, মোসলমানের ইতিহাসে এবং চাঁদ কবির অপূর্ব্ব সমর-কবিতায় তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মোসলমানেরা যেখানে গিয়াছেন, সযত্নে সে দেশের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বেরও কিছু কিছু লুপ্তোদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য না হইলেও আমাদের ইতিহাসের বিশিষ্ট উপকরণ। অতঃপর ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ানগণ এদেশে উপনীত হইয়া নানা ভাষায় যে সকল ভারতবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছেন, তাহার স্রোত অদ্যাপি রুদ্ধ হয় নাই।

আমাদের ইতিহাস নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের ইতিহাস-সংকলনের উপকরণেরও অভাব নাই। স্বদেশীয় গ্রন্থাদির ইতিহাসাংশের নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিলে, বিদেশীয় লেখকবর্গের ভারতবিবরণীর সমুচিত সমালোচনা করিয়া তাহা হইতে সত্যোদ্ধার করিতে পারিলে, এখনও আমাদের ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে।

তাহা বহুজনসাপেক্ষ বহুব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যাঁহারা ললাটকলঙ্ক অপসারিত করিয়া সভ্যসমাজে মানব পদবীতে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের ব্যাকুলতা যদি আন্তরিক হয়, তবে এই কঠিন ব্যাপার একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বৌদ্ধযুগ হইতে ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা করিলে তাহাও সামান্য হইবে না। তাহাও দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের কথা। এত দিনের কথাই বা কত দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়?

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সহস্রাধিক বৎসর নানা দিগ্দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সংকলিত ভারতবিবরণীর অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মেগাস্থিনীস্, এরিয়ান এবং টলেমীর গ্রন্থাদির কিয়দংশ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাচীন সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ শ্রমণগণের সংকলিত ভারতবিবরণী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে কেবল ফাহিয়ান্ এবং হিয়ঙ্গথসঙ্গের নামই সাধারণ্যে সুপরিচিত ; কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও কত পণ্ডিত এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণ অপ্রাপ্ত নহে। ইহাদের একখানি গ্রন্থও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই!

বাণিজ্যোপলক্ষে পূর্ব্বোপসাগরে যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতি অনার্য্য-নিবাসে যে সকল আর্য্যোপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তত্তৎস্থানে অদ্যাপি কত গ্রন্থে ভারতবিবরণী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহার সারাংশমাত্রও স্থান লাভ করে নাই!

কত পুরাতন তাম্রফলকলিপি, প্রস্তরফলক-লিপি এবং স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইতেছে ; তাহাতে হিন্দুর কথা, অহিন্দুর কথা, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কথা, বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশের কথা,—কত ঐতিহাসিক কথাই প্রকাশিত হইতেছে! কিন্তু তাহা বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করে নাই।

ভারতবর্ষের গ্রামে নগরে তীর্থক্ষেত্রে পর্ব্বতগাত্রে এখনও যে সকল দেবমন্দির জীর্ণকলেবরে ধ্বংসকালের প্রতীক্ষায় নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, কে বা তাহার ফলকলিপি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনার্থ গ্রন্থরচনা করিয়াছেন? অথচ আমাদের ইতিহাস নাই বলিয়া গদ্যে পদ্যে কবিতায় উপন্যাসে সংবাদপত্রে সাময়িক সাহিত্যে কে না আক্ষেপোক্তি করিয়া থাকেন?

পুরাতন রাজবংশের এবং জমিদারবংশের কত পুরাতন কাগজপত্র নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে, কখন বা স্থানাভাবে আবর্জ্জনারাশির সহিত অনাদরে অনলসাৎ হইতেছে, কে তাহার প্রতিলিপি রক্ষার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতেছেন ?

ইতিহাসের উপকরণ এখনও সংকলিত হয় নাই, তদর্থে যথাযোগ্য আয়োজনও আরব্ধ হয় নাই ;—অথচ শিশুপাঠ্য ইতিহাস রচনার বিরাম নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহাতে এক শ্রেণীর গ্রন্থ-বিশেষের ছায়ামাত্রই পুনঃ পুনঃ অঙ্কিত হইতেছে। তাহাতে কত ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদ অস্মদ্দেশের বালকবালিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিতেছে! তাহারা যাহা বহু যত্নে বহু ক্লেশে কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করিতেছে, তাহার চরম ফল—আত্মাবমাননা! বাঙ্গলার ইতিহাসেই ইহা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইতেছে।

এই দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এক সময়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—"সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয় ; কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড় তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই!"

অধিক উদাহরণের উল্লেখ না করিয়া বলা যাইতে পারে,—যে দেশের শিল্পগৌরবে গ্রীস, রোম, মিশর, কার্থেজ বিস্ময়াপন্ন হইত, যাহাদের বাণিজ্যপোত দ্বীপে উপদ্বীপে নিকটে এবং সুদূরে আর্য্যগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিত ; যাহাদের বাহুবল এক সময়ে কাশী, কান্যকুব্জে, উৎকলে সমুদ্র-

সৈকতে বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল, যাহাদের সহিত বহু বৎসর রণশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াও বাহুবলোন্মত্ত পাঠানসেনা সমগ্র দেশ পদানত করিতে পারে নাই, বরং সুযোগ পাইবামাত্র কংস রাজা মোসলমানের সিংহাসনে আরোহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; যাহারা অদ্যাপি জ্ঞানগৌরবে কাহারও নিকট হীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না; তাহাদের ইতিহাস নাই, ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর লজ্জার কথা আর কোথায়?

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই লজ্জা দূর করিবার জন্য বঙ্গসাহিত্য-সমাজে কিয়ৎপরিমাণে হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পরিচয় 'বঙ্গদর্শনে' এইরূপ লিখিত আছে, "এক্ষণে বাঙ্গালীর ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমতাবান বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর একে একে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন—"এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গলার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই সকল কথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একজনের চেষ্টায় এ অভাব কদাচ দূর হইতে পারে না। যতই প্রতিভাশালী হউন, কেহ যে উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া ইতিহাস সংকলন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? যে দেশের ইতিহাসের উপকরণ বহু ভাষায় লিখিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও কালক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে, সে দেশের কোনও একজন ব্যক্তি সমস্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। পারেন না বলিয়াই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কথা উঠিয়াও, অদ্যাপি ইতিহাস সংকলিত হয় নাই; এত দিনের সাহিত্যশ্রম বিষয়ান্তরেই সমধিকরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। অনুরাগের অভাব ছিল না, প্রতিভারও অভাব ছিল না; কেবল উপকরণগুলি অনায়াসলভ্য ছিল না বলিয়াই পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা না করিলে অতীতে যাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে,—কখন কখন ইতিহাস-রচনার জন্য উদ্বেগ অনুভূত হইবে এবং প্রতিভাশালী লেখকবর্গ হয় সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিবেন, না হয় "মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিতে" বাধ্য হইবেন!···

বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক চিত্র কোন ব্যক্তি, বংশ বা সম্প্রদায়-বিশেষের মুখপত্র হইবে না। ইহা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনের জন্যই যথাসাধ্য যত্ন করিবে। সে উপকরণের কিয়দংশ যে সকল পুরাতন রাজবংশে

ও জমিদার-বংশেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাঁহাদের সহিত এদেশের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের কথারও আলোচনা করিতে হইবে। যাঁহারা আধুনিক রাজা বা জমিদার, তাঁহাদের কথা নানা কারণে ভবিষ্যতের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইবে। সে ভার ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখকের হস্তে রহিয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্রের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই,—পুরাতত্ত্ব সংকলন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।...”

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহাকে সারথি করিয়া, দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় ১৯১০ সালে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির চিত্রশালা (মিউজিয়ম) অক্ষয়কুমারের বড় আদরের সামগ্রী ছিল। তিনি বহুল পরিমাণে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন ('প্রবাসী,' চৈত্র ১৩৩৬):—

“রাজসাহীর কতিপয় যুবক প্রাচীন ভারত ইতিহাস অনুশীলনের অবকাশ লাভ করিয়াছে জানিয়া শেষ জীবনে তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, “I am now ebbing away, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আশা পোষণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে এখন মরিতে পারিব।” তিনি বলিয়াছিলেন, “বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাকালে ভাবিতে পারি নাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আলোচনা হইবে ও রাজসাহীর কোন সন্তান এ সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবে।”

এই বলিয়া মার্টিন লুথারের সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ পংক্তিযুগল উদ্ধৃত করিয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"If it man's ? It shall fade away
Is it God's ? It shall ever stay."

প্রতিভার সম্মান

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষয়কুমারকে ১৩১১ সালে অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ১৩১৮ সালে 'বিশিষ্ট-সদস্য' নির্ব্বাচিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাজসরকারও তাঁহাকে 'কৈসর-ই-হিন্দ স্বর্ণ-পদক' (ইং ১৯১৫) ও সি. আই. ই. উপাধি দান করিয়া তাঁহার প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ (২৭ মাঘ ১৩৩৬) তারিখে অক্ষয়কুমার পরলোকগমন করেন। মৃতুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাগ্মী ছিলেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন :—

"অক্ষয়কুমারের মৌলিক গবেষণার ধারা ছিল অভিনব, প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও প্রাক্তন প্রতিভার সংযোগই সম্ভবতঃ তাঁহাকে সর্ব্বতোমুখী গতি দান করিয়াছিল। কি সাহিত্যে, কি কলাবিদ্যায়, কি বাগ্মিতায়, সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশী-যুগে রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ বক্তৃতা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার শেষ জীবন রাজোপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলেও যাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুযোগ

পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তাঁহার কত প্রগাঢ় ছিল, ভারতবাসীর উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার আগ্রহ কত ঐকান্তিক ছিল। স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া একবার কোন বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীকে কৃত্রিম পণ্যে পরিণত করিয়া দিবার জন্য দেশের ইতিহাসের মর্য্যাদা অপেক্ষা কাহারও স্বার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একখানি স্কুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অনুরোধ জানাইলে, তদুত্তরে দরিদ্র অক্ষয়কুমার তেজস্বিতার সহিত জানাইয়াছিলেন,—"আত্মবিক্রয় করিয়া স্বদেশের অসত্য ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা তাঁহার অসাধ্য। ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।" —'প্রবাসী,' চৈত্র ১৩৩৬।

রচনাবলী

অক্ষয়কুমারের প্রাথমিক রচনাগুলি রাজসাহীর 'হিন্দু-রঞ্জিকা' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় প্রকাশিত হয়। ১৩০২ সাল (ইং ১৮৯৫) হইতে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় রীতিমতভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩০২ সালে তাঁহার লিখিত "সিরাজদ্দৌলা"র প্রথমাংশ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সাধনা'য় (ভাদ্র-কার্ত্তিক) ও "সীতারাম" 'সাহিত্যে' (মাঘ-চৈত্র) প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁহার রচনার সন্ধান প্রধানতঃ 'সাহিত্য,' 'ভারতী,' 'প্রদীপ', 'উৎসাহ,' 'ঐতিহাসিক চিত্র,' 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্য্যায়), 'প্রবাসী,' 'বঙ্গভাষা,' মানসী,' 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ও 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় মিলিবে।

অক্ষয়কুমার মাতৃভাষায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনীমধ্যে

প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **সমরসিংহ** (ঐতিহাসিক চিত্র)। ১২৯০ সাল (২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩।) পৃ. ২১।

২। **সিরাজদ্দৌলা** (ঐতিহাসিক চিত্র)। ১৩০৪ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ৪১৯।

'সাধনা' (১৩০২) ও 'ভারতী'তে (১৩০২-৩) প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১৩১৫) "ক্লাইব-কীর্ত্তিস্তম্ভ" নামে একটি রচনা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে ; ইহা প্রথমে ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ২৪ মার্চ ১৯১৬ তারিখে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির হলে, ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক আহূত সভায় অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে বিতর্ক হয়, তাহাতে অক্ষয়কুমার একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা ১৯১৬ সনের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা (পৃ. ১৫৬-১৭১) ***Bengal: Past and Present*** পত্রে মুদ্রিত এবং 'সিরাজদ্দৌলা'র পরবর্ত্তী একটি সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩। **সীতারাম রায়** (ঐতিহাসিক চিত্র)। বৈশাখ ১৩০৫ (১০ মে ১৮৯৮)। পৃ. ৮০।

ইহা প্রথমে ১৩০২ সালের কার্ত্তিক-চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্যে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত সীতারাম প্রশস্তি পঠিতব্য।

৪। **মীরকাসিম** (ঐতিহাসিক চিত্র)। ১৩১২ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬)। পৃ. ২৩৬।

'সাহিত্যে' (১৩০৩) প্রকাশিত "মীরজাফর" ও 'ভারতী'তে (১৩০৪) প্রকাশিত "মীরকাসিম" প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

৫। **ফিরিঙ্গি বণিক্‌**। শ্রাবণ ১৩২৯ (২০ জুলাই ১৯২২)। পৃ. ১৮৮।

'সাহিত্যে' (১৩১১-১২) প্রকাশিত "ফিরিঙ্গি-বণিক্‌" শীর্ষক প্রবন্ধ সংশোধিত কলেবরে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

৬। **অজ্ঞেয়-বাদ** (সমালোচনা)। ? (ইং ১৯২৮)। পৃ. ৭৮।

১২৯৮ সালের 'ধর্ম্মবন্ধু' পত্রিকায় ইহার কিয়দংশ এবং পরে রাজসাহী হইতে প্রকাশিত 'উৎসাহে' (বৈশাখ-চৈত্র ১৩০৪) পরিবর্ত্তিত আকারে আদ্যন্ত মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের দীর্ঘ "অবতরণিকা" জলধর সেন-লিখিত।

৭। **গৌড়লেখমালা**, ১ম স্তবক। ১৩১৯ সাল (১ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১৫৯।

"প্রথম স্তবকে পাল-নরপালগণের তাম্রশাসন ও তাঁহাদিগের শাসন-সময়ের কতিপয় শিলালিপি প্রকাশিত হইল।"

*　　　*　　　*　　　*

অক্ষয়কুমার-লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত দুইখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রথমখানি রমাপ্রসাদ চন্দ-প্রণীত 'গৌড়রাজমালা' (১৩১৯ সাল, ১ জুন ১৯১২); দ্বিতীয়খানি অক্ষয়কুমার বড়াল-রচিত গীতিকাব্য 'কনকাঞ্জলি' (৩য় সং, ১৩২৪ সাল)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা।—অক্ষয়কুমারের অল্পসংখ্যক রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—অধিকাংশই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাগুলির একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রদত্ত হইল। এগুলি একত্র করিয়া একটি সংগ্রহ গ্রন্থ-প্রকাশ করিতে পারিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ করা হইবে।—

১২৮৮,	পৌষ	'গ্রামবর্ত্তা প্রকাশিকা',	নীতিশিক্ষা।
১৩০৩,	বৈশাখ ...	'সাহিত্য'	কাঙ্গাল হরিনাথ
	ভাদ্র ...	"	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
	কার্ত্তিক ...	"	মন্বন্তর
	ফাল্গুন ...	"	গোলাম হোসেন
	চৈত্র ...	'ভারতী'	হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র
১৩০৪,	বৈশাখ, শ্রাবণ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ-ফাল্গুন	'সাহিত্য'	রাণী ভবানী
	জ্যৈষ্ঠ ...	"	দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট ?
	কার্ত্তিক ...	"	কাজির বিচার
	মাঘ-চৈত্র, বৈশাখ-	"	
	আষাঢ় ১৩০৫	'প্রদীপ'	লাল পল্টন
	মাঘ ...	'উৎসাহ'	বাঙ্গালা ভাষার লেখক
১৩০৫,	বৈশাখ, আষাঢ়	'সাহিত্য'	মহারাজ রামকৃষ্ণ
	আষাঢ় ...	"	সেকালের 'কলিকাতা গেজেট'
	বৈশাখ	'উৎসাহ'	পুণ্যাহ

১৩০৫, আষাঢ়	...	'উৎসাহ'	... হেষ্টিংসের শিক্ষানবিশী
পৌষ-ফাল্গুন		'ঐতিহাসিক চিত্র'	সম্পাদকের নিবেদন
			... 'রিয়াজ্ উস্-সালাতিন' (উপক্রমণিকা)
			... নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন
পৌষ	...	'প্রদীপ'	... হিন্দু-সমুদ্রযাত্রা
জ্যৈষ্ঠ	...	'ভারতী'	... ঢাকা
আষাঢ়	...	"	... পট্টবস্ত্র প্রসঙ্গ কথা
শ্রাবণ	...	"	... বস্ত্ররঞ্জন-বিদ্যা
অগ্রহায়ণ	...	"	... এণ্ডি
আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ	...	'মুকুল'	... "ই-ন্-তু(তা-ত্যাং-সি-ইউ-কি)"
চৈত্র		'ঐ. চিত্র'	... 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত'
১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ			সমালোচনা
			... তাম্রশাসন সমালোচনা
			... নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন
আষাঢ়-ভাদ্র		"	... নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য
জ্যৈষ্ঠ	...	'প্রদীপ'	... বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য
মাঘ	...	"	... সেকাল
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ		'উৎসাহ'	... খুকুমণির ছড়া (সমালোচনা)
আষাঢ়-মাঘ		"	... শাহ আলম
১৩০৭, ফাল্গুন	...	'প্রদীপ'	... অল্-বেরুণী
পৃ. ১৪	...	'উৎসাহ'	... চৈনিক তীর্থযাত্রী

১৩০৭, পৃ. ৪৩ … 'উৎসাহ' … গুজব

পৃ. ৯১, ১২৪, ১৮৭ „ … ফা হিয়ান

পৃ. ২৪২ … „ … 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (সমালোচনা)

পৃ. ৩৪৮ … „ … শিক্ষা-সমস্যা

১৩০৮, ভাদ্র … 'প্রদীপ' … 'কথা' (সমালোচনা)

পৌষ … 'প্রদীপ' … 'গাজি মিয়ার বস্তানি' সমালোচনা

মাঘ ও ফাল্গুন „ … 'দেবীযুদ্ধ' (সমালোচনা)

অগ্রহায়ণ… 'বঙ্গদর্শন' … 'বাঙ্গালার ইতিহাস। নবাবী আমল।' (সমালোচনা)

পৌষ .. „ … মদন-মহোৎসব

চৈত্র … „ … গৌড়ীয় হিন্দু সাম্রাজ্য। উপক্রমণিকা

জ্যৈষ্ঠ … „ … বাঙ্গালী

অগ্রহায়ণ-পৌষ „ … 'খিচুড়ী' (সমালোচনা)

অগ্রহায়ণ-চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩০৯ 'প্রবাসী' … ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

১৩০৯, ভাদ্র … 'উৎসাহ' … 'রঙ্গিনী' (সমালোচনা)

জ্যৈষ্ঠ … 'বঙ্গদর্শন' … গৌড়ের পূর্ব্বকাহিনী

আষাঢ় … „ … পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত

শ্রাবণ … „ … পঞ্চ পাল-নরপাল

ভাদ্র … „ … যবন

আশ্বিন … „ … রাজতরঙ্গিণী

১৩০৯,	ভাদ্র	··· ‘প্রবাসী’	···	কপিলবস্তু
	আশ্বিন	··· ”	···	পাটলিপুত্র
	বৈশাখ	··· ”	···	ভারত শিল্প-সম্ভার
১৩১০,	ভাদ্র	··· ‘সাহিত্য’	···	অব্যক্তানুকরণ
	চৈত্র	··· ”	···	মুসলমান-শিক্ষাসমিতি
	ভাদ্র	··· ‘প্রদীপ’	···	‘রাঘব-বিজয় কাব্য’ (সমালোচনা)
.	ভাদ্র, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ	‘বঙ্গদর্শন’	···	বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়
	পৌষ	··· ”	···	শ্রমণ
১৩১১,	বৈশাখ	··· ‘সাহিত্য’	···	কবিকল্পদ্রুম
	জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ	‘বঙ্গদর্শন’	···	ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য
	কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩১২		···	রামায়ণের রচনাকাল
	অগ্রহায়ণ	··· ”	···	ব্রাহ্মণ
	কার্ত্তিক	··· ‘ঐ. চিত্র’	···	দান-সাগর
	অগ্রহায়ণ	··· ”	···	ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব
১৩১২,	বৈশাখ	··· ‘বঙ্গদর্শন’	···	প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা
	শ্রাবণ	··· ”	···	সাহিত্য ও ব্যাকরণ
	কার্ত্তিক	··· ”	···	মর্ম্মচ্ছেদ
	পৌষ	··· ”	···	নবজীবন
	কার্ত্তিক	··· ‘ভাণ্ডার’	···	প্রশ্নোত্তর (পৃ. ২৬৮)
১৩১৩,	পৌষ	··· ‘বঙ্গদর্শন’	···	সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব

১৩১৩,	ভাদ্র …	'বঙ্গভাষা'	কাব্য-সমালোচনা
	অগ্রহায়ণ …	„	'তারাবাই' (সমালোচনা)
	পৌষ-ফাল্গুন	„	ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ
	বৈশাখ …	'ভাণ্ডার'	প্রশ্নোত্তর (পৃ. ৪১)
১৩১৪,	অগ্রহায়ণ-পৌষ	'বঙ্গভাষা	কর্পূর-মঞ্জরী
	মাঘ …	„	রামায়ণ-তত্ত্ব
	আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্ত্তিক- পৌষ, চৈত্র ১৩১৪। বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩১৫	'বঙ্গদর্শন	গৌড়-কাহিনী
	চৈত্র	'প্রবাসী' …	আদিনা
	ভাদ্র	'প্রবাসী' …	গৌড়-দুর্গ
১৩১৪,	শ্রাবণ	„ …	গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষ
	আশ্বিন	„ …	গৌড়ীয় নগরোপকণ্ঠ
	কার্ত্তিক	„ …	পুরাতন মালদহ
	অগ্রহায়ণ	„ …	পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত
	আষাঢ়	„ …	লক্ষ্মণাবতী
	মাঘ	„ …	হজরত পাণ্ডুয়া
	বৈশাখ	'ঐ. চিত্র' …	বাঙ্গালীর ইতিহাস
	ভাদ্র-আশ্বিন	„ …	খুরশিদ জাঁহানামা
১৩১৫,	আশ্বিন	'জাহ্নবী' …	বাঙ্গালীর ইতিহাস
	শ্রাবণ	'বঙ্গদর্শন' …	উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন
	কার্ত্তিক	„ …	গৌড়-তত্ত্ব
	অগ্রহায়ণ	„ …	প্রাচ্য ভারত

১৩১৫, বৈশাখ ··· 'প্রবাসী' ··· পাণ্ডুয়ার কীর্ত্তিচিহ্ন
কার্ত্তিক ··· „ ··· উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বসংগ্রহ
অগ্রহায়ণ ··· „ ··· একডালা-দুর্গ
মাঘ ··· „ ··· লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক
শ্রাবণ-আশ্বিন 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান
মাঘ-চৈত্র ··· „ ··· বাভ্রবী কায়া
১৩১৬ পৌষ-চৈত্র ··· 'বঙ্গদর্শন' ··· শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি
মাঘ ··· 'প্রবাসী' ··· উৎকল-চিত্র
অগ্রহায়ণ ··· 'মানসী' ··· খণ্ডগিরি
শ্রাবণ-আশ্বিন 'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' বোধিসত্ত্ব লোকনাথ
১৩১৭, বৈশাখ ··· 'সাহিত্য' ··· বঙ্গ-পরিচয়
ভাদ্র ··· „ ··· ধীমানের ভাস্কর্য্য
পৌষ-ফাল্গুন ··· 'বঙ্গদর্শন' ··· বরেন্দ্র-ভ্রমণ
মাঘ, জ্যৈষ্ঠ (১৩১৮) 'সাহিত্য' ··· দেশের কথা
ফাল্গুন ··· 'মানসী' ··· উদয়গিরি
১৩১৮, বৈশাখ ··· 'বঙ্গদর্শন' ··· বিজয়নগর
শ্রাবণ ··· „ ··· রিজিয়া
আশ্বিন ··· „ ··· তপন-দীঘি
কার্ত্তিক ··· 'সাহিত্য' ··· নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন
চৈত্র ··· „ ··· ভারতীয় শিল্পাদর্শ
শ্রাবণ, ভাদ্র ··· 'জাহ্নবী' ··· গৌড়-কাহিনী
কার্ত্তিক ··· 'মানসী' ··· নাট্যাভিনয়

১৩১৮, বৈশাখ	'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন'	… বিশ্বকর্ম্মা
ভাদ্র, আশ্বিন	„	… সারনাথ
১৩১৯, বৈশাখ …	'সাহিত্য'	… ভারতশিল্পের ইতিহাস
জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ। আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্ত্তিক (১৩২০)	„	… সাগরিকা
জ্যৈষ্ঠ …	'বঙ্গদর্শন'	… ভারতশিল্পের মূলসূত্র
পৌষ …	'সাহিত্য'	… প্রত্নবিদ্যা
ফাল্গুন …	„	… উড়িষ্যা ও তাহার ধ্বংসাবশেষ
ফাল্গুন-চৈত্র। বৈশাখ (১৩২০)	'বঙ্গদর্শন'	… রামাবতী
১৩১৯, চৈত্র …	'সাহিত্য'	… গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী
চৈত্র …	'মানসী'	… ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়
কার্ত্তিক …	„	… কান্তকবির স্মৃতি সম্বর্দ্ধনা
১৩২০, বৈশাখ …	'সাহিত্য'	… মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন
জ্যৈষ্ঠ …	„	… গৌড়-কবি মনোরথ
		… ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন [প্রশস্তি-পাঠ]

১৩২০, আষাঢ়	...	'সাহিত্য'	... গৌড়-কবি চতুর্ভুজ
			... মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ
ভাদ্র	...	"	... তন্ত্র-পরিচয়
অগ্রহায়ণ	...	"	... ভারত স্থাপত্য
১৩২১, বৈশাখ	...	"	... ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
আশ্বিন	...	"	... মহিষমর্দ্দিনী
কার্ত্তিক	...	"	... ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক
অগ্রহায়ণ	...	"	... ঐতিহাসিক রচনা-গরজ
১৩২২, আষাঢ়	...	'মানসী'	... 'পাষাণের কথা' (সমালোচন)
১৩২৩, বৈশাখ	...	'সাহিত্য'	... বাঙ্গালীর আদর্শ
জ্যৈষ্ঠ। অগ্রহায়ণ ১৩২৭		"	... গঙ্গবংশানুচরিতম্
মাঘ-চৈত্র	...	"	... বরেন্দ্র-খনন-বিবরণ
বৈশাখ	...	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	... কলিকাতা অবরোধ
ফাল্গুন	...	"	... বাঙ্গালীর জীবন-বসন্তের স্মৃতি-নিদর্শন
চৈত্র	...	"	... আলেকজান্দারের অভিযান
চৈত্র	...	'পরিচারিকা'	... সন্ধি-বিচার
বৈশাখ	...	'ভারতী'	... অন্ধকূপহত্যা

১৩২৩,	জ্যৈষ্ঠ ...	'ভারতী'	... 'নূরজহান' (সমালোচনা)
	আষাঢ় ...	'প্রতিভা'	... মধ্যযুগে বঙ্গদেশ
১৩২৪,	আশ্বিন ...	'সাহিত্য'	... সিন্ধু (কবিতা)
	বৈশাখ ...	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	... বৌদ্ধ কলাবিদ্যা
১৩২৭,	ফাল্গুন-চৈত্র	'সাহিত্য'	... সুরেশ-স্মৃতি
১৩২৮,	বৈশাখ ...	'সাহিত্য'	... কোন্ পথে
	কার্ত্তিক ...	"	... গঙ্গা-দেবী
	চৈত্র ...	"	... 'বাঙ্গালীর বল' (সমালোচনা)
১৩২৯,	শ্রাবণ, ভাদ্র ...	'সাহিত্য'	... ভারত-শিল্পতত্ত্ব
	ফাল্গুন ...	'ভারতবর্ষ'	... ভারত-শিল্পচর্চ্চার নববিধান
	চৈত্র ...	"	... বঙ্গভাস্কর্য্য-নিদর্শন
	আশ্বিন ...	"	... ভারত চিত্রচর্চ্চা
১৩৩০,	বৈশাখ ...	'বঙ্গবাণী'	... পাহাড়পুর
	বৈশাখ ...	'ভারতবর্ষ'	... ভারতচিত্র-চর্চ্চার নববিধানের 'অন্তর-বাহির'
	পৌষ ...	"	... 'পোলাও' (সমালোচনা)
	১৩ পৌষ ...	'সচিত্র-শিশির'	... কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা)
১৩৩১,	১০ জ্যৈষ্ঠ	"	... অর্দ্ধেন্দুশেখর
	ভাদ্র ...	'প্রাচী'	... প্রাচ্যশিল্প সম্বর্দ্ধনা

১৩৩২, মাঘ ... 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ... শেষ দেখা
[জগদিন্দ্রনাথ রায়]
১৩৩৩, অগ্রহায়ণ ... 'ভারতবর্ষ' ... আতঙ্ক-নিগ্রহ
১৩৩৪, ফাল্গুন ... 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ... মানব সভ্যতার আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র
১৩৩৫, কার্ত্তিক ... 'ভারতবর্ষ' ... শাক্যবুদ্ধ—বোধিদ্রুম
১৩৩৭, আষাঢ় ... " ... ভৌগোলিক তথ্য

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র সরকার সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত অক্ষয়কুমারের ইংরেজী রচনাগুলির একটি তালিকা 'মডার্ণ রিভিউর' পৃষ্ঠায় (মার্চ ১৯৫২) প্রকাশ করিয়াছেন।

পত্রাবলী

গৌড়শিল্পের উৎপত্তি ও ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়কুমারের যে পত্র-ব্যবহার হয়, তাহা ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা এই সকল পত্রের মাত্র তিনখানি নিয়ে পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম :—

ঘোড়ামারা, রাজসাহী
১১ বৈশাখ ১৩১৯

প্রীতিনমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ হর্ষ ও গর্ব্ব লাভ করিলাম। আপনার সহিত পূর্ব্বপরিচয়ের সৌভাগ্য না থাকিলেও আপনার শিল্পালোচনার সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় ছিল। আপনার পত্রে তাহার আরও

পরিচয় পাইয়াই হর্ষ ও গর্ব্ব লাভ করিলাম, আপনাদিগের মত উৎসাহী অধ্যবসায়ী এবং একনিষ্ঠ সাধকের সাধনা অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করিবে। আমি যখন ভারতশিল্পের তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করি, তখনও গৌড় শিল্পের ইতিহাসের অনুসন্ধানের কামনাই একমাত্র কামনা ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে। সে অনেক দিনের কথা। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পুরাতন শিল্পের নিদর্শন দেখিয়াই আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই। আমার পক্ষে সর্ব্বদা কলিকাতা যাতায়াত ও তথা হইতে ইচ্ছামত পুস্তকাদি আনিয়া অধ্যয়ন কখনও সুবিধাজনক হয় নাই; ইহাতে বাধ্য হইয়াই আমাকে অন্যান্য উপায়ে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। আমি কিছু লিখিতাম না, বন্ধুবান্ধবকে ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছবি দেখাইতাম। তাঁহাদিগের উপদ্রবে 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার পর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি আমাকে গৌড়-শিল্পকলার ইতিহাস লিখিবার জন্য তাড়না করায় এত কালের পর লিখিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়া এখন দুই একটি প্রবন্ধ ছাপিতে দিতেছি। আমি আর আপনাদিগকে কি অভয় দিব,—আপনারাই আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া অভয় দিয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমি ইতিহাসের দিক্ দিয়াই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছি—শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকার লাভ করি নাই। ইতিহাসের দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গিয়াই আমি বুঝিয়াছি—শিল্পবিধি প্রথমে কারিকারূপে প্রচলিত ছিল পরে ক্রমে ক্রমে তাহা সঙ্কলিত হইয়া, বাস্তুশাস্ত্রে, পুরাণে, তন্ত্রে বিবিধ ভাবে বিবিধ গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। যেমন আগে ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণ;—সেইরূপ আগে শিল্প, তাহার অনেক পরে শিল্পশাস্ত্র

সুতরাং শিল্প-শাস্ত্রে "ব্যাকার," বিবরণ লাভ করিয়া তাহার সাহায্যে শিল্পরীতি অধ্যয়ন করা চলিতে পারে। সকল যুগের সকল শিল্পই শাস্ত্র মানিয়া চলে নাই, স্বাধীন উদ্ভাবনা অনেক সময়ে গণ্ডী ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কথাটি না ধরিয়াই স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্ ভ্রমে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। ভাষা বুঝিবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজনের মত শিল্প বুঝিবার জন্য শিল্প-শাস্ত্রের প্রয়োজন,—তাহার অধিক ইহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করা যায় না, ইহাই আমার মত। গৌড়-শিল্প কোন্ শিল্পশাস্ত্র ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব, তখন তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া বুঝিয়াছিলাম – মগধ, উড়িষ্যা এবং দ্বীপপুঞ্জের শিল্প গৌড়শিল্প। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য একসঙ্গে চলিয়াছে বলিয়া একসঙ্গে বুঝিতে হইলে, সমস্ত উত্তরাপথের (আর্য্যাবর্ত্তের) শিল্পে বিশ্বকর্ম্মার প্রভাব দেখা যায়—এ কথা 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে লিখিয়াছিলাম। আমাদিগের দেশের নব্য স্মৃতিতে দেখা যায়—হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের প্রভাব এদেশেও বর্ত্তমান ছিল। সেই হইতেই উহার সন্ধান করিতেছি, এবং গ্রন্থ না পাওয়ায় উদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে হয়শীর্ষ-মতের পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে উড়িষ্যায় গ্রন্থ দেখিলাম। উহার নকল আনিতে পারি নাই। উড়িয়া অক্ষর হইতে বঙ্গাক্ষরে নকল করাইতে ব্যয়বাহুল্য আছে। আমি উড়িষ্যায় ফটোগ্রাফ তুলিতেই ব্যয়বাহুল্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার সাংসারিক অবস্থায় অধিক ব্যয়বাহুল্য সম্ভবে না। আপনি যখন বঙ্গাক্ষরে পুথি পাইয়াছেন, তখন আমাকে একবার আদ্যন্ত দেখিতে দিবেন। যে Bibliography প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা অবশ্যই উপাদেয় হইবে, তাহাও দেখিবার আশায় রহিলাম। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি অনেক পুরাণ তন্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়া ও দক্ষিণাপথ হইতে শিল্পশাস্ত্রের পুথিগুলির নকল ক্রমশঃ আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া

আমার সাহায্য করিতেছেন, আপনার নিকটেও সেইরূপ সাহায্য পাইলে আমার পরিশ্রমের লাঘব হইবার আশা আছে। শিল্পকারগণ অনেক অধ্যাপক অপেক্ষা শিল্পশাস্ত্রের মর্ম্ম ভালরূপ জ্ঞাত আছে। অধ্যাপকবর্গ শিল্পশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ প্রয়োজনের অভাবে তাঁহারা এই শাস্ত্রের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়াই অনভিজ্ঞ হইয়াছেন। আপনি যে পুস্তক রচনা করিতেছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হউক, ইহাই প্রার্থনা। আমি তাহার কোন কাজে লাগিলে ধন্য বোধ করিব, সুতরাং আমাকে অসঙ্কোচে লিখিবেন।

গৌড়শিল্পের ইতিহাসের আভাসটি এইরূপ,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে স্বতন্ত্র শিল্প ছিল না, নিদর্শনও অল্প ছিল, যাহা ছিল, তাহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কিছু কিছু নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে, [মগধে ও উড়িষ্যায় ত বটেই] গৌড়ীয় পাল সাম্রাজ্যের প্রভাব বর্ত্তমান থাকায়, সমগ্র উত্তরাপথের ভাষায়, রচনায়, শিল্পে ও লোকাচারে গৌড়ীয় প্রভাব প্রাধান্য লাভ করে ;—ইহা ইতিহাসের কথা, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও পুরাতন গ্রন্থ হইতে ইহা দেখাইয়া যাহা লিখিয়াছি, তাহা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির প্রথম গ্রন্থে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইবে। দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ যে বাঙ্গালীর উপনিবেশ, তাহার প্রমাণ দেখাইয়া গ্রন্থ লিখিতেছি, এবং যবদ্বীপের শিল্প-প্রতিভা-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'সাহিত্যে' পাঠাইয়াছি, তাহাও জ্যৈষ্ঠ মাসেই বাহির হইবে। লামা তারানাথের গ্রন্থের পরে তিব্বতীয় ভাষায় প্যাগ-সাম-জন্-জাঙ্গ নামে আর একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। উহাতেও ধীমানের পরিচয় আছে। যে অংশে তাহা আছে তাহার অনুবাদভার রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কোনও সংস্কৃত

গ্রন্থে গৌড়-শিল্পরীতির উল্লেখ দেখি নাই; নামটি আমিই প্রচলিত করিতেছি, কারণ, উহাই প্রকৃত নাম হওয়া উচিত। প্রতিমালক্ষণ বা Iconology ভারতীয় Iconographyর একাংশ বলিয়াই আমি *Dawn* পত্রে Iconography শব্দেরই ব্যবহার করিয়াছি।

আপনি যে ভাবে শিল্পযুগের বিভাগ করিয়াছেন, উহাই প্রচলিত বিভাগ, কিন্তু উহা ঐতিহাসিক বিভাগ নয়—কাল্পনিক। ঐতিহাসিক বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ ধরিয়া করিতে হইবে। যে যুগে যে কারণে মূর্ত্তি কল্পনা যে ধারা অবলম্বন করিয়াছিল, সেই যুগের সকল সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিতেই তাহা দেদীপ্যমান। সুতরাং সম্প্রদায়-অনুসারে যুগের নামকরণ করিলে, তাহা ইতিহাসের বিচারে টিকিতে পারিবে না।

উড়িষ্যার দেবমূর্ত্তিগুলির মধ্যে যাহার ছবি বা স্কেচ পাইলে আমার উপকার হইতে পারে, তাহার তালিকা এইরূপ:—(১) যাজপুরের মাতৃকামূর্ত্তি, (২) পুরীর মার্কণ্ডেয় সরোবরতীরে একখানি চালাঘরে রক্ষিত মাতৃকামূর্ত্তি, (৩) পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের বাহিরের বৃহৎ বরাহ ও নৃসিংহমূর্ত্তি, এবং পুরী ও কোণার্কের কষ্টিপাথরের সমস্ত মূর্ত্তি, (৪) সাক্ষী গোপালের মূর্ত্তি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাহার কথা লিখিয়াছি।

আমার পত্রও দীর্ঘ হইয়া পড়িল। যত কথা বলিব, তত কথা বলা হইল না। আর দুই একটা কথা বলিয়া এবার বিদায় লইব। আপনি বাঙ্গালা দেশের গৌড়শিল্পের নিদর্শনের তালিকা চাহিয়াছেন, তাহা বৃহৎ। আমরা তাহার magic lantern slide করিয়াছি ও করিতেছি। কলিকাতার যাদুঘরে কিছু আছে, কিন্তু বেশী আছে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ-মন্দিরে। তাহার ব্লক হইতেছে, একসঙ্গে গৌড়শিল্পকলা পুস্তকে বাহির হইবে। গৌড়শিল্পরীতি সম্বন্ধে আমার অভিমত কি

তাহার একটা 'নোট' চাহিয়াছেন। সংক্ষেপে লিখিলেও তাহা বৃহৎ 'নোট' হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে মহাযান-সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মবাদের পরিণামই গৌড়ীয় শিল্পরীতিরূপে আকার গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চ পাল নয়পালের সময় পর্য্যন্ত সেই অধ্যাত্মবাদ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া ক্রমে অবসন্ন হয়, শিল্পও তাহার অনুগমন করে। বরেন্দ্রে যে শিল্পরীতির উদ্ভব, তাহা উড়িষ্যায়, মগধে, দ্বীপপুঞ্জে গিয়াছিল। মগধ ও গৌড় একসূত্রে গ্রথিত থাকায়, মহাজান মতের অধোগতির সঙ্গে এই দুই স্থানের শিল্পরীতি ক্রমে অবনতি লাভ করিতে থাকে; কিন্তু উড়িষ্যায় ও দ্বীপপুঞ্জে সেরূপ কারণ বর্ত্তমান না থাকায়, তদ্দেশে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। বরেন্দ্রে উদ্ভব—উড়িষ্যায় শক্তিলাভ—দ্বীপপুঞ্জে পরিণতি, ইহাই গৌড়ীয় শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ভুবনেশ্বরে বসিয়া ইহার পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। ফর্গসনের নূতন সংস্করণের দ্বিতীয় ভাগে উড়িষ্যার স্থাপত্যের কালনির্ণয়াত্মক তালিকা দেখুন,—যবদ্বীপের উৎকৃষ্ট মূর্তিগুলির রচনাকালের কথা চিন্তা করুন,—সহজেই ইতিহাসের সূত্র ধরিতে পারিবেন। প্রাদেশিক রচনারীতি মূলরচনা-রীতিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিলেও আচ্ছন্ন করিতে পারে না। কোন্‌টি মূল, কোন্‌টি প্রাদেশিক, তাহা বাছিয়া বাহির করিবামাত্র, উড়িষ্যার এবং দ্বীপপুঞ্জের শিল্পরীতি যে গৌড়শিল্পরীতি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিবে না। এ বিষয়ে আমি অল্পে অল্পে অনেক লিখিয়াও কিছুই লিখিতে পারিলাম না। 'সাহিত্যে' মাসে মাসে কিছু কিছু লিখিব মনে করিয়াছি, তাহাতেই আমার বক্তব্যের আভাস পাইতে পারিবেন। এখন বিদায় গ্রহণের সময়ে প্রার্থনা জানাইয়া রাখি—আপনি যে শিল্পগ্রন্থের নকল আনাইয়াছেন, সেগুলি রেজেষ্টরী ডাকে অথবা লোকমারফতে ক্রমে ক্রমে আমাকে দেখিতে দেন এবং যে সকল স্কেচ্ আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিয়া দেন, আমি তদবলম্বনে

আপনাদের প্রভাবিত শিল্পসূত্রসংগ্রহ নামক গ্রন্থ সঙ্কলনের চেষ্টা করি। অলমতিবিস্তরেণ—ভবদীয় শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পুনঃ নিঃ—বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত গৌড়শিল্পের নিদর্শনের একটি নমুনা পাঠাইলাম। উহা গৌড়শিল্পকলা-পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক উহা প্রথমে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং এই চিত্র আপনি ব্যবহৃত করিবেন না, আপনাকে সেরূপ অধিকার দানের অধিকার আমার নিজেরই নাই। কেবল আপনাকে গৌড়শিল্প চিনিবার উপযোগী একটি নিদর্শন দিবার জন্য ইহা পাঠাইলাম। আপনি শিল্পী, এই চিত্র সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা জানিবার জন্য আশান্বিত হইয়া রহিলাম। কি গুণে গৌড়শিল্প আমার মত একজন শুষ্ক ঐতিহাসিককেও রসসিক্ত করিয়াছে, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। ইতি—

ঘোড়ামারা, রাজসাহী

প্রীতিনমস্কার নিবেদন,

১৫ই বৈশাখ ১৩১৹

আপনার উপদেশপূর্ণ পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। আপনি সাবধান না করিলেও, আমার পক্ষে যাহা তাহা *a priori* সিদ্ধান্ত ধরিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া দীর্ঘকালের ইতিহাস চর্চ্চার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিবার সম্ভাবনা নাই। আমার অজ্ঞতাই আমার সাবধানতার অবলম্বন। যতক্ষণ না বুঝিতে পারি, ততক্ষণ বুঝিবারই চেষ্টা করি। যবদ্বীপাদির উপনিবেশ যে হিন্দু উপনিবেশ তাহা শুনিয়া তৃপ্তি হয় না,—কাহাদের উপনিবেশ জানিতে ইচ্ছা করে। এ বিষয়ে আমি যে সকল প্রমাণের যে ভাবে আলোচনা করিতেছি, তাহা কাহারও অভিমতের প্রতিধ্বনি নহে; আমার নিজের অভিমত এবং তাহা কেবল প্রমাণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; *a priori* সিদ্ধান্ত নহে। পত্রে তাহার পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। তাহা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী গৌড়শিল্পের উত্থান পতনের ঐতিহাসিক কাল। এই কালের মধ্যে যে শিল্পকলা গৌড়ে উদ্ভূত, উড়িষ্যায় শক্তিপ্রাপ্ত ও যবদ্বীপে পরিণতাবস্থায় আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকেই আমি "গৌড়শিল্পকলা" বলিয়াছি। তাহার মধ্যে পূর্ব্বকালবর্ত্তী শিল্পপদ্ধতির ধারা অবশ্যই কিছু কিছু লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গৌড়শিল্পের নিজের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। গৌড়শিল্পই যে ভারতবর্ষের সকল যুগের সকল শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমি এমন দাবী উপস্থিত করিতে পারি না; কেহ করেন কি না জানি না। গৌড়শিল্প যে ভাবটির অভিব্যক্তি, তাহাকে ইতিহাসের মধ্যেই সন্ধান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। তর্কস্থলে যদি আমার এই সিদ্ধান্তটি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে গৌড়ের, উড়িষ্যার ও যবদ্বীপের শিল্পনিদর্শনগুলি এই সিদ্ধান্তের অনুকূল হয় কি না, শিল্পের দিক্ দিয়া আপনারা তাহার বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। সে দিকে যদি এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, যে কিছুতেই আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, তখন না হয় শিল্পসৌন্দর্য্যের প্রমাণের বলে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিবেন। একটা theory না হইলে বিচার চলে না। আপনারা আপাততঃ আমার অভিমতটিকে একটা theory মাত্র মনে করিয়াও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। তাহার অধিক আর কিছু বর্ত্তমান অবস্থায় দাবি করিতে চাহি না—আমাদের সম্পাদক মহাশয় ছবি দাগাইয়া যে কি অপকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আপনার পত্র হইতে তাঁহাকে শুনাইলাম। আমাদের সংগৃহীত নিদর্শনগুলি 'আমাদের,' আমার নহে। সমিতির অনুমতি না পাইলে, তাহার ফটো ইত্যাদি দিতে পারি না ও কাহাকেও দেখাইতে পারি না। সমিতি পুস্তক

লিখিতেছেন বলিয়াই এরূপ সাবধানতার প্রয়োজন বুঝিয়াও আমার অধিকার অতিক্রম না করি, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বপত্র লিখিয়াছি। আপনার পত্রখানি সমিতিতে পেশ করিয়া, অনুমতি লইয়া, তালিকা ইত্যাদি পাঠাইব। গৌড়শিল্পের নিদর্শনগুলি নানা দেশে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি—সে কেবল আপনাদের জন্যই। যোগ্য ব্যক্তি আসিয়া তাহার আলোচনা করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য। ইহার জন্য আমরা অনাহারে অকথ্য ক্লেশে নানা স্থানে যাতায়াত করিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়াছি। ইহাও আপনাদের জন্যই। আমরা কোথায় কি পাইলাম, কেমন করিয়া পাইলাম, কাহার নিদর্শন পাইলাম,—তাহাই লিখিয়া রাখিতেছি। তারানাথ যে ধীমানের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি কোথায় উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার শিল্পের নিদর্শন কোন্‌গুলি,—আমরা এখন কেবল এই সকল বিষয়েরই প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি। সে শিল্পের মূল্য কি, সমগ্র ভারতশিল্পে তাহার স্থান কোথায়, তাহা আমাদিগের আলোচ্য নয়। যাহা কেবল আমাদিগেরই আলোচ্য এবং আমরা না করিয়া গেলে, আপনাদের পক্ষে করা একরূপ অসম্ভব দাঁড়াইতে পারে, আমরা আপনাদের জন্য সেই "ভূতের বেগার" খাটিতেছি। ইহার অধিক আমাদের কাজের মূল্য নাই। আপনি তাহাকে কল্পনাবশে সদাশয়তা গুণে বহুমূল্য মনে করিবেন না। আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়া রাখিয়াছি—আমি শুষ্ক ঐতিহাসিক। তবে আমার দাবি একটু আছে, একটু মাত্র, সেটুকু স্বীকার করিতেই হইবে। আর কিছু নয়—যাহা ইতিহাস ধরিয়া বুঝিতে হইবে, সেইটুকু আমরা ইতিহাস ধরিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া যাইব। **Architecture and History** সম্বন্ধে *Spectator* পত্রে যে বাদানুবাদ চলিতেছে ২৩ মার্চ্চ ও ৩০ মার্চ্চ

সংখ্যক পত্রে তাহা দেখিবেন। সুতরাং আমাদের "অনুসন্ধান-চেষ্টা" আরও কয়েক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলে, গৌড়-শিল্পের আলোচনার পথ আপনাদের পক্ষে সুগম হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। মাটির নীচে হইতে খুড়িয়া তুলিবার সময় নাসিকাচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া পরিতাপ করিলেও বলিতে হইবে—মাটি-চাপা অপরিজ্ঞাত অবস্থায় থাকিলেও লাভ হইত না। এ সকল অনিবার্য্য বিষয়কে একটু ক্ষমার চক্ষে, একটু সহৃদয়তার চক্ষে দেখিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।

আমাকে তালিকা পাঠাইতে লিখিয়াছেন, তালিকা পাঠাইলাম। যথা :—(১) উড়িষ্যাশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনের ছবি, (২) মাতৃকামূর্ত্তির ছবি, যাজপুর ও পুরীধামের, (৩) কোণার্কের নবগ্রহের ছবি, (৪) পুরীর ভোগ-মন্দিরের বিশেষ বিশেষ ছবি, (৫) শিল্পগ্রন্থের তালিকা, (৬) হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের প্রতিমা-লক্ষণের নকল এবং (৭) হরিভক্তি-বিলাসের একখানি হস্তলিখিত পুথি। কশ্যপ, অগস্ত্য ও অত্রি-প্রণীত গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল কি না সন্ধান পাই নাই, তবে তাঁহাদের কারিকা উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি। পঞ্চরাত্র গ্রন্থ এক শ্রেণীর তন্ত্রগ্রন্থ—উহা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের গ্রন্থ—সুতরাং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সমস্ত গ্রন্থেরই নকল রাখা উচিত।

অনুসন্ধান সমিতির প্রধান নায়ক কুমার শরৎকুমার এখন কলিকাতায়। তিনি সপ্তাহ মধ্যে দেশে ফিরিবেন। তিনি আসিবার পর আমাদের বৈঠক হইবে। তাহার পর আপনার "আবেদনের তালিকার" অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব। নটরাজ ও নৃত্যগণেশের ধ্যান আমরা দাক্ষিণাত্য হইতে সংগৃহীত পুথিতে পাইয়াছি নকল এখন আমাদের সম্পাদকের হস্তে, উহাও এক সঙ্গেই পাঠাইতে পারিব। বাঙ্গালার নটরাজ একটু পৃথক্—তাহার নৃত্যভঙ্গীও পৃথক্—এবং

তাহার একটি ভগ্ন মূর্ত্তি আমরা পাইয়াছি। ভুবনেশ্বরে [মুক্তেশ্বরের আঙ্গিনায় আমগাছের নীচে ও ছোট ছোট মন্দিরে] যে সকল মূর্ত্তিমধ্যে একটি নটরাজমূর্ত্তি ছিল, সেটি কলিকাতা মিউজিয়মে আসিয়াছে ;—আমি সে দিন উহা দেখিয়া আসিয়াছি—তাহার ছবি না লওয়া থাকিলে, লইবেন। শিল্পের হিসাবেও হয়ত অসুন্দর মূর্ত্তির প্রয়োজন থাকে, উদ্ভবের বা অবনতির পরিচয় দিবার সময়ে তাহার দরকার হয়। ইতিহাসের হিসাবে তাহার প্রয়োজন আরও অধিক। সুতরাং কেবল সুন্দর লইয়াই আমার ঘরকন্না নয়,—তাহাতে যাহা আছে, কবির ভাষায় তৎসম্বন্ধে বলিতে হয়—"তোমরা সবাই ভাল।" পত্র দীর্ঘ হইয়া গেল, অতএব এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিতেছি। নিবেদনমিতি। ভবদীয়—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পুনঃ নিঃ। ভিন্সেণ্ট স্মিথের নূতন গ্রন্থের ২৬৪ পৃষ্ঠার ১৯৯ নং "সরস্বতীমূর্ত্তি" দেখিয়া তৎসম্বন্ধে এই পত্রের উত্তরেই আপনার অভিপ্রায় জানাইবেন। মূর্ত্তিটি আদৌ স্ত্রী-মূর্ত্তি নয়, সরস্বতী হওয়া ত দূরের কথা। ইহা জম্ভলমূর্ত্তি কি না মিলাইয়া দেখুন এবং পরীক্ষার ফল কি হইল, লিখুন।

ক্রোড়পত্র

অভয় পাইয়াছি বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি অনেক দেখিয়াছেন, আপনি আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। যে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তাহাও লিখিয়া জানাইবেন—

১। কীর্ত্তিমুখ কোন্ কোন্ প্রদেশের প্রস্তরমূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন ? উহা কোন্ কোন্ প্রদেশের স্থাপত্যে দেখিয়াছেন ?

২। যেগুলি দেখিয়াছেন, তাহা কোন্ শতাব্দীর নিদর্শন ?

৩। সকল স্থানে সকল যুগে একরূপ দেখিয়াছেন, কি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন type দেখিয়া থাকিলে, কোন্ টাইপ আদি টাইপ ও ক্রমে তাহার কি কি বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন? উহা প্রথমে স্থাপত্যে কিম্বা ভাস্কর্য্যে [প্রতিমায়] ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না? করিয়া থাকিলে তাহার ফল কি? কীর্ত্তিমুখের কথা কোন্ শিল্পশাস্ত্রে পাইয়াছেন; বচন উদ্ধৃত করুন। কীর্ত্তিমুখ সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাস্য আছে; উপরে একটু নমুনা দিলাম। আমার সিদ্ধান্ত বা অভিমত কি তাহা বলিব না, তাহাকে theory বলিয়াই বলিব। আমার theory এই যে, উহা প্রথমে স্থাপত্যের জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছিল; খিলানের মধ্যশীর্ষকে শোভন করিবার জন্য উহা উত্তরকালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে উহা উদ্ভাবিত হয় নাই, উদ্ভাবনার পর উহা ক্রমে নানারূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে দেশে গৌড়ীয় প্রভাব বর্ত্তমান, কেবল সেখানেই উহার নিদর্শন পাওয়া যায়, অন্য প্রদেশে পাওয়া যায় না। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার উপর এই theory দাঁড় করাইয়াছি। আমার দেখার সঙ্গে যদি আপনার দেখাও মিলিয়া যায়, তবে তাহা একটি factরূপে গণ্য করিতে পারা যাইবে। সেই fact ধরিয়া অন্যান্য কথার বিচার চলিতে পারিবে। ইহা fact কি না আগে তাহা স্থির করিয়া দেন, পরে এই fact হইতে কি সিদ্ধান্ত হইবে তাহা আপনা হইতেই নির্ণীত হইতে পারিবে। ইহার জন্য স্কেচ চাই, ফটোতে ইহার অনুসন্ধান চলিতে পারে না। এই কারণে আপনার ন্যায় আমার পক্ষে স্কেচকে একেবারে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। আমার অনুসন্ধান-প্রণালী ঐতিহাসিক; তাহার এই সামান্য নমুনা দিলাম। আমার উত্তরগুলিও লিখিতেছি।

১। কীর্ত্তিমুখ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সকল স্থানে, [বরেন্দ্রে ও মগধে বেশী] দেখা গিয়াছে, দ্বীপপুঞ্জেও দেখা গিয়াছে।

২। খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

৩। ভিন্ন ভিন্ন type দেখা গিয়াছে, স্কেচ দ্বারা দেখান যাইতে পারে। কেবল মুখ, মুখবিবর হইতে দোদুল্যমান মালা ইত্যাদি বিভিন্ন type etc. etc. প্রথমে স্থাপত্যে, পরে প্রতিমার চালির স্থাপত্যে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে—উহা স্থাপত্যেরই অলঙ্কার। কোনও শিল্পশাস্ত্রে পরিচয় পাই নাই। উহা শিল্পীর প্রতিভা হইতে উদ্ভাবিত—সে উদ্ভাবনার আদিক্ষেত্র বরেন্দ্র, ধীমানের জন্মভূমি।

এই সকল উত্তর যদি যথার্থ হয়, তবে শিল্পশাস্ত্রে অমুক্ত স্থাপত্যের এই 'টেকনিক'টি যেখানে যেখানে দেখা যায়, সকল স্থানেই যদি একই যুগের নিদর্শন হয়, তবে সেই যুগে সেই সকল স্থানের মধ্যে শিল্প টেকনিকের সামঞ্জস্য কিরূপে আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয় কি? আমার উত্তরগুলির কোথায় ভুল আছে, তাহা দেখাইয়া দিলেও উপকার হইবে। আমি একা মফঃস্বলে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় অনুসন্ধান করিতেছি, এ সকল কথা স্মরণ করিয়া ইহার উত্তর দানে সাহায্য করিবেন। আমি *a priori* ভাবে চলিতেছি কি না, ইহাতে তাহারও প্রমাণ পাইবেন।

আর একটি আর এক শ্রেণীর প্রশ্ন করিব। J. R. A. S., New Series, Vol. VIII. p. 191, "ওঙ্, গ'মুঙ্ গণপতয়ে নমঃ" ইহার "গ'মুঙ্"টি কি? ২০৮ পৃষ্ঠার Resikesh রেশিকেশঃ যে হৃষীকেশঃ তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ভারতের কোন্ প্রদেশের কোন্ খ্রীষ্টাব্দে হৃষীকেশের এরূপ বর্ণবিন্যাসের প্রমাণ পাইয়াছেন জানাইবেন। আরও একটা প্রশ্ন আছে। শিবশাসন তন্ত্রই বলীদ্বীপের প্রধান তন্ত্র—উহা

ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের কোন্ যুগের গ্রন্থ? এ সকল আলোচনা কোনও গ্রন্থে দেখিয়াছেন কি? দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ কাহাদের উপনিবেশ, এই সকল এবং এইরূপ অগণ্য প্রশ্নের মীমাংসার উপরই তাহা নির্ভর করিতেছে। ইহাকে a priori ভাবের আলোচনা বলা যায় কি?

আমার অনুসন্ধান পদ্ধতির একটু নমুনা দিতে গিয়া আপনাকে কত কথা লিখিতে হইল; পত্রে এ সকল আলোচনা চলে না। ভিন্সেণ্ট স্মিথের ন্যায় যাঁহারা পুরুষ-মূর্ত্তিকে স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া ইতিহাস রচনা করেন, তাঁহাদের সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়াই তাঁহাদের অভিমতকে আমরা বিনা বিচারে গ্রহণ করি। তাঁহারা দ্বীপপুঞ্জকে [অগৌড়ীয়] ভারতবর্ষের পৃথক্ প্রদেশের উপনিবেশ বলায়, সেরূপ বলিবার প্রমাণ কি কি, তাহা *a priori* কি না, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, আমরা তাহাকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে ধরিয়া লইয়া আসিতেছি। দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ যে "অগৌড়ীয়" তাহার প্রমাণ নাই। প্রমাণ যদি আপনার জানা থাকে, আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। এ সকল বিষয়ে আমি অজ্ঞ, সর্ব্বদা উপদেশের ও শিক্ষার প্রার্থনা রাখি। শিল্পসাদৃশ্য সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট স্মিথ একটি পাদটীকায় একটা কথা লিখিয়াছেন—পশ্চিম-ভারতের গুহার মূর্ত্তির সঙ্গে যবদ্বীপের মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে বলিয়া ফর্গসন্ একটা অভিমত প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রচলিত মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্মিথ বলেন—The differences rather than the resemblances impress my mind. এ কথা কি সত্য? সত্য হইলে ফর্গসনের সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া যায়; মিথ্যা হইলেও জিজ্ঞাস্য,—পশ্চিম-ভারতের যে সকল মূর্ত্তির সঙ্গে মিল আছে, সে সকল কোন্ কোন্ যুগের কোন্ মূর্ত্তি,—তাহা কোন্ শিল্পের নিদর্শন? এ সকল বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে *a priori* সিদ্ধান্তের

আতিশয্য। আমি বরং প্রমাণের অনুসন্ধান করিতেছি—প্রচলিত মতে সংশয় প্রকাশ করিতেছি—সংশয়চ্ছেদের আশায় আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি।

ইত্যলম্—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

ঘোড়ামারা, রাজসাহী

প্রীতিনমস্কার নিবেদন— ২।৬।১২ইং

পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। অতি শীঘ্র এখানে আসিতেছেন জানিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। সম্প্রতি এখানে আসিবার পথ একটু ক্লেশকর, আর তিন সপ্তাহ মধ্যে ষ্টীমার হয় ত সহরের নীচে আসিবে। সেই সময়ে আসিলে কষ্ট হইবে না, এখন আসিতে হইলে বড় পথক্লেশ ঘটিবে। আমি আগামী কল্য হইতে দিন কয়েক বগুড়ায় থাকিব এবং ৮ জুন হইতে আবার এখানে থাকিব জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিলাম।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর পত্রে লিখা অসম্ভব। কাজেই উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। সাগরিকায় ক্রমশঃ সকল কথাই লিখিতেছি। ভারত-দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের উপনিবেশ, তাহার অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা লিখিতেছি। তদ্দ্বারা প্রদেশটি স্থির হইবার পর শিল্পেও তাহার কি কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা লিখিব। আর আর সিদ্ধান্ত আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। বরেন্দ্রে যাহার উদ্ভব, মগধে ও উৎকলে তাহারই বিকাশ—এ পর্য্যন্ত স্মিথও এবার স্বীকার করিয়াছেন। তাহারই পরিণতি যবদ্বীপে, ইহাই আমার বক্তব্য। এ পর্য্যন্ত যে সকল ছবি বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছি। তাহাতে কি কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একে একে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

আপনি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতিকে একটু অনুযোগ দিয়াছেন। সমিতি অনেকের, আমার একার নয়। যাহা বহু ক্লেশে সংগৃহীত হইতেছে, তাহার প্রথম বিবরণ সমিতি লিখিবেন, এরূপ নিয়ম নূতন নিয়ম নয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ। সমিতি যাহা লিখিবেন, আপনারা তাহার সমালোচনা করিতে পারিবেন। আর যদি এখনই তৎসম্বন্ধে লিখিতে চান, সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া লিখুন। ইহা আমার বিবেচনায় অসঙ্গত প্রস্তাব বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, আপনাদের ন্যায় মনীষিগণের তিরস্কারও আমাদের পক্ষে পুষ্পাঞ্জলি। আমাদের চেষ্টা শিল্প-সৌন্দর্য্য সমালোচনার চেষ্টা নয়, ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলনের চেষ্টা। মূর্ত্তিগুলি যে ভাবসম্পদের বাহ্যস্ফূর্ত্তি, সেই ভাবসম্পদ্ কোন্ সময়ে কিরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান চেষ্টাই আমাদিগের প্রধান চেষ্টা।

Iconography সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর গোপাল ভট্টের হরিভক্তি-নিবন্ধই শেষ নিবন্ধ—সনাতন গোস্বামী উহার টীকা লিখিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন টীকা-সংযুক্ত আর কোনও নিবন্ধ দেখি নাই। আমি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ছাপার পুথিতে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। সনাতনের টীকাটি বড় সারগর্ভ—অধ্যয়নে আনন্দ লাভ করা যায়।

আপনার প্রেরিত ফটো অদ্যও পাইলাম না। বগুড়া যাইতে ব্যস্ত আছি বলিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিতে পারিলাম না,—ক্ষমা করিবেন।

বরেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি বৃহৎ বলিয়া নানা স্থানে পড়িয়া আছে, সংগ্রহ করা হয় নাই—যথাস্থানে গিয়া দেখিতে হয়। যাহা এখানে আনা হইয়াছে, তাহা অল্প, তাহাতে কেবল *type* সংগ্রহের চেষ্টাই অধিক। তন্মধ্যে সকল *type*-এরই কিছু কিছু নমুনা আছে। অলমতিবিস্তরেণ।

ভবদীয়—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬৫*

রমেশচন্দ্র দত্ত

১৮৪৮—১৯০৯

রমেশচন্দ্র দত্ত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

বংশ-পরিচয় ; জন্ম

কলিকাতা, রামবাগান-নিবাসী দত্ত-পরিবার বাণীসেবকরূপে সুবিখ্যাত। এই পরিবারের নীলমণি বা নীলু দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কলিকাতার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুচ্ছুদ্দির কাজ করিতেন। শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ বাহাদুর সর্ব্বদাই তাঁহার ইংরেজী-জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। নীলমণি দত্তের তিন পুত্র—রসময়, হরিশ ও পীতাম্বর। কনিষ্ঠ পীতাম্বরই (জন্ম ১৭৯৯) রমেশচন্দ্রের পিতামহ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র (জন্ম ১ মার্চ ১৮১৮) রমেশচন্দ্রের পিতা।

১৮৪৮ সনের ১৩ই আগস্ট কৃষ্ণ সিংহের গলির (বর্ত্তমান বেথুন রো-র) অন্তর্গত কালীমন্দিরের পূর্ব্বদিক্-সংলগ্ন গৃহে মাতুলালয়ে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন; সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে দেশ-দেশান্তরে গমন করিতে হইত। বালক রমেশচন্দ্র পিতার সহিত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কখন নৌকায়, কখন বা পাল্কীতে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তখন রেল ছিল না। তাঁহার শৈশবের অধিকাংশ সময় বীরভূম, কুমারখালি, ভাগলপুর, বহরমপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে অতিবাহিত হইয়াছিল। বারংবার স্থান-পরিবর্ত্তনে পুত্রগণের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া ঈশানচন্দ্র পরিবারবর্গকে কলিকাতায় রাখাই স্থির করেন। রমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পরে, হেয়ার স্কুল) ভর্ত্তি হন। ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মাতা থাকমণি দেবীর মৃত্যু হয় (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯)। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতাও পরলোকগমন করেন, (৮ মে ১৮৬১)। খুল্লতাত

শশীচন্দ্র (মৃত্যু ৩০-১২-৮৫) রমেশচন্দ্রের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন সেকালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজী লেখক—*Reminiscences of a Kerani's Life, The Times of Yore, Vision of Sumeru, Shunkar* প্রভৃতির লেখক। রমেশচন্দ্র খুল্লতাতের নিকট হইতে দুইটি গুণ—চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহিত্যিক গৌরবস্পৃহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অগ্রজ যোগেশচন্দ্র মধ্যম ভ্রাতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"Two very important lessons my brother learned from our uncle—independence of character and thirst for fame."

বিবাহ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

রমেশচন্দ্র যখন এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় (১৬ জানুয়ারি ১৮৬৪)। পাত্রী—মাতঙ্গিনী ওরফে মোহিনী বসুজা, সিমুলিয়া-নিবাসী নবগোপাল বসুর মধ্যমা কন্যা। রমেশচন্দ্রের বিবাহিত জীবনের ফল—পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র, শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত।

১৮৬৪ সনে রমেশচন্দ্র কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ. এ পরীক্ষা দিয়া সকল উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, তিনি পরীক্ষার ফলের উপর এনট্রান্স পরীক্ষায় সেকেণ্ড গ্রেড জুনিয়র স্কলারশিপ ও এফ. এ. পরীক্ষায় সিনিয়র স্কলারশিপ পাইয়াছিলেন।

সিবিল সার্ব্বিস ও ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা

প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে রমেশচন্দ্র সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমনের সঙ্কল্প করেন। তাঁহার পিতামহ বিলাতযাত্রার বিরোধী ছিলেন; সমুদ্রযাত্রা করিলে তখনকার দিনে সমাজের অশেষ নির্যাতন সহিতে হইত। এই কারণে রমেশচন্দ্র গোপনে পলায়ন করাই সাব্যস্ত করেন। এ কথা জানিতেন কেবল তাঁহার অগ্রজ যোগেশচন্দ্র; তিনি বাটী হইতে গোপনে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দিয়া ভ্রাতার বিলাত-গমনে সহায়তা করিয়াছিলেন।*

* রমেশচন্দ্র উত্তরকালে তাঁহার 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাসখানি অগ্রজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ :—"প্রিয় ভ্রাতঃ, এই সংসার-স্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ভালবাসা, আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাঙ্ক্ষায় যখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে প্রবাসে জীবনের অনন্ত চেষ্টা পরম্পরায় যখন শ্রান্ত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহ্যাড়ম্বরে যখন বিরক্ত হই, তখন ঐ আদর্শরূপ নির্ম্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তিলাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানে না, এ কথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই; ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই, এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে। এই ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত, অনাদৃত!

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর! জীবনের প্রথম ও প্রিয়তম সুহৃদ্! ত্রিংশ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তিলাভ করিয়াছে, অদ্য সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল।"

১৮৬৮ সনের ৩রা মার্চ প্রাতে স্বদেশের নিকট বিদায় লইয়া, আত্মীয়-স্বজনগণের অগোচরে রমেশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন দুই বন্ধু—বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পথিমধ্যে মাল্টা-দ্বীপ দর্শনের পর রমেশচন্দ্র তাঁহার তৎকালীন মনোভাব এই কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

সুন্দর বসন্ত

সুন্দর বসন্তকান্তি শোভিল ধরায়,
নিরানন্দ প্রবাসীর কি সুখ তাহায় !
মাতৃভূমি পরিহরি বিদেশ ভ্রমণ,
অনন্ত সমুদ্র-বক্ষে করি পর্য্যটন।
চারি দিকে উর্ম্মিরাশি ভীষণ কল্লোলে,
উল্লাসে প্রমত্ত যেন আস্ফালিয়া চলে।
প্রবল সাগর-বায়ু উচ্চ রবে ধায়,
প্রবাসীর কর্ণে যেন দুখ-গান গায়।

সুন্দর বসন্ত যথা জগতে পশিছে,
জীবন-বসন্ত মম যৌবনে উদিছে !
ঐ শোন যশোদেবী ভৈরব নিস্বনে,
ডাকে মোরে, যুঝিবারে যশের কারণে।
সময়-সময়ে কেন ভীরু চিন্তা করি,
দূরে যাক্ বিষণ্নতা,—চিন্তা—অশ্রুবারি।
নির্ভয়ে যুঝিব আমি যশের কারণ,
নাহি খেদ, হয় যদি শরীর পতন !

৪ এপ্রিল ১৮৬৮—'ইয়োরোপে তিন বৎসর'।

পরবর্ত্তী ১১ এপ্রিল রমেশচন্দ্র লণ্ডনে উপস্থিত হন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবেশ করেন। সে-সময়ে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষার নিয়ম ছিল—পরীক্ষার্থীর বয়স ১৭ বৎসরের উর্দ্ধ ও ২১ বৎসরের ন্যূন হওয়া চাই। রমেশচন্দ্রের বয়স তখন ১৯ ; এই কারণে প্রথম বৎসর তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ সনের জুন মাসে সিবিল সার্ব্বিস প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৩২৩। ইহার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ জনকে নির্ব্বাচিত করিবার কথা ; উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে রমেশচন্দ্র তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৩ সনে এই প্রতিযোগিতা-

পরীক্ষার সূচনা হইতে রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে, বাঙালীর মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ১৮৬৩ সনে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

বিলাতের *The Times* পত্রে ১৮৬৯ সনের সিবিল সার্ব্বিস প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার ফল এইরূপ প্রকাশিত হয় :—

The following are the successful candidates at the recent open competition for the Civil Service of India, provided they pass a medical examination, to be held in London in the course of the ensuing week :—

Order of Merit	Names	Total No. of Marks.
1	Johnstone, Pierce De Lacy Henry	2,188
2	Smith, Vincent Arthur	1,802
3	Dutt, Romesh Chunder	1,737
14	Gupta, Bihari Lal	1,446
38	Banerjea, Surendra Nath	1,125
39	Thakur, Sripad Babaji	1,123

পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া রমেশচন্দ্র অগ্রজকে যে সুদীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

A year of hard study has passed and we at last appeared at the Open Competition of 1869. I need scarcely tell you that never before did we study so hard and so unremittedly as during the past year. We attended classes of the London University College, and also took private lessons from some of the Professors of the College. I shall never forget the kindness which we have received from them ; they have been more like friends than teachers to us. I wish specially to mention the names of two gentlemen to whome we are under deed obligation. I have never known a kinder, a more genuine and true-hearted Englishman than Mr. Henry Morley, Professor of English Literature. We attended his classes, we took Private lessons from him we shared his hospitality, and we benifited by his kind, friendly, and ever-helpful advice....Not less are we indebted to Dr. Theodore

Goldstucker, a profound German scholar, whose Sanskrit class we attended in the University College....

We passed our days in the University College, either in the classrooms or in the library. In the evening we returned to our lodging-houses, took our dinner, went out for stroll, returned and took a cup of tea, and then resumed our studies which we kept up as long as we could. And in the morning, after a hasty bath and breakfast, we went to the College again.

At last the time for the Open Competition arrived. It was impossible to form any short of conjecture what the result in our case would be, for over three huudred English students appeared in the examination, and the first fifty would be selected....

The examination, one of the stiffest in the world, lasted for a month or more. The subjects are various, but no one is compelled to take all subjects or any particular subject ; each candidate takes what subjects he pleases, and candidates are judged by the aggregate marks they obtain in the subjects they take up. I had taken only five subjects—*i.e.* English (including History and Composition), Mathematics, Mental Philosophy, Natural Philosophy, and Sanskrit.

On each subject there is a paper examination and a *viva voce* examination....When the result was out I was delighted to find that among about 325 canditates I stood second in order of merit in English, and had scored 420 marks out of 500.

In Sanskrit, Mr. Cowell, formerly of the Sanskrit College, Calcutta, was our examiner....I scored higher marks than they [two Hindu fellow candidates] did,...I scored 480 out of 500 in Sanskrit....I was not very well up in Higher Mathematics, and did not score high marks. In Mental Philosophy I got fairly good marks.... I got good marks in Natural Philosophy on the whole.

We had to wait over a month before the result was out. It was a time of anxious suspense. When the result was out I found I had not only been selected, but that I stood third in the order of merit. I cannot describe the transport which I felt on that eventful day. My friends, too, had passed. The great

undertaking on which we had staked everything in life had succeeded ; the future of our life was determind, and a path, we ventured to hope, had been opened for our young countrymen.

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মেধাবী রমেশচন্দ্র ১৮৭১ সনে সিবিল সার্ব্বিসের শেষ পরীক্ষায় ৪৮ জন নির্ব্বাচিত ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন,—ইহা কম গৌরবের কথা নহে। আমরা এই পরীক্ষার ফল ৫ জুলাই ১৮৭১ তারিখের বিলাতী 'টাইম্‌স' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Civil Service of India.—The following are the names of the gentlemen selected in 1869 who, after two years' training in this country, have passed the final examination :—

		Marks
1.	Smith, Vincent Arthur, North-West provinces, Punjab, and Oude	... 3,018
2.	Dutt, Romesh Chunder, Bengal (Lower Provinces)	... 2,955
3.	Johnstone, Pierce De Lacy Henry, North-West Provinces, Punjab, and Oude	... 2,867
4.	Gupta, Bihari Lal, Bengal (Lower Provinces)	... 2,828
20.	Banerjea, Surendra Nath, Bengal (Lower Provinces)	... 1,988
...	...	...

The following prizes were awarded at the different periodical examinations and at the final examination :—Mr. V. A. Smith, Indian Law, 10*l.* ; Sanskrit, 10*l.* ; Persian, 10*l.* ; Mr. Dutt, Bengali, 10*l.* and 50*l.* ; Political Economy, 10*l.* ; Sanskrit, 10*l.* ; Mr. Johnstone, Sanskrit, 10*l.* ; Mr. Gupta, Bengali, 10*l.*

রমেশচন্দ্র বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৭ জুন ১৮৭১ তারিখের বিলাতী 'টাইম্‌স' পত্রে প্রকাশ :—

Calls to the Bar : The under-mentioned gentlemen were yesterday called to the degree of Barrister-at-Law ;—

By the Hon. Society of the Middle Temple.
Romesh Chunder Dutt. Bihari Lal Gupta....

সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশ-প্রত্যাগমনের প্রাক্‌কালে রমেশচন্দ্র অগ্রজকে একখানি পত্র লেখেন। উহা এইরূপ :—

I have now done my three years' work in England—I have gone throuh the four "further examinations" which we have to pass in Law, Political Economy, and History and Languages of India, after being selected at the Open Competition. I have been called to the Bar after keeping twelve terms at the Middle Temple. I have seen different places of interest in England, and have, I hope, learnt some lessons that will be useful to me in life from the everyday life and manners, the characters and virtues, of Englishmen. We in India have an ancient and noble civilisation, but nevertheless we have much to learn from modern civilisation. And I hope, as we become more familiar with Europe and with England, we shall adopt some great virtues and some noble institutions which are conspicuous in Europe in the present day, and which we need so much. Our children's children will live to see the day when India will take her place among the nations of the earth in manufacturing industry and commercial enterprise, in representative institutions, and in real social advancement. May that day dawn early for India.

জীবনের প্রথম ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া রমেশচন্দ্র বন্ধুদ্বয়ের সহিত ১৮৭১ সনে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে, অক্টোবর মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে মল্লিক-পরিবারের সাতপুকুরের উদ্যানে একটি বিরাট্‌ সভার অনুষ্ঠান হয়।* উদ্বোধন-সঙ্গীতের কয়েক পংক্তি এইরূপ :—

* S. N. Banerjea : *A Nation in Making*. p. 26.

এস এস বন্ধুগণ! তোমরা ভারতমাতার হৃদয়নন্দন। এসেছি আমরা সব, করিতে আনন্দোৎসব, আলিঙ্গন করি তায় করি অভ্যর্থন।

উত্তরপাড়া হিতকারী সভাও তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রমেশচন্দ্র বলেন :—

I am not aware that we have done anything for our country. If indeed we have done anything to merit your approbation, we shall consider ourselves amply rewarded if my countrymen were to follow our example. I do not indeed wish you to slavishly imitate everything English, but I do think that there are many things estimable in English manners which we may with advantage introduce into our own social institutions. I would therefore beg of you, gentlemen, to try your best to send as many young men as possible to England, for there they would imbibe ideas of liberty and equality between men and women. (*The Indian Mirror* for 23 Oct. 1871.)

সরকারী চাকুরী

রমেশচন্দ্র কলিকাতা পৌঁছিয়া অচিরাৎ সরকারী কর্ম্মে যোগদান করেন। তাঁহার রাজকার্য্যের ইতিহাস সরকারী বিবরণের সাহায্যে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি :—

২৪-পরগণা, আলিপুর	...	অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর	... ২৮ সেপ্টেম্বর	১৮৭১
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ	...	ঐ	... ৭ নবেম্বর	১৮৭২
বনগ্রাম, নদীয়া	...	ঐ	... ১৭ ফেব্রুয়ারি	১৮৭৩
মেহেরপুর, নদীয়া	...	ঐ	... ৮ মে	১৮৭৪
বনগ্রাম, নদীয়া	...	ঐ	... ১০ নবেম্বর	১৮৭৪
নদীয়া	...	ঐ	... ৩১ আগষ্ট	১৮৭৬

দক্ষিণ শাহাবাজপুর, বরিশাল	অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর	২৯ নবেম্বর	১৮৭৬
ত্রিপুরা	ঐ	১৩ জুলাই	১৮৭৮
বর্দ্ধমান	ঐ	১২ ডিসেম্বর	১৮৭৮
বাঁকুড়া	ঐ	১ মার্চ	১৮৮০
”	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	১৬ সেপ্টেম্বর	১৮৮১
”	অ্যা. ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর	১৫ ডিসেম্বর	১৮৮১
”	জয়েণ্ট ম্যা. ও ডে. কলেক্টর (২য় শ্রেণী)	১ জুন	১৮৮২
বালেশ্বর	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	২৭ জুলাই	১৮৮২
”	জ. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর	২৪ অক্টোবর	১৮৮২
বাখরগঞ্জ	ঐ	৬ ফেব্রুয়ারি	১৮৮৩
”	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	২৯ মার্চ	১৮৮৩
”	জ. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর	২৮ ডিসেম্বর	১৮৮৩
”	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	২৬ ফেব্রুয়ারী	১৮৮৪
”	জ. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর (১ম শ্রেণী)	১৩ অক্টোবর	১৮৮৪

(ছুটি : ১৫ মার্চ ১৮৮৫ হইতে দুই বৎসর)

পাবনা	জ. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর	১৫ মার্চ	১৮৮৭
”	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	১৮ মার্চ	১৮৮৭
ময়মনসিংহ	ঐ	৪ অক্টোবর	১৮৮৭
”	ঐ (৩য় শ্রেণী)	৬ মার্চ	১৮৮৮
”	ঐ (২য় শ্রেণী)	২৯ অক্টোবর	১৮৮৯
বর্দ্ধমান	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	১৬ এপ্রিল	১৮৯০
দিনাজপুর	ঐ (২য় শ্রেণী)	২ ডিসেম্বর	১৮৯০
মেদিনীপুর	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	২৫ এপ্রিল	১৮৯১
”	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৮ ডিসেম্বর	১৮৯১

(ছুটি : ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ হইতে ১ বৎসর, ২ মাস, ১৬ দিন)

(ছুটিতে)	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (১ম শ্রেণী)	১৮ মার্চ	১৮৯৩

(ছুটি : ১৭ নবেম্বর ১৮৯৩ হইতে)

বর্দ্ধমান	... ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর	... ২৬ নবেম্বর ১৮৯৩
"	... কমিশনর, বর্দ্ধমান বিভাগ (অস্থায়ী)	... ১৬ এপ্রিল ১৮৯৪
হুগলী	... ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর	... ১৭ এপ্রিল ১৮৯৫
উড়িষ্যা	... কমিশনর ও করদ মহলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (অস্থায়ী)	... ৬ অক্টোবর ১৮৯৫

(ছুটি : ১৭ জানুয়ারি ১৮৯৭ হইতে।
২৬-১-৯৭ হইতে ১০ মাস)*

বঙ্গীয় সরকার ১৮৯২ সনে তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধি দান ও ইহার তিন বৎসর পরে (জানুয়ারি ১৮৯৫) বেঙ্গল লেজিসলেটিব কাউন্সিলের সদস্য-পদে মনোনীত করিয়াছিলেন।

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ

বাঙালীর মধ্যে রমেশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম কমিশনরের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে যখন তাঁহার নিয়োগের সংবাদ প্রচরিত হয়, তখন কালা আদমির এই উচ্চ পদ-প্রাপ্তিতে মহল-বিশেষে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্ষুব্ধ 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন :—

> Meanwhile it must be pleasant for the European Civilians who are placed in subordination to the first Native Commissioner in India. Perhaps they are wondering how Sir Charles Elliott himself would have relished the position in his younger days.

'ইংলিশম্যানে'র গাত্রদাহ লক্ষ্য করিয়া 'হিতবাদী'তে

* *History of Services of Gazetted and other Officers serving under Government of Bengal*—Corrected up to 1st July 1897, pp. 169-70.

"সিভিলিয়ানদের প্রতি ইংলিশম্যানের উপদেশ" নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি :—

১

হলো কালা আদমি কমিশনার
ঢাকো লাজে বদন ঢাকো।
এ যে সাদা প্রাণে লাগ্‌চে দাগা
কি সুখে আর জীবন রাখো?

৪

তোমরা মোরনিং পর, রোদন কর
এমন চাকরি ক'রো নাকো।
এখন দলে দলে সবাই মিলে
"রেজিগ্‌নেশন্" পত্র লেখো॥

৮

যাদের দেখ্‌লে মনে ঘৃণা কর
"ব্লাক নিগার" ব'লে ডাকো।
(হবে) তাদের নীচের কর্ম্মচারী
এ অপমান সয়ো নাকো॥

৯

কালোর কেবল টাকা ভাল
অন্য ভাল দেখো নাকো।
কাল গরুর দুধটি সাদা
এইটি শুধু মনে রেখো॥

রমেশচন্দ্র এক বৎসর বর্দ্ধমানের অস্থায়ী কমিশনরের কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এক দিনের তরেও অধীন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীরা তাঁহার ব্যবহারে রুষ্ট হন নাই। ১৮৯৫ সনের অক্টোবর মাসে তিনি উড়িষ্যার কমিশনর হন, কিন্তু এবারও অস্থায়ী ভাবে। তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছিল; তিনি ছুটিতে বিলাতযাত্রার—এমন কি, পেনশন লইবার সঙ্কল্পও মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। ২৪ মে ১৮৯৬ তারিখে তিনি পুরী হইতে অগ্রজকে লেখেন :—

> ...my health is breaking down. Since returning from England in 1893 I had malaria in 1894, had dyspepsia and sleeplessness in 1895, and am just now down with a return of rheumatism. I *must* go to England at the end of this year, and very likely *never return to service again.*

১৮৯৭ সনের জানুয়ারি মাসে, ১০ মাসের ছুটি লইয়া, রমেশচন্দ্র বিলাতযাত্রা করেন। ছুটি ফুরাইলে আর তিনি সরকারী কর্ম্মে যোগদান করেন নাই,—বৎসরে হাজার পাউণ্ড পেনশনে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যোগ্যতা ও সুনামের সহিত দীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইচ্ছা করিলে, নিয়মানুসারে আরও ৯ বৎসর থাকিতে পারিতেন। অগ্রজকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে সরকারী চাকুরীর প্রতি তাঁহার প্রকৃত মনোভাব কতকটা পরিস্ফুট হইবে:—

I have received yours of the 1st August. I know I am risking something by supporting the Congress party in one of their proposals, *viz*, the separation of the Judicial and Executive Services. The "powers that be" will not be pleased with me for this, and they may even go so far as to stop my expected promotion to a *pucca* commissionership, giving some false reasons for it. But I am willing to risk so far. It does not matter very much to me whether during the next three years of my service they keep me as a first-grade Collector, which I am, or make me a Commissioner. On the other hand, I have felt an intense joy, not merely in serving the interests of my country, but also in making my power felt by the Indian Government. They have treated me on the whole fairly, but not with any special favour. The doors of the Secretariat have been kept closed to me, I have not been emplyed for a day in any special post, and I have seen my juniors appointed as Secretary to the Government, as Senior Secretary to the Board, as Inspector-General of Police, and in other special and highly paid appointments. I do not complain of this, but I only state these facts to show that if Government is not disposed to repose any real trust and confidence in me, I am free to utilise my powers and abilities, such as they are, to the benefit of my country in other ways. And Government will feel this when they see

co-operating with Sir Richard Garth and Mr. Reynolds to press for a reform in the system of our administration. (Germany. 24 Aug. 1893.)

দেশ-সেবা

দুর্লভ উচ্চ রাজপদের মোহ অতিক্রম করিয়া যে-উদ্দেশ্যে রমেশচন্দ্র সুদূর প্রবাস-যাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা প্রধানতঃ বাগ্‌দেবীর সেবা, এবং ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জনের জন্য স্বাধীনভাবে বিলাতে আন্দোলন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বিলাতে পৌঁছিয়া তিনি যখন ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণে ব্যস্ত, সেই সময়ে কন্যা সরলাকে লিখিয়াছিলেন :—

There is little chance of my going back to India this year. I must really make a prolonged attempt in the writing line, and see if I can do something here...Official life has no special charms for me if I can succeed in a more brilliant line, and it will not be for want of steady endeavour if I fail. (30 Apr. 1897.)

লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপনা।—রমেশচন্দ্র একবার তাঁহার মনের বাসনা অকপটে অগ্রজকে পত্রে জানাইয়াছিলেন ; উহা এইরূপ :—

The dream of our passing the latter days of our life in England is one which comes to me as often probably as to you. I did not think of an appointment in the India Council, but of a readership in Indian History or in Sanskrit, in Cambridge, Oxford, or London, if any "History of India" makes a name for itself. Anything which will give me a position and some little income over and above my pension, and will enable me to organise an Indian party to represent Indians' rights in England and Parliament. But it is foolish to think of these things now. (Mymensingh, 28 Sep. 1898.)

বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার দীর্ঘকাল-পুষ্ট বাসনা আকস্মিকভাবে কথঞ্চিৎ ফলবতী হইয়াছিল। ১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৭ তারিখে সহসা একখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। পত্রে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের কাউন্সিল তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য ভারতেতিহাসের লেক্‌চারার-পদে বরণ করিবার সঙ্কল্প জানাইয়াছেন। রমেশচন্দ্র ধন্যবাদের সহিত তাঁহার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কন্যা বিমলাকে লেখেন :—

> **You will be glad to learn that the London University College has created a chair in Indian History, and has appointed me to that chair. The appointment carries no pay, and I shall only get the fees which the students pay for joining my class. But the appointment is a high honour ; it gives me honourable and congenial occupation, and it also gives me a sort of status and position in this country (London, 16 Dec. 1897.)**

রমেশচন্দ্র লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি নির্দ্দেশ দিতেছি :—

(১) ২০ জানুয়ারী ১৮৯৮ : বিষয়—Study of Indian History. বিনা দক্ষিণায় সর্ব্বসাধারণের জন্য।

২৭ জানুয়ারি ১৮৯৮ হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার, ১০টি বক্তৃতা : বিষয়—The History, Civilization and Religion of the Ancient Hindus. বক্তৃতা-সমষ্টির জন্য মোট প্রবেশ-দক্ষিণা ১ পাউণ্ড ১ শিলিং।

২৬ অক্টোবর ১৮৯৮ হইতে প্রতি বুধ ও শুক্রবার, ১৫টি বক্তৃতা : বিষয়—History, Civilization, Religion and Literature of the Ancient Hindus. দক্ষিণা পূর্ব্ববৎ।

(২) ১৬ অক্টোবর ১৮৯৯ : বিষয়— The Epic Poetry of Ancient India. বিনা-দক্ষিণায় সাধারণের জন্য।

১৯ অক্টোবর ১৮৯৯ হইতে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার, ৬টি বক্তৃতা : বিষয়—The Epics and the Epic Age of India. দক্ষিণা পূর্ব্ববৎ।

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন।—নিজের সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, রমেশচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। তিনি অগ্রজকে লিখিতেছেন :—

I am struggling to get some literary fame by my translation of the 'Mahabharata,' though the modern style of English poetry is Greek to me. I am struggling to make myself felt as an authority on Indian subjects, though as yet the journals and newspapers will scarcely condescend to publish what I write ; and I am struggling to make my lactures at the University College a success,...I am writing all this not from mock modesty, but as I feel. It is a frightfully uphill work to establish your name, and get a footing in the crowded and unsympathetic world of London, especially if your speciality is Indian subjects which tire Englishmen to death. However, I will see to the end of this struggle, and will even learn public-speaking at this fag-end of my life—for that is the only way to influence masses of Englishmen on politics. It is worth while making an arduous and manly struggle, if only to find out if distinction and fame are or are not possible. (London, 13 Jan. 1898.)

রমেশচন্দ্র একখানি পত্রে আজীবন-সুহৃৎ বিহারীলাল গুপ্তকে লিখিয়াছিলেন :—

In the first place, my criticisms after I have retired from the service dó not in the least degree injure the prospects of other Bengalis in the service ; on the contrary, I believe they improve their chances. A little provocation does more good than eternal attempts at conciliation.......

Secondly, I know the India Office. Considerations of race are paramount there ; they want to shut us out, not because we are critics, but because we are natives, and their policy is rule by

Englishmen. They have matured this policy in twenty years—they have a vast mass of secret minutes in their archives on the subject. Licking the dust off their feet will not move them from this policy ; unsparing criticism and presistent fighting can, and will do it. Englishmen understand fighting, and they will yield to presistent fighting—not to begging.

Thirdly, It is admitted perhaps that my Land Revenue agitation has done some good. It has forced Government to correct past mistakes, to revise assessments in Bambay, Madras, and the Central Provinces, and to frame rules of remissions and suspensions when crops fail. And our personal interests sink into insignificance compard with these results,

রমেশচন্দ্র স্বদেশের ইতিহাস ও স্বদেশের সাহিত্যকে পাশ্চাত্য দেশে পরিচিত করিবার জন্য বিলাতে যে-সকল ইংরেজী গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, অন্যত্র তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতবাসীর হিতার্থে তিনি যে-সকল আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার *Speeches and Papers* (2 vols.) ও জে. এন. গুপ্ত-লিখিত *Life and Work of Romesh Chunder Dutt C. I. E.* (London 1911) গ্রন্থে মিলিবে। আমরা বর্ত্তমান পুস্তকে রমেশচন্দ্রের যে-সকল পত্র বা পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

কংগ্রেসে নেতৃত্ব।—বিলাতে অবস্থানকালে, ১৮৯৯ সনের শেষ ভাগে রমেশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির ১৫শ বার্ষিক অধিবেশনে নেতৃত্ব করিবার জন্য আহূত হন। এই নির্ব্বাচন সমুচিত হইয়াছিল। 'ইণ্ডিয়ান নেশন্' লেখেন :—

A better selection could not be made. By his learning, experience, position, sobriety and soundness of judgment, he seems to be specially marked out for the honour which it has been decided to confer on him. (2 Oct. 1899)

লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়—২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৯ তারিখে। অধিবেশনের প্রথম দিন সভাপতি-রূপে রমেশচন্দ্র যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার কয়েক পংক্তি এইরূপ :—

...it must be admitted, and it is no disrespect to the Indian Civil Service to say it, that that service represents only the official view of India questions, and does not and cannot represent the people's views. There are two sides to every question, and it is absolutely necessary for the purpose of good government and of just administration that not only the official view, but the people's view on every question should be represented and heard...National Congress is the only body in India which seeks to represent the views and aspirations of the people of India as a whole in all large and important, and if I may use the word, Imperial questions of administration. Therefore, this National Congress is doing a service to the Government the value of which cannot be over-estimated....It is a gain to the administration to know what we feel, and what we think, and what we desire,—though our demands cannot always be conceded.

স্বদেশে সম্বর্দ্ধনা।—কংগ্রেসের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়া কলিকাতায় ফিরিলে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব রাজবাটিতে ৬ জানুয়ারি ১৯০০ তারিখে একটি সভার আয়োজন করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সভার বিবরণ উদ্ধৃত হইল :—

সম্মান সভা।...শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই বৎসরের জন্য আমাদের নেতা, কারণ তিনি কন্‌গ্রেসের সভাপতি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর কোন বাঙ্গালী বিভাগীয় কমিশনর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আমাদের অগ্রণী, কারণ তিনি বিলাতে থাকিয়া ভারতবাসীর দুঃখ-দরিদ্রের কথা অভাব-অভিযোগের কথা রাজার জাতি ইংরেজের কর্ণগোচর করিবার পক্ষে

বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সেই রমেশচন্দ্রর বাঙ্গালী আদরের; তাঁহার সম্মান করা কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যানুরোধে রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর নিজ গৃহে গত শনিবার অপরাহ্নে একটি আপ্যায়ন-সমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাগৃহে নগরের বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বোর্ডের মেম্বর মাননীয় ওল্ডহ্যাম সাহেব, মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রায় বদরীদাস মকিম বাহাদুর, মান্যবর রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর, মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রমেশবাবু সভাস্থ হইলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার গলায় স্বর্ণ রৌপ্য খচিত মালা পরাইয়া দিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নৃত্যগীতের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রথমে

ভুবনতিলোক যেই, রাখে মাতৃভূমি মান।
মাতৃভাষে মনোল্লাসে করি তাঁর গুণগান ॥
বেদ-বিধি সুপণ্ডিত, কীর্ত্তি ধরা বিরাজিত,
সরল মার্জ্জিত চিত্ত পরহিত ধ্যান জ্ঞান ॥
শাসনে করুণা যার, জন্মভূমে সুবিস্তার,
প্রজাগণ দুঃখভার-হরণে অর্পিত প্রাণ ॥
স্বদেশ-বৎসল আসি, মাতালে স্বদেশবাসী,
সবে প্রীতি-ফুলরাশি, "রমেশে" করে প্রদান ॥

এই গীতটি সুরতানলয় সংযোগে গীত হয়, পরে বাঙ্গালার নটকুল-চূড়ামণি নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই

১

সবিনয় মহোদয় করি নিবেদন,
চিরদিন আছে রীতি, নটে গায় স্তুতি-গীতি,

পূর্বনীতি অনুসারে করিব বন্দন,—
নিজগুণে করিবেন ত্রুটির মার্জন।

২

যেই বংশে বরদাত্রী দেবী সরস্বতী,
নির্মল উজ্জ্বল ধার, ঢালিছেন বিদ্যাভার,
সেই বংশে বংশধর তুমি মহামতি,
উন্নত হৃদয়-বলে সাধিলে উন্নতি ॥

৩

মাতৃভূমিবৎসল হে আদর্শ মানব,
মার্জ্জিত চরিত্র-বলে, স্থাপিয়াছ জন-স্থলে
বিদেশী হৃদয় মাঝে স্বদেশ গৌরব,
তব প্রতিভায় বৃদ্ধি ভাষার বৈভব ॥

৪

রাজ্যেশ্বরী উচ্চ-পদে করিল স্থাপন,
তায় সনে দয়া মিশি, শান্তিপূর্ণ হ'ল দিশি,
ভারত-বান্ধব তুমি প্রজার জীবন,—
দীন নট-উপহার করহ গ্রহণ।

পদ্যটি পাঠ করিয়া রমেশবাবুকে বরণ করেন। তৎপরে দেড় ঘণ্টাকাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ নানা প্রকারের নাচগানে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই উপলক্ষে ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীমান অমরেন্দ্র-নাথকে একটি পুরস্কার-পদক দান করিবেন। নৃত্যগীত শেষ হইলে পান-ভোজন, কথাবার্ত্তা, আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল। বাঙ্গালী যে বাঙ্গালীকে আদর করিতে শিখিয়াছে, ইহাতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি।

পরবর্ত্তী ২৩এ ফেব্রুয়ারি টাউন-হলে এক বিরাট সভায় ডবলিউ. সি. বোনার্জি কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে রমেশচন্দ্রকে মানপত্র দান করিয়াছিলেন। মানপত্রের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

We are aware that one of the principal reasons of your early retirement from the Indian Civil Service was a desire to be more useful to your country and an anxiety to direct the attention of our rulers to the aspirations and grievances of the people of India from a position of greater freedom. The way in which you have employed your time since your retirement has fully justified the wisdom of that step. You have, within a short time, done much, through the press and the platform, to inform and enlighten public opinion in England on some of the most momentous questions of Indian administration—particularly about the recent change in the law of sedition in India and the Calcutta Municipal Bill. You have also sought to explain Indian questions to Members of the English Parliament and have made timely representations to the India Office regarding them. While helping in the election of some members of the British House of Commons, you have availed yourself of the opportunity thus afforded of pleading the cause of your countrymen before the English people. You have also spoken to crowded English audiences on several occasions on Famine and Land-assessment in India, and have been earnestly endeavouring to impress upon the authorities the close relation the one bears to the other. For these services and labours, so disinterestedly and ungrudgingly rendered, your grateful countrymen elected you President of the 15th Indian National Congress, —the highest office in the gift of the people of this country.

Your services to literature have been no less conspicuous. You have considerably enriched our national literature by your works of fiction,—presenting an important period of our past history in a most vivid and attractive form. By your scholarly and faithful translation of the Rig-Veda, you have helped to diffuse a wider knowledge of its treasures among our countrymen. Your masterly exposition of Ancient India in your historical

works and your rendering of our great national epics into English verse have served to interpret to the nations of the West the India of the past and to evoke an interest in the India of the present.

পুলিস কমিশন।—১৯০২ সনের নবেম্বর মাসে পুলিস-ব্যবস্থা সংস্কারকল্পে সার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের নেতৃত্বে যে পুলিস-কমিশন গঠিত হয়, রমেশচন্দ্র তাহাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি ২৪এ নবেম্বর একটি লিখিত মন্তব্যও দাখিল করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রকাশ :—

I have seen it stated that the police in India are of the people, and that the police is dishonest because the people are so. Those who make such sweeping charges do not know, or do not consider that by the inadequate scale of pay we have fixed for the police service, we draw to that service, by a natural selection, a class of men not fit for their high responsibilities, and that we train them in dishonesty by giving them ample powers, and an undue degree of protection when they are detected in wrong-doing. (*The Bengalee*, 25 Dec. 1902.)

১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে বর্দ্ধমান-বিভাগের কমিশনর নিযুক্ত হইবার অল্প দিন পরে রমেশচন্দ্র শাসন-বিষয়ক যে বার্ষিক বিবরণ ছোট লাটকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে পুলিস-সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

Two things are necessary to improve the Bengal Police. In the first place, we must allow the Police Sub-Inspector a pay at which it is possible to get educated and intelligent young men, fit for the great powers and responsibilities of thana officers. When we pay less we simply pitchfork inefficient or dishonest men into these responsible posts. In the second place the police force ought to be handled more intelligently than it is at present. Sub-Inspectors should be treated with greater consideration than they now receive, their good and zealous work should be more carefully noted and rewarded, and their apparently dishonest or

inefficient work should be more promptly discouraged than it is at present. They should feel that they are being judged by their work; they should feel a zeal to show good work, a confidence that their good work will be appreciated.

'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'।—এই বৎসর (ইং ১৯০২) রমেশচন্দ্র 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র পরিশিষ্ট ভাগের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরব—রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল ও সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বরোদার রাজস্ব-সচিব

১৯০৪ সনে রমেশচন্দ্র স্বজাতিবৎসল গায়কোয়াড়ের অনুরোধে, তিন হাজার টাকা বেতনে, বরোদা-রাজ্যের রাজস্ব-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। অনেকে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, রমেশচন্দ্রকে পাইয়া বরোদা-রাজ্য যেমন লাভবান্ হইল, সেইরূপ তাঁহার ন্যায় দেশবন্ধুর অভাবে সমগ্র ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। রমেশচন্দ্র ২৩এ আগষ্ট নূতন পদে যোগদান করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় বরোদা-রাজ্যে অচিরাৎ নানাবিধ উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত রমেশচন্দ্রের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

My dear Nivedita,—I am trying to strike out new lines of progress, to develop new policies and reforms, and am determined to move forward and to carry the State forward. I am trying to gather together the scattered forces which were present here, to encourage enterprise and talent in younger men, to welcome new ideas and new schemes, to initiate progress in all lines, and to make Baroda a richer and a happier State. I go among the people

print and publish my schemes, face the Maharaja with my proposals, and manage to have my way in a manner which old officers of this State pronounce quite "unconventional"! I am trying to relieve the agriculturists of excessive taxation on their land, I am endeavouring to get together capitalists to start new mills and industries, and if I can build up the Legislative Council I will make the work of the State proceed in the interest of the people, and in touch with the people. Everything shall be open and above-board,—nothing done in dark tortuous, secret, autocratic ways. Dreams! Dreams! some will exclaim. Well, let them be so,—it is better to dream of work and progress than to wake to inaction and stagnation. This last shall never be my vocation, it is not in my nature...Ever your loving godfather.

কয়েক মাসের ছুটি লইয়া, স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় রমেশচন্দ্র ১৯০৬ সনের ৯ই জুন বিলাতযাত্রা করেন। কিন্তু বিলাতে পৌঁছিয়া তাঁহার ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামলাভ ঘটিল না। তখন বঙ্গব্যবচ্ছেদ লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল; বিলাতে গোখ্‌লেকে সহকর্ম্মিরূপে পাইয়া তিনি পুনরায় সংগ্রামে মাতিয়া উঠিলেন। রমেশচন্দ্র ছিলেন অনাড়ম্বর নীরব কর্ম্মী; আবেগময়ী বক্তৃতা বা অযৌক্তিক চীৎকার তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির অঙ্গ ছিল না। তিনি যুক্তিতর্কের সাহায্যে বুঝাইয়া-সুজাইয়া কর্য্যোদ্ধারের পক্ষপাতী ছিলেন। ২৫এ জুলাই তিনি দৌহিত্রী সুষমাকে বিলাত হইতে লিখিতেছেন :—

I have not had much rest so far. I reached London on the 25th June—just a month ago—and this month I have given to hard work and politics. I have seen all who could help us in our India matters—not only Hume and Sir Henry Cotton and O'Donnell and Gokhale, who have been doing their utmost—but also the Indian Secretary, John Morley....Within the short time I have been working, I have created an impression. The partition will not be undone immediately, because Morley has said it is a "settled thing", but I don't despair of its being modified later on.

I had the map of India before me, and explained to Mr. Morley how a Partition can be effected without offending the people. ...In other matters. Gokhale and I have not been unsuccessful; and for the first time, after more than ten dreary years, some concessions in the way of extended representation in the Legislative Councils has been announced. This is a good beginning. The present Parliament is quite different from any that preceded it; there is a large number of earnest Members who are all for India, and the Labour Party feel for India. The credit is due to Gokhale of having drilled these earnest Members in Indian affairs these three months, and I have also done my best during the month I have been here. On the day before the Indian Budget debate, Gokhale and I were invited to a tea party in the House of Commons, and addressed some fifty or more Members of Parliament who had come to listen to us; and Gokhale has even been invited to the Parliamentary meeting of all nations to be held this week. All things are ready, and we must work earnestly. I will retire from Baroda next year, pass a month or so in Calcutta, and then come and settle down in England, and work with much greater hope of success than I have done within the last nine years under a Tory Government and Lord G. Hamilton! I feel like a war-horse at the sound of the bugle!

পরবর্ত্তী ১৭ই নবেম্বর ভারতে ফিরিয়া রমেশচন্দ্র পুনরায় চাকুরীতে যোগদান করেন। মাত্র তিন বৎসরের পরিশ্রমে তিনি বরোদাকে উন্নতির পথে কতটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত তিন খণ্ড *Baroda Administration Report* তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ভারতীয় শিল্প-সম্মিলনে নেতৃত্ব

কংগ্রেস কয়েক বৎসর যাবৎ বার্ষিক অধিবেশনের সহিত একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন সত্য, কিন্তু নবোদ্‌গত শিল্প-প্রচেষ্টাকে উৎসাহ-বারি-সিঞ্চনে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল না। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কাশীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২১শ বার্ষিক অধিবেশনের সহিত একটি শিল্প-সম্মিলনের ব্যবস্থা হয়। রমেশচন্দ্র এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বরোদা-রাজ্যের সকল বিভাগে—বিশেষ করিয়া শিল্প-বিভাগে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; তাঁহার ন্যায় গুণী ব্যক্তিকে প্রথম শিল্প-সম্মিলনের সভাপতি-পদে বরণ করা সমুচিত হইয়াছিল। ৩১এ ডিসেম্বর প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণের একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি:—

...today there is a desire, which is spreading all over India, that by every legitimate means, by every lawful endeavour, we will foster and stimulate the use of our own manufactures among the vast millions who fill this great Continent. Gentlemen, I am drifting into a subject which has raised much angry discussion, when I speak of the Swadeshi Movement. ...the Swadeshi Movement is one which all nations on earth are seeking to adopt in the present day. Mr. Chamberlain is seeking to adopt it by a system of Protection. Mr. Balfour seeks to adopt it by a scheme of Retaliation. France, Germany, the United States, and all the British Colonies adopt it by building up a wall of prohibitive duties. We have no control over our fiscal legislation, and we adopt the Swadeshi Scheme therefore by a laudable resolution to use our home manufactures, as far as practicable, in preference to foreign manufactures. I see nothing that is sinful, nothing that is hurtful in this; I see much that is praiseworthy and

much that is beneficial. It will certainly foster and encourage our industries in which the Indian Government has always professed the greatest interest. It will relieve millions of weavers and other artisans from a state of semi-starvation in which they have lived, will bring them back to their hand-loom and other industries, and will minimise the terrible effects of famines....It will give a new impetus to our manufactures which need such impetus; and it will see us, in the near future, largely dependent on articles of daily use prepared at home, rather than on articles imported from abroad.

রমেশচন্দ্র ১৯০৭ সনের ২৮এ মার্চ তারিখে সুরাটে অনুষ্ঠিত শিল্প-সম্মিলনেরও সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ডি-সেন্ট্রালাইজেশন কমিশন

তিন বৎসর রাজস্ব-সচিবের গুরুভার বহন করিবার পর রমেশচন্দ্রের মনের গতি কোন্ খাতে প্রবাহিত হইতেছিল, ১৭ এপ্রিল ১৯০৭ তারিখে কন্যাপ্রতিম মেহ্‌টা পত্নীকে ('সুধাহাসিনী' নামে 'সংসারে'র গুজরাটী অনুবাদকর্ত্রী) লিখিত একখানি পত্রে তাহার আভাস আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

Tell me your honest opnion, Sharada, do you not think I would do well to devote the remaining years of my life in writing such books as the 'Lake of Palms'—ay, in compiling a complete history of the Indian people from the earliest times to the twentieth century—than to work and vegetate in Boroda? I am the Amatye here, I am acting Dewan here, people look upon me with feelings of awe and respects—but I feel I am proving false to my higher pursuits, false to my destiny! I have done something in Baroda in these three years; let me plunge back to those pursuits which are dearest to my heart. As you are longing to come back from Naosari to the larger world of

Baroda—I am longing also to return from Baroda to the largar world of literature and political work.

রমেশচন্দ্র ১৯০৭ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত বরোদায় কার্য্য করিয়া ছুটি লইয়াছিলেন। ছুটিতে অবস্থানকালে তিনি ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ডি-সেনট্রানলাইজেশন কমিশনের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া ভারত-সচিব লর্ড মর্লে সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র তাঁহাকে একখানি পত্রে লেখেন :—

Our inquiries are concerned rather with the machinery of administration than with the administration itself. An inquiry into the details of administrarion...would have given officials a safe basis of facts for future progress. But I am one of those who think half a loaf better than no bread, and I am gratefnl for the inquiry which has been permitted. (Jany. 1908)

কমিশনের কার্য্যে রমেশচন্দ্রকে অন্যান্য সদস্যের সহিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থানকালে স্থানীয় বাঙ্গালী, হিন্দু ও মুসলমান তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

Gentlemen, I believe more in our own fitness for self-government than in any gifts and concessions which we may receive from our rulers. If we are prepared by our devotion to work for self-government, no power on earth can withhold it from us. Nations shape their own destiny, and our future is in our own hands. Let us forget those petty jealousies and differences which sometimes devide us. Let us keep the great object before us. The path of progress is thorny, but inspite of many disappointments I still believe that the path is as clear before us as the noonday sun. This is Dharma : it is the duty of every nation to strive for progress, as it is the endeavour of the plant to seek for light. If we are true to ourselves in education and social reforms, in industrial

and political endeavours; our future is assured. Every act of self-seeking and untruth holds us back; every act of self-sacrifice and devotion sees us farther on our onward march. (14 Feb. 1908)

এ দেশে অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ হইলে রমেশচন্দ্রকে ১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসে কমিশনের সহিত বিলাত গমন করিতে হইয়াছিল। কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি বন্ধু বিহারীলালকে লিখিয়াছিলেন :—

Many of our recommendations will be in the direction of real and popular reforms, and will help Lord Morley in bringing forward his scheme of reforms. (7 Oct. 1908)

তাঁহার দৃঢ় আপত্তি সত্ত্বেও কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের মতে কোন কোন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্বীয় এলাকাভুক্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি করিলে—স্থানীয় বিষয়ের পরিচালনা-কার্য্যে দেশবাসীকে সরকারী কর্ম্মচারী প্রভাবাধীন রাখিলে স্বায়ত্তশাসনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়—এই সত্য রমেশচন্দ্র কমিশনের সদস্যগণকে বহু চেষ্টাতেও হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র বরোদার কার্য্যে ছুটি লইয়া কমিশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই কারণে ১৯০৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিশনের কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বরোদার বেতন মাসিক তিন হাজার টাকা হারে পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন।

মর্লের সহিত পত্র-ব্যবহার

রয়াল কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইবার পর রমেশচন্দ্র শাসন-সংস্কার বিষয়ে ভারতসচিব মর্লেকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। স্থানাভাবে আমরা মাত্র তিনখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bombay 14 Novr. 1907.

I thank you sincerely for the kind advice you have given me in your letter of the 25th October, and I will bear it in mind. I have often been misjudged, as people who advocate reforms always will be; but the reforms I have urged have always been moderate and practicable, and, to quote your words, I never have asked "for the moon." In all my official career of twenty-six years I worked in harmony with my colleagues and superiors, and I have pursued the same conciliatory policy during the last ten years, *i. e.* since my retirement from service. Nevertheless, people who are opposed to all reforms have branded me as an "impatient idealist," while ardent reformers have branded me as Lukewarm and half-hearted. *A reformer who is moderate is between two fires. He has no friends, as I have learnt to my cost.*

The situation in India still remains critical, and every coercive measure is adding to the influence of the extremists. Ten years ago the deportation of the Natu brothers, the secret search for a conspiracy against the British rule which did not exist, and the savage sentences passed by Courts in many cases under panic, first gave birth to the extremist party in the Mahratta country from Poona to Nagpur. Later on, the unwise Partition of Bengal, and the equally unwise measures which were adopted to distinguish between class and class, creed and creed, gave rise to lamentable disturbances, and strengthened the extremist party in Bengal. Recent events, which I need hardly mention, are strengthening the same party in the Punjab. The large majority of the educated people are still moderate, and are striving to stem the new spirit; but their hands are weakened, as they can as yet show no real advance towards self-government, which is the aim of all moderate reformers......my younger countrymen listen to us with doubt and distrust; they ask us what has been gained by our "constitutional agitation" during these ten or fifteen years.

You have very kindly suggested that I and my friends should define clearly and concisely what we want. This has been done by the Moderates before, and will no doubt be done again, and the Government of India knows that all that we ask for is a larger share in the control and direction of our own affairs...

পৃথক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের মত অতি স্পষ্ট ছিল; তিনি এ বিষয়ে মর্লেকে যাহা লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

2 Dec. 1907.

The Provincial Governments of India are now preparing schemes for the expansion of the Provincial Councils, and the schemes are based on distinctions of classes, and castes and creeds...Goverment might take power to nominate and appoint six members from classes and castes not adequately represented by election. The total of non-official members will thus be about twenty.

England has ruled India for a century and a half on the just and correct principle of equality and fairness towards all castes and creeds. The new proposal of creating electorates according to castes and creeds is attended with danger. It will create jealousies and hatreds, accentuate differences in daily life, foment riots and disturbances, and be a source of political danger to the Empire, European Governments do not now form separate electorates for Protestants and Roman Catholics, they wisely ignore religious distinctions in political and administrative matters. The same wise impartiality can be pursued in the East, and the rights of the less advanced classes can be secured in the way indicated above.

Apart from what has been stated above, ther are some grave objections to elections by castes and creeds which I indicate below, very briefly.

It is the British Government and British Schools and Colleges which have taught us to disregard caste distinctions in public affairs and in civic life. Is it for the British Government

now to undo its past work, and to accentuate and embitter our caste differences by making them the basis of political distinctions ?...

India is content with election by territorial divisions. The defects of that system can be rectified by vesting Government with larger powers of nomination. It would be unwise to abandon that system, and to throw the apple of discord among the numerous castes and creeds of India by making religious differences the basis of political distinctoins. Such a policy would be a bad training for civic life, and would also be a fruitful source of troubles and discord in the future.

নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তিনি ভারত-সচিবকে এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন :—

Calcutta, 20 Jany. 1908

...the Partition has strengthened the hands of the extremists all over India, and is a god-send to them. The despair of influencing administration by persuasion and reason drove thousands of men to the camp of unreason,...Disorder must necessarily be repressed with rigour, but the only true remedy for the present unrest, and the only method of making the administration popular and strong in the future, is to secure the co-operation and concurrence of the people, to make them feel that they are sharers in the administration of their own affairs. Intelligent leaders of the people are consulted in all Legislative measures, as there are elected India Members in the Legislative Councils. But large changes in the policy of the administration are effected by executive orders, and in such matters the people are kept aloof...We may run our eye over all this vast executive machinery in this great Empire, and we shall not find a single Indian anywhere who is trusted to take a share in shaping the policy of administration. How much is lost by an alien government both in popularity and in the adaptability of its measures through this needless exclusiveness is known only to those who re of the people, and who feel the pulse of the people.

Why should not the British rule be a popular rule in this loyal country, British officers consenting to share with the leaders of the people the task of settling the policy and the details of administrations? Why should not Indian leaders proudly stand by the side of devoted British administrators, and work for the great Empire which they may then both call their own? Such questions receive no response from officials generally, the history of the world seldom records instances of men in power consenting to share it with those over whom they rule. But it is a New Year's hope to me, as it has been my lifelong aspiration. Either such co-operation, or a widening gulf with increasing discontent and disorder, is before us, there is no other alternative.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

রয়াল কমিশনের কার্য্য শেষ করিয়া, ১৯০৯ সনের মার্চ মাসে রমেশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৫ই এপ্রিল তারিখে নবনির্ম্মিত পরিষদ্-মন্দিরে একটি সান্ধ্য-সম্মিলনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত এই সঙ্গীতটি সভাস্থলে গীত হয়:—

বন্ধুর ভালে চন্দন-টিকা কণ্ঠে কমল-মালা,
দেশ-বন্ধুর শুভ আগমনে হৃদি-মন্দির আলা।
মাধবে মাধবী-কঙ্কণ বাঁধ বন্ধুর মণিবন্ধে,
লোক-বন্ধুর গৌরব-গাথা গাঁথ মনোরম ছন্দে।
বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণ-ডালা,
ইন্দু-কিরণ-নিন্দিত যাঁর মুকুট-রশ্মিজ্বালা।
বন্ধুর তরে তোরণ রচনা করেছে নূতন বর্ষ,
নবীন পুষ্পে নব কিশলয়ে উথলি নবীন হর্ষ।

বর্ষণ করে লাজ-অঞ্জলি কল্যাণী পুরবালা
জন-বন্ধুর আগমন-পথে লক্ষ কুসুম ঢালা।

রমেশচন্দ্র ছিলেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি (ইং ১৮৯৪)। তখন পরিষদের নিজস্ব মন্দির ছিল না, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটিতেই সভাদি অনুষ্ঠিত হইত। পরিষদের নূতন মন্দিরে পদার্পণ করিয়া এবং পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিচয় পাইয়া তিনি আন্তরিক হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিষদের গঠনকার্য্যে রমেশচন্দ্র কিরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় এই প্রতিষ্ঠানের ষোড়শ-সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণে (বৈশাখ ১৩১৭) মুদ্রিত আছে। ইহাতে প্রকাশ :—

> ১৩০১ সালের আরম্ভে তাৎকালিক Bengal Academy of Literature যখন কয়েক মাসের নিষ্ফল জীবনের পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, তিনি সেই সময়েই প্রথম সভাপতিরূপে উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার কিছু দিন পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; পরিষদের গঠনকার্য্যে যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার পরিচালনা-কার্য্যে রমেশবাবুকেই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া স্থির করেন। দেড় বৎসর মাত্র পরিচালনার পর তিনি রাজকার্য্য উপলক্ষে উড়িষ্যায় গমন করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে পরিষদের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু তিনি সেই অল্প সময়েই পরিষৎকে যে ছাঁচে ঢালিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ তদনুযায়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তিনি যেরূপ যত্নের সহিত পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সমুদয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন, যেরূপে কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর বাড়াইবার উপায় নির্দ্দেশ করিতেন, যেরূপে আগ্রহের সহিত পরিষদের নবোদ্গত জীবনে বলসঞ্চার করিতেন, তাহা

পরিষদের প্রাচীন সভ্যগণের অন্তরে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। বস্তুতঃ সেই সময়ে রমেশচন্দ্রের ন্যায় উদ্যমশীল, কর্ম্মঠ, অনুরক্ত, উচ্চপদস্থ নেতার সাহায্য না পাইলে পরিষদের জীবনাখ্যায়িকা হয়ত অন্য রূপ গ্রহণ করিত। সূতিকাগৃহের বিঘ্নবিপত্তি হইতে পরিষৎ-শিশুকে এইরূপে রক্ষা করিয়া, তিনি সভাপতিত্ব হইতে অবসর গ্রহণের পর আর একবার ব্যতীত পরিষদের কার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত হইতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের অধিকাংশ ভাগ ইংলণ্ডে অথবা বরোদায় অতিবাহিত হওয়ায় পরিষদের কর্ম্মে যোগদান অসাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার মমত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। বিলাত-প্রবাস কালের মধ্যে যখন একবার স্বদেশে আসেন, সেই সময়ে—১৩০৯ সালে পরিষৎ তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য পুনরায় সভাপতিত্বে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; সেই অবকাশে একদিন তাঁহার বহুকালের ও বহু ব্যয়ে সঞ্চিত সংস্কৃত-গ্রন্থরাশি পরিষৎকে দান করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার স্নেহানুগ্রহ প্রকাশ করেন।...[১৩০৫ সালে] পরিষৎ তাঁহাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বরোদার দেওয়ান

১৯০৯ সনের ১লা জুন হইতে রমেশচন্দ্র পুনরায় বরোদার কার্য্যে যোগদান করেন। পূর্ব্বতন দেওয়ান অবসর গ্রহণ করায় তিনি মাসিক চারি হাজার টাকা বেতনে বরোদার-রাজ্যের দেওয়ান-পদাভিষিক্ত হন।

মৃত্যু

ছয় মাস দেওয়ানের কার্য্য করিবার পর ১৯০৯ সনের ৩০এ নবেম্বর রমেশচন্দ্র বরোদায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারত শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তৎসম্পাদিত 'বসুমতী'তে লেখেন :—

> স্বদেশনিষ্ঠ, স্বদেশবাসীর প্রিয় রমেশচন্দ্র,—বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী রমেশচন্দ্র, কংগ্রেস-যজ্ঞের অন্যতম অধ্বর্য্যু, বাগ্মী রমেশচন্দ্র,—দীন বঙ্গসাহিত্যের ভক্ত উপাসক, ঔপন্যাসিক, ঋগ্বেদের অনুবাদক রমেশচন্দ্র,—ইংরাজী সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, নানা ইংরাজী গ্রন্থের প্রণেতা রমেশচন্দ্র, রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থায় পারদর্শী, সুতার্কিক, কর্জ্জন-বিজয়ী রমেশচন্দ্র,—রাজা ও প্রজার বন্ধু, বিজ্ঞ ব্যবস্থাপক রমেশচন্দ্র, গায়কবাড়ের অমাত্য, বরোদার দেওয়ান রমেশচন্দ্র,—ভারতের সকল শুভানুষ্ঠানের হিতকামী কর্ম্মবীর! ভারতের কল্যাণ-কামনায় চিরজীবন যাপন করিয়া, তুমি কর্ম্ম-মন্দিরেই চির-বিশ্রাম করিলে! সাহিত্য ও শিক্ষা, রাজনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা, চিন্তার সাম্রাজ্যের কোন্ বিভাগে তোমার কৃতিত্বের পরিচয় মুদ্রিত নাই? তোমার অভাবে বঙ্গদেশ দরিদ্র হইয়াছে। ভারতবর্ষ চিন্তাশীল মনীষী হারাইয়া অশ্রুজলে তোমার স্মৃতির পূজা করিতেছে। ভারতের, বাঙ্গালার, এ শোক কি ভুলিবার? তোমার অভাব কি সুদূর ভবিষ্যতেও দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ পূর্ণ করিতে পারিবে?

স্মৃতিরক্ষা

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য 'রমেশ-ভবন' নামে একটি সারস্বত-ভবন নির্ম্মাণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে (২ ফাল্গুন ১৩১৬) পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সবিনয়ে এই প্রার্থনা উপস্থিত করেন :—

> স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিনিদর্শনরূপে এই রমেশ-ভবনের ভিত্তি বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে বঙ্গমাতার সুসন্তান রমেশচন্দ্র যে দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষপাতী বন্ধুগণ সেই দিনকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের সূচনার দিন মনে করিয়া শ্লাঘাবোধ করেন। দুরন্ত কাল রমেশচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐহিক সম্পর্ক অকালে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ বা বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্মৃতি হইতে রমেশচন্দ্রের নাম কস্মিন্ কালেও লুপ্ত হইবে না। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য কেন, রমেশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার স্মরণনিদর্শনে বাঙ্গালী জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। আমি সাহিত্য-পরিষদের আদেশক্রমে রমেশচন্দ্রের স্মৃতিবিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য আপনা-দিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই সারস্বত-ভবন অপেক্ষা যোগ্যতর স্মৃতিনিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না। বাঙ্গালার সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে এই প্রার্থনা জানাইতেছি। সাহিত্যচর্চ্চা

হইতে রাষ্ট্রশাসন পর্য্যন্ত বিবিধ কার্য্যে যাঁহার শক্তি অব্যাহতভাবে প্রেরিত হইত, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙ্গালার সমুদয় রাষ্ট্রীকগণের নিকটও আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। রমেশচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র কেবল বঙ্গভূমির সীমামধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; তিনি কেবল বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন না, তিনি সমগ্র ভারতের সুসন্তান ছিলেন। আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকুশল রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষরূপ মহারাষ্ট্রের যাবতীয় অধিবাসীর নিকট প্রার্থী হইতেছি। আপনারা বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবকগণ, বঙ্গদেশের পক্ষ হইতে এই প্রার্থনা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্মুখে উপস্থিত করুন। রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত-ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোকিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকজ্ফার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতীভবন,—সেই রমাভবন, সেই রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি। অট্টালিকা-নির্ম্মাণ আমাদের অসাধ্য হয়, এখন কুটীর-নির্ম্মাণেই আমরা তৃপ্ত হইব। বঙ্গের সরস্বতী কুটীরমধ্যেই চিরকাল অর্চ্চনা পাইয়াছেন; বঙ্গলক্ষ্মী কুটীরসঞ্চিত শস্যসম্ভারের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছেন; বঙ্গসন্তান রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য কুটীর-কল্পনাও অযুক্ত হইবে না।

রামেন্দ্রসুন্দরের ঐকান্তিক প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। ১৩২১ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের

জন্য পরিষদের সংলগ্ন সাত কাঠা ভূমি দান করেন। অনেকেই অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। বরোদাধিপতি সম্রাজীরাও গায়কোয়াড় তাঁহার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীর স্মৃতিরক্ষায় পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের একতল ও ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে দ্বিতলের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়াছে।

সাহিত্য-সেবা

মধুসূদন দত্তের ন্যায় রমেশচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলিও ইংরেজীতে লিখিত। তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া রেঃ লালবিহারী দে-সম্পাদিত *Bengal Magazine* ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine* "Arcydae" [R. C. D.] এই ছদ্ম নামে ইংরেজীতে কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতে সুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে মাতৃভাষার সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্রের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> বঙ্কিমবাবু তখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্ব্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। এক দিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন ?" আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম,—"আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না! ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া

বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতি জানি না!" গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, "রচনাপদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে! তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে!" এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল,... । ('নব্যভারত,' বৈশাখ ১৩০০)

"You will never live your writings in English," said he on this or on another occasion, "look at others. Your uncles Govind Chandra and Shashi Chandra and Madhu Sudan Datta were the best educated men of the Hindu College in their day. Govind Chandra and Shashi Chandra's English poems will never live, Madhu Sudan's Bengali poetry will live as long as the Bengali language will live." These words created a deep impression in me, and two years after this conversation, my first Bengali work, *Banga Bijeta*, was out in 1874.—*The Literature of Bengal* (1895), p. 226*n*.

ঋষি বঙ্কিমের বাণী সার্থক হইয়াছিল। মাতৃভাষায় রচনা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র একখানি পত্রে অগ্রজকে লিখিয়াছিলেন :—

...I have written a few English books which have, for the time, pleased my countrymen for whom they were written. I have composed two Bengali novels which will probably live after my death......My own mother tongue must be my line, and before I die I hope to leave what will enrich the language and will continue to please my countrymen after I am dead. (Dist. Backerganj. 13 Aug. 1877.)

রমেশচন্দ্রের রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **বঙ্গবিজেতা** (উপন্যাস)। বনগ্রাম ১২৮১ সাল (১৬ ডিসেম্বর. ১৮৭৪)। পৃ. ৩১৮।

১২৮১ সালের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রথম প্রকাশিত।

২। **মাধবীকঙ্কণ** (উপন্যাস)। কৃষ্ণনগর ১২৮৪ সাল (৪ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ২০৭+টীকা।৵০।

৩। **জীবন-প্রভাত** (উপন্যাস)। দক্ষিণ শাহবাজপুর ১২৮৫ সাল (৮ নবেম্বর ১৮৭৮)। পৃ. ৩০০।

১২৮৫ সালের ১ম-১০ম সংখ্যা 'বান্ধবে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

৪। **জীবন-সন্ধ্যা** (উপন্যাস)। ত্রিপুরা ১২৮৬ সাল (৫ জুলাই ১৮৭৯)। পৃ. ২১৩।

৫। **শতবর্ষ** (বঙ্গবিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ ও জীবন-প্রভাত একত্রে)। (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ১০৪৬।

৬। **ঋগ্বেদ সংহিতা**ঃ ইং ১৮৮৫-৮৭।

মূল সংস্কৃত (প্রথমোঽষ্টকঃ)। আশ্বিন ১২৯২ (ইং ১৮৮৫) পৃ. ৭৬৪।

বঙ্গানুবাদ (১ম-৮ম অষ্টক)। ইং ১৮৮৫-৮৭।

৭। **হিন্দুশাস্ত্র**,১-৯ ভাগ। (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনুদিত)। ১৩০০-১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৩-৯৭)।

প্রথম খণ্ড :—

১ম ভাগ—বেদ সংহিতা ...সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত

২য় ভাগ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ঐ

৩য় ভাগ—শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র... ঐ

৪র্থ ভাগ—ধর্ম্মশাস্ত্র ... কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

৫ম ভাগ—ষড়্দর্শন ... কালীবর বেদান্তবাগীশ

দ্বিতীয় খণ্ড :—

৬ষ্ঠ ভাগ—রামায়ণ ... হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

৭ম ভাগ—মহাভারত ... দামোদর বিদ্যানন্দ

৮ম ভাগ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ... ঐ

৯ম ভাগ—অষ্টাদশ পুরাণ ... আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী

৮। **সংসার** ১ম খণ্ড (উপন্যাস)। ১২৯৩ সাল (৫ মে ১৮৮৬)। পৃ. ১৫১।

২য় খণ্ড (১৩ সেপ্টেম্বর) ১৮৮৬। পৃ. ১৫৩-২১২।

২য় বর্ষের 'প্রচারে' (১২৯২) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

৯। **সমাজ** (উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (২৭ জুলাই ১৮৯৪)। পৃ. ২০২।

১৩০০ (ফাল্গুন-চৈত্র) ও ১৩০১ (বৈশাখ-আষাঢ়) সালের 'সাহিত্যে' ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত।

১০। **সংসার-কথা** (উপন্যাস)। ? (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। পৃ. ৩৬১।

'সংসার'-এর পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রমেশচন্দ্রের বহু বাংলা রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলির তালিকা :—

ঋগ্বেদের দেবগণ...'নবজীবন,' ১২৯২-৯৩। হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস...'নব্যভারত,' ১২৯৭-১৩০০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর...'নব্যভারত,' ভাদ্র ১২৯৮। কবি কালিদাস...'ভারতী ও বালক,' পৌষ ১২৯৯। কবি ভবভূতি...'সাধনা,' মাঘ ১২৯৯। উন্নতির যুগ...'সাধনা,' চৈত্র ১২৯৯।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়···'নব্যভারত,' বৈশাখ ১৩০১। বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য···'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩০১। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র···'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ৩য় সংখ্যা ১৩০১। অমৃতসর (সচিত্র)···'মুকুল,' আষাঢ় ১৩০২। উড়িষ্যা (সচিত্র)···'মুকুল,' শ্রাবণ ১৩০২। শিবজী···'সখা ও সাথী,' ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০২। দুদিনের স্বদেশযাপন···'ভারতী,' বৈশাখ ১৩০৭। ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ···'প্রভাত,' ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। হিন্দু দর্শন···'ভারতী,' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮। ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (তাহার কারণ ও প্রতিকার)···'ভারতী,' আষাঢ় ১৩০৮। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি···'ভারতী' শ্রাবণ ১৩০৮। বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত···'ভারতী,' পৌষ ১৩০৮। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা···'ভারতী,' ফাল্গুন ১৩০৮। ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল···'ভারতী,' বৈশাখ, আষাঢ় ১৩০৯। বারাণসী শিল্প-সমিতি···'ভাণ্ডার,' ফাল্গুন ১৩১২।

বাংলা পত্রাবলীঃ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় রমেশচন্দ্রের কয়েকখানি বাংলা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে গৌরহরি সেনকে লিখিত একখানি ('মানসী,' ভাদ্র ১৩১৮, পৃ. ৪৩৮) ও সত্যব্রত সামশ্রমীকে লিখিত তিনখানি পত্র ('বঙ্গশ্রী,' শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ. ৩২-৩৩) উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৯ সনের নবেম্বর মাসে রমেশচন্দ্র 'ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ম শিক্ষা' ("ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের আগমন হইতে ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক ভারতেশ্বরী নাম গ্রহণ পর্য্যন্ত") নামে একখানি সুলিখিত পাঠ্য পুস্তক (পৃ. ২০৪) প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের ছয়খানি উপন্যাসের মধ্যে চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। প্রিয় গ্রন্থকারগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago. I spent days and nights over his novles ; I almost lived in those historic scenes and in those mediaeval times which the great enchanter had conjured up....I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott ; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history. ("My favourite Authors" : *Wednesday Review*, Trichinopoly. 23 Aug. 1905.)

এই কারণে তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অঙ্কিত অনেক চিত্র ও চরিত্র Ivanhoe-র অমর লেখকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রমেশচন্দ্রের বাকী দুইখানি উপন্যাস—'সংসার' ও তাহার উপসংহার 'সমাজ' সামাজিক উপন্যাস। তাঁহার একখানি পত্রে (১০-২-১৮৯৪) প্রকাশ :—

> On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow marriage, &c) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu society, of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I cannot tell you how deeply I have felt this for years past ; of my last two novels, "Sansar" goes in for widow marriage, and "Samaj,"...goes in for inter-caste marriage.

রমেশচন্দ্রের বেশীর ভাগ গ্রন্থই ইংরেজীতে লিখিত। এই সকল গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি ; পাঠ্য পুস্তক, বা কোন কোন পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নাম ইহাতে বর্জিত হইয়াছে।

1. *Three Years in Europe* being extracts from letters sent from Europe. By a Hindu. Cal. 1872 (27 June), pp. 116.

ইহার ৩য় (ইং ১৮৯০) ও ৪র্থ সংস্করণ (ইং ১৮৯৬) পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। ১ম সংস্করণের ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'ইয়োরোপে

তিন বৎসর' (পৃ. ১০৮) নামে রমেশচন্দ্রের জনৈক কর্ম্মচারী—ভগবান্‌-চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক ১৮৭৩ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রচারিত হয়।*

2. *The Peasantry of Bengal* being a view of their condition under the Hindu, the Mahomedan and the English Rule, and a consideration of the means calculated to improve their future prospects. Cal. 1874, pp. 237.

3. *The Literatnre of Bengal*...From the earliest times to the present day with copious extracts from the best writers. By Ar Cy Dae. Cal. 1877, pp. 210.

   ইহার "Revised Edition : with Portraits" ১৮৯৫ সনে গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

4. *A History of Civilisation in Ancient India* based on Sanskrit Literature. Vols. 1-3. Cal. 1889-90.

   ইহার সংশোধিত সংস্করণ ১৮৯৩ সনে বিলাতে প্রকাশিত হয়।

5. *Lays of Ancient India* selection from Indian Poetry rendered into English verse London 1894, pp. 224.

6 *Rambles in India* during twenty four years, 1871 to 1895. With maps and illust. Cal. 1895, pp. 160.

* রমেশচন্দ্রের শ্যালীপতিভ্রাতা—বনগ্রাম ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ লিখিয়াছেন :—"১৮৭৫ সালে এই পুস্তক ইংরাজী হইতে ব্যাঙ্গালায় অনুবাদ করা হয়, ইহার দুই একটি কবিতা আমি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলাম।"—'রমেশচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৩০২), পৃ ৭ দ্রষ্টব্য।

7. *Reminiscences of a Workman's Life* (Poems) "For Private Circulation only." Cal. 1896, pp. 57.
8. *England and India* a record of progress during a hundred years 1785-1885. Lodon 1897, pp. 166.
9. *Maha Bharata* the Epic of Ancient India condensed into English verse. With an introduction by the Rt. Hon. F. Max Muller. Illust. London 1899, pp. 188.
10. *Ramayana.* The Epic of Rama, Prince of India condensed into Eng. verse. Illust. London 1900, pp. 194.
11. *Open Letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessments in India.* London 1900, pp. 323.
12. *The Lake of Palms* a story of Indian domestic life. London 1902.

"A simple story of Bengal village-life appeared in Calcutta, under the title of "Sansar" in 1885. It is now offered to English readers in an English garb, with some necessary alterations, as a slight effort toward the lifting of that curtain which veils the inner life of the people of India from the West."

13. *The Economic History of India* (1757-1857) London 1902, pp. 454.
14 *Speeches and Papers on Indian Questions :*
    1897-1900. Cal. 1902, pp. 334.
    1901-1902. Cal. 1902, pp. 203.
15. *India in the Victorian Age* an Economic Hist. of the People (1837-1900). London 1904, pp. 628.

16. *Baroda Administration Report* :
1902-03 and 1903-04. 1905, pp. 255.
1904-05. 1906, pp. 323.
1905-06. 1907, pp. 217.

I7. *Indian Poetry* selections rendered into Eng. verse. London 1905, pp. 163.

18. *The Slave Girl of Agra* an Indian Historical Romance. London 1909.

"The present novel is based on a story, entitled *Madhavi-Kankan*, and depicting Indian life under the old Mogul Rule, which the author wrote in his own language over thirty years ago. The story has been considerably altered and enlarged in this English version."

রমেশচন্দ্র তাঁহার বিশিষ্ট ইংরেজী গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ১৯০৩ সনে অগ্রজকে লিখিয়াছিলেন :—My fame as an English writer may live or perish early ; but so long it lasts it will be connected with three works—my 'Civilisation,' my 'Epics,' and my 'Economic History.' শেষোক্ত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এন. এন. ঘোষ তৎসম্পাদিত *Indian Nation* পত্রে লিখিয়াছিলেন :—"A book like this dose more work than cart-loads of Congress Speeches."

উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, এই দুই প্রদীপ্ত প্রতিভার মাঝখানে পড়িয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক দীপ্তিতে বঙ্গ-সাহিত্য-গগনে প্রতিভাত

হইতে পারেন নাই। কিন্তু এ যুগের যে সৌভাগ্যবান্ পাঠক রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস কয়খানি পাঠ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিবেন, তাঁহারই মনে ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র স্থায়ী আসন লাভ করিবেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কথোপকথনে যে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র স্বয়ং সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভাষাই যে শিল্পী রমেশচন্দ্রের হাতে বিবিধ মনোহারিণী রূপ লইয়াছিল, তাঁহার 'মাধবীকঙ্কণ' ও 'সংসার-সমাজে' তাহার পরিচয় মিলিবে। তাঁহার রচনা সংযত ও মধুর ছিল। ইহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুণেই সম্ভব হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহরি সেনকে লিখিয়াছিলেন :—

> তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্তার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি…এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ! স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাঁহার কর্ম্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অরুগ্ন নির্ম্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।—১৬ই পৌষ ১৩১৬।